সন্তান হইত যদি "আমি" আগে না জন্মিত। বস্তুতঃ আমাকে লইয়াই সব। এই আমিত্বই ঈশ্বর অস্তিত্বের প্রথম এবং অভ্রান্ত প্রমাণ। কিন্তু আমিটে কাঁর? কি পদার্থ? যিনি জগৎস্বামী তাঁহার। কিম্বা জীবোপাধিরূপে স্বয়ং তিনি। বিচার করিলে আমার বলিবার বাস্তবিক কোন বিষয়ে অধিকার আছে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ইহার স্বত্ব কেবল নাম মাত্র। তত্ত্বতঃ স্বরূপ পক্ষে যিনি ব্রহ্ম তিনিই জীব। গৃহ বস্তু দূরে থাকুক, শরীর সম্বন্ধে যে বলি, আমার হাত পা, আমার নাক মুখ, ইহারও ত কোন অর্থ খুঁজিয়া পাই না। আমার দেহ কি আমি নির্ম্মাণ করিয়াছি? না আমি ইহার এক ইঞ্চি হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারি? অথবা পুত্র পিতার সকল সম্পত্তির অধিকারী। যাহাই হউক, আমিত্ব জ্ঞানটি একটি অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান; এই স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বোধের ভিতরেই মনুষ্যের বিশেষ গৌরব। এবং তাহার গৌরবে বিধাতার মহত্ত্ব এবং গৌরব প্রকাশিত হইয়াছে।

সর্ব্বশরীরব্যাপ্ত এই অদৃশ্য আমিত্বকে সহজে ধরা ছোঁয়া যায় না; প্রবৃত্তির উত্তেজনায়, বাহিরের বস্তুতে, বিষয়াসক্তিতে, মায়ার নেশায়, কল্পনার স্রোতে এবং অভ্যস্থ কার্য্যে সে এমনি ছড়াইয়া আছে, যে তাহাকে ধরা আর ভূত দেখা সমান। আমিত্ব থাকে কোথায়? দেহের সর্ব্বাঙ্গে থাকে, তাহার বাহিরে বহু দূরেও থাকে; অথচ কোন অঙ্গবিশেষ বা দেশবিশেষে নাই। বড় মজার রহস্য। কালে কিম্বা কোন স্থানে বদ্ধ নহে, অথচ আছে। আত্মাভিমানে যদি একটুমাত্র আঘাত লাগে, অমনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত জীবন যেন স্ফীত এবং আলোড়িত হইয়া উঠে। আমিত্বের সঙ্গগুণে জড় দেহটা পর্য্যন্ত আত্মাবৎ হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য দেহকেই সচরাচর লোকে আমি বলে। তাহা ছাড়া "আমি" বলিয়া অদৃশ্য এক স্বতন্ত্র বস্তু যেন কিছুই নাই। জড় যেন চৈতন্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। মনে হয়, মুখের কাছাকাছি, মস্তিষ্কের ভিতর, এইখানে কোন্ জায়গায় সে থাকে; কারণ, মুখমণ্ডলে যেমন তাহার স্পষ্ট প্রকাশ এমন আর কোন অঙ্গে নয়। অন্তরের ভাব ঐ খান দিয়া বাহির হয়, এইজন্য ঐ স্থানটাতে বার বার দৃষ্টি পড়ে। চিত হইয়া কিম্বা কাত হইয়া যখন শুইয়া থাকি, তখন পিঠের দিক্‌টায় আমিত্ব জ্ঞান তেমন টের পাই না; কেবল বুক মুখ চক্ষু কপাল নাক কাণ সম্মুখের দিকটাতেই তাহার ঘনতর আবির্ভাব দেখি। কিন্তু সেখানেও ধরা যায় না। খুঁজিতে গেলে আস্তে আস্তে কোথায় সরিয়া

যায়। বুক পিঠ মুখ মাথা হাত পা নাক চোখ কাণ কপাল সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্বেষণ করিয়া দেখ কোথাও তাহাকে পাইবে না। সমস্ত শরীরের স্থূল এবং সূক্ষ্ম অংশে তাহার স্থিতি; কিন্তু দুই পাঁচটা অঙ্গ যদি নষ্ট হইয়া যায়, তথাপি তাহার অস্তিত্ব বজায় থাকে। যে প্রধান যন্ত্রটির কার্য্য স্থগিদ হইলে সে দেহ হইতে নিক্রান্ত হয়, তাহাকেই যদি আমিত্বের স্থান বল; তাহাও কিছু বুঝা যায় না। হৃৎপিণ্ডে ফুসফুসের মধ্যে কি কেহ তাহাকে ধরিতে পারিয়াছে?

আমি এক দিকে এত সূক্ষ্ম, অন্য দিকে যখন বিষাদ, আহ্লাদ, অপমান, অভিমান, ক্রোধ লোভ হিংসার প্রবল উত্তেজনা উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে আঁকড়িয়া ধরা যায় না। প্রবৃত্তির প্রভূত প্রভাবে আমিত্ব তখন এই প্রকাণ্ড স্থূল শরীরটাকে যেন আরও স্থূলতর করিয়া তাহাকে চক্রাকারে ঘুরাইতে থাকে। ইহার সহিত যদি আবার পার্থিব ক্ষমতা শক্তি প্রভুত্বের যোগ হয়, তাহা হইলে একটা মানবজীবন সমস্ত দেশ মহাদেশকে অস্থির করিয়া তোলে। সে সময় ঐ অতি সূক্ষ্ম একটি মাত্র আমিত্বের ভিতর দেখি কতই বুদ্ধিশক্তির খেলা, কত বিচিত্র ভাবের লীলা, ইচ্ছার কত দুর্জ্জয় আবেগ! যেন মহা তুফানে সমুদ্র আস্ফালন করিতেছে। আবার অন্য সময়, নদীর মৃদু স্রোতের ন্যায় তন্মধ্যে গভীর বিজ্ঞানবিচার চিন্তা মন্ত্রণা আশা কল্পনার সুমন্দ প্রবাহ বহিতে থাকে। জ্ঞানে অজ্ঞানে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিতে আমিত্বের বহুবিধ ক্রিয়া দৃষ্ট হয়।

তবে শরীরই বা কি, আর আমিই বা কে? দুইটা দুই জাতীয় দুই স্বতন্ত্র পদার্থ; অথচ একের সহিত অপরের এমনি ঘনিষ্ঠ দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ যে কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে, ইহা মনে হয় না। সাকার নিরাকার, দেহ মন, জড় চৈতন্য ইহাদের আদিমূলতত্ত্ব এবং যৌগিক ক্রিয়া অনন্ত রহস্যে ঢাকা। আপাতঃদৃষ্টিতে চৈতন্যকে জড়েরই সংযোগফল বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু সে অনুমিত মাত্র, প্রমাণিত নয়। জড়টা যেন চৈতন্যের খোসা, তাহার অঙ্গের আবরণ স্বরূপ। এই স্থূল জড়ের মহিমাই বা কে বুঝিতে পারে? কতই তাহার আকৃতি প্রকৃতি! তাহার যোগাযোগে কতই কাণ্ড কারখানা হইতেছে! ধাতু প্রস্তর মৃত্তিকা জল বায়ু ইথার উত্তাপ জ্যোতি বিদ্যুৎ প্রভৃতি স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড়ের কতই লীলা খেলা! জড়ের মধ্যে আবার মৃত এবং জীবন্ত জড়,—প্রোটোপ্ল্যাজম। কোথায় জড়ের শেষ, চৈতন্যের আরম্ভ,

কিছুই নির্ণয় করিয়া উঠা যায় না। দেহের জন্ম বৃদ্ধি শৈশব যৌবন তেজ স্ফূর্ত্তি, বার্দ্ধক্য জরা হ্রাস এবং ক্ষয়ের সহিত আত্মারও জন্ম বৃদ্ধি যৌবন তেজ স্ফূর্ত্তি হ্রাস ক্ষয় প্রভৃতি অবস্থান্তর সচরাচর দৃষ্ট হয়। উহার ধ্বংসের সহিত আত্মাও অন্তর্দ্ধান হইয়া কোথায় যায় কেহ জানে না। শরীরটা কেবল ইন্দ্রিয়যোগে আত্মাকে বাহ্যজ্ঞান শিখাইয়া তাহার অন্তর্নিহিত জ্ঞানবীজকে অঙ্কুরিত করিয়া দেয়। তদুপলক্ষে আত্মার মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। দৈহিক উপাদান এবং গঠনের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও আর এ পৃথিবীতে কোন খোজ খবর পাওয়া যায় না। বিশ্বাসীর চক্ষে উহা পরলোকগত, কিন্তু জ্ঞানীর চক্ষে অদৃশ্য। আমিত্বতত্ত্ব অনুসন্ধান করা বড়ই কঠিন কার্য্য; বুঝিতে চেষ্টা করিলে আরও অজ্ঞানতা বাড়ে। কিন্তু যাহাকে লইয়া সমস্ত জীবন কাটাইতে হইবে, যাহার নামে পৃথিবীতে এত আন্দোলন, তাহাকেই বুঝিতে পারিলাম না, এটা ত বড় ভাল কথা নয়। এ কি ভূত পেত্নীর লীলা খেলা, না যাদুকরের ভোজবাজী? বড় বড় বিজ্ঞানী পণ্ডিতেরা স্বর্গ মর্ত্ত্য আকাশ পাতাল তন্ন বিতন্ন করিয়া খুঁজিল, সূক্ষ্ম পরমাণু কীটাণু বিদ্যুৎ বায়ু ইথারতত্ত্ব পর্য্যন্ত বুঝিল, দেহটাকে কাটিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল, তথাপি আমির, ফাঁকি ধরিতে পারিল না। ধন্য বিধাতার সৃষ্টি! যাহার ঘোরে দিবা নিশি সকলে উন্মত্ত তাহার একটা সন্ধান না লইয়াই বা কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকা যায়? এত লেখা পড়া শিক্ষা, ভূলোক এবং দ্যুলোকের জ্ঞান বিজ্ঞানালোচনা, তর্ক বিচার চিন্তা গবেষণা, প্রত্নতত্ত্বের এবং অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের অনুসন্ধান, অথচ মূলেই ভুল! আমিত্ব জ্ঞান কি পাঞ্চভৌতিক শরীরের সংযোগক্রিয়া?—যেমন ঘড়ির কল? দৈহিক মূল উপাদানে মূলতঃ যাহা কিছু আছে, তাহার সমবায়ে এরূপ জ্ঞান ইচ্ছা ভাববিশিষ্ট জীবনক্রিয়া উৎপন্ন হইবার ত কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। কি অদ্ভুত প্রহেলিকা! কি দুর্ব্বোধ্য রহস্য! যে আমির আমার সর্ব্বস্ব, হায়! তাহাকেই চিনিতে পারিলাম না। চিরদিন কেবল ছায়া ধরিয়া রহিয়াছি, পদার্থ কৈ? হে আমি, তুমি কে, কিরূপ, এবং কয় জন? দুই জনের মত যেন বোধ হয়। দুই জনের মধ্যে অনেক মতভেদও সময়ে সময়ে দেখিতে পাই। একটা উপরতালায় আর একটা নীচেতালায় থাকে। তুমি কি বিভিন্ন প্রবৃত্তির চিরপরিবর্ত্তনশীল চঞ্চল তরল তরঙ্গ মাত্র? না তাহা ছাড়া অন্য আর কিছু স্থায়ী অপরিবর্ত্তনীয় সারভূত পদার্থ? বরং মেঘের বিজলী, আকাশের নীলিমা, বাতাসের হিল্লোল, নদীর তরঙ্গ,

রবির কিরণ, মরুর মরীচিকা ধরিতে পারি, তথাপি আমার আমিকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। এই দেখিলাম স্বর্গে, এই আবার নরকের গভীর ক্রোড়ে!

আসল পদার্থটা একটী অবিভাষ্য ব্যক্তি, তাহাতে আছে জ্ঞান, ইচ্ছা, ভাব; ইহা কতক বুঝা গেল। জড়ের কোন লক্ষণ ইহাতে নাই, সম্পূর্ণরূপে ইহা অতীন্দ্রিয়, অণুবীক্ষণীয় তাহাও বুঝিলাম; কিন্তু ইহার উৎপত্তি কিসে? ভিত্তি কোথায়? অবলম্ব আশ্রয়ই বা কি? শরীরযোগে ক্রিয়াশীল অথচ শরীরের কোন বিশেষ অঙ্গ নয়, এবং কোন বিশেষ অঙ্গে আবদ্ধও থাকে না। আচ্ছা, প্রথমে শরীরের আদি তত্ত্ব তবে অনুসন্ধান করা যাউক; দেখি, সেখানে আমির কোন সন্ধান পাওয়া যায় কি না।

উদ্ভিদ, পশু, এবং মানব এই তিনের মূল উপাদান বস্তুতঃ—অন্ততঃ দৃশ্যতঃ একই। এই দৃশ্যমান অণুবীক্ষণীয় অতি সূক্ষ্ম অচেতন মূল উপাদানের গভীরতম অজ্ঞাত প্রদেশ অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্মতম সচেতন মূল উপাদান অবশ্যই আছে। সে বিচার এখন থাক, অগ্রে অচেতন দৃশ্য মূল উপাদানের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। অতীব স্বচ্ছ ঘন তরল জেলির মত এক প্রকার পদার্থ উপরিউক্ত ত্রিবিধ জীবদেহের প্রথমাবস্থা। ইহার প্রচলিত ইংরাজি নাম প্রোটোপ্লাজম্। (Protoplasam) ইহা হইতে বৃক্ষ, পশু, এবং মনুষ্য তিন প্রকার বিভিন্ন সংজ্ঞাধারী জীবদেহের উৎপত্তি। একই বিধ মূল উপাদান হইতে তিন প্রকার জীবের সৃষ্টি! ঐ তিনটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সৃষ্ট জীবের অস্বতন্ত্র জড়জীবামিশ্র যৌগিক মূল পদার্থ অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজমকে উত্তাপ দ্বারা উষ্ম করিলে তাহাতে তিনটী দাগ প্রথমে উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে যথা সময়ে একটী বৃক্ষ, একটী পশু, একটী মানুষ মস্তক উত্তোলন করে। পরে ক্রমোন্নতির নিয়মে ফল দ্বারা তাহারা আপনাপন বিশেষ স্বভাবের পরিচয় দেয়। স্বভাব এবং গুণ সম্বন্ধে তিনের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে একতা, অবশিষ্ট বিষয়ে মূলগত প্রভেদ;—এত প্রভেদ যে কেহ আপনার বিধিনির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া অন্যের প্রকৃতি ধারণ করিতে পারে না। পরস্পরের মধ্যে স্বভাবসম্বন্ধ আছে, আদান প্রতিদান চলে, কিন্তু মৌলিক প্রকৃতির বিনিময় অসম্ভব। গোড়াতেই এই রহস্য।

জড় এবং জীব জগতের সন্ধিস্থলে এই প্রোটোপ্লাজম্, ইহা জড় এবং জীবশক্তিমিশ্র যৌগিক পদার্থ। অঙ্গার, অম্লজান, যবক্ষারজান, উদ্জান, গন্ধক, ফস্ফরাস্ এই কয়টী মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রনে, প্রাকৃতিক অদৃশ্য

গূঢ় শক্তিপ্রভাবে উহা রচিত। জীব জগতের মূলতত্ত্ব এই পর্য্যন্তই চর্ম্ম-চক্ষু, অণুবীক্ষণ এবং বিজ্ঞান বুদ্ধির সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছে। প্রোটো-প্লাজমের মূল উপাদানগুলি পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানেই পাওয়া যায়, তাহার ওজন পরিমাণ এবং গঠনপ্রণালীর জটিল তত্ত্ব অব[illegible]তে হইতে পারিলেই রসায়নবিজ্ঞান-বিদ্ পণ্ডিত প্রোটোপ্লাজম্ প্রস্তুত করিতে পারিবেন, সুতরাং কালে জীবনকর্ত্তা জীবনস্রষ্টা হইবার পক্ষে আর তাঁহার কোনই বাধা রহিল না। উহার গঠনপ্রণালী, ওজন পরিমাণ আর কূট সন্নিবেশক্রিয়া এত দিন কেহ জানিতে পারে নাই, আজও পর্য্যন্ত পারে নাই, সেই জন্য জ্ঞানীরা উদ্ভিদ, পশু, মনুষ্য সৃজনে অক্ষম ছিল এবং অদ্যাপি আছে। অনেকে আশা করিয়া বসিয়া আছেন, ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিকেরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃত মৌলিক উপাদান সংগ্রহপূর্ব্বক রাসায়নিক ক্রিয়াযোগে তাহা হইতে প্রোটোপ্লাজম্ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন। যদি তাহাতে কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারেন হবেন, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এক বিধ প্রোটোপ্লাজম্ হইতে যে ত্রিবিধ জীব—উদ্ভিদ, পশু, মানব, উৎপন্ন হয় তাহা কি অন্ধ শক্তির আকস্মিক কার্য্য? না মূলে কোন এক ব্যক্তির তিনটী অভিপ্রায়শক্তি আছে? প্রোটোপ্লাজমের মৌলিক উপাদানের অন্তরালে অদৃশ্যভাবে অতিরিক্ত যে ত্রিবিধ অভিপ্রায়শক্তি আছে বিজ্ঞানী পণ্ডিত তাহা কোথা হইতে আনি-বেন? জড় উপাদানের সংযোগে জীবোৎপত্তি কেন হয়? এই কেনর ভিতর দুর্জ্ঞেয় মহাজ্ঞান এবং মহা ইচ্ছাশক্তি লুক্কায়িত আছে; তাহা মানববুদ্ধির দুরধিগম্য, চর্ম্মচক্ষু, অণুবীক্ষণ, রসায়নের অগোচর।

যাহা হউক, যত দূর দেখিতে পাওয়া গেল, তাই লইয়া এখন আইস আমরা আলোচনা করি। উদ্ভিদ, পশু, মানব এই তিনের মূল উপাদান এক। যে তিনটী দাগের কথা বলা হইল, তাহাও দৃশ্যতঃ এক। কিন্তু একটী দাগ হইতে শাখাপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ, একটী হইতে নখ লোম লাঙ্গুলবিশিষ্ট চতুষ্পদ পশুদেহ, আর একটী দাগ হইতে দিব্য মস্তকধারী হাস্যবদন দ্বিপদ বুদ্ধিজীবী মানব সন্তান জন্ম পরিগ্রহ করিল এবং আপনাপন নির্দ্দিষ্ট নিয়তির পথে ইহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য এবং উদ্দেশ্য সাধন করিতে লাগিল। বলিহারী যাদু-করের ভোজবাজী।

তিনের মূল উপাদানে (প্রোটোপ্লাজমে) প্রথমে জীবশক্তি আদৌ ছিল না, তদ্বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন;

কেবল চেতনাবিহীন পরমাণুপুঞ্জের সংহতি মাত্র ছিল। কুম্ভকার যেমন একই মৃত্তিকাপিণ্ড হইতে কোনটীকে ঘট, কোনটীকে সিংহ, কোনটীকে লক্ষী ভগবতী মহাদেব নির্ম্মাণ করে, তেমনি এক প্রোটোপ্ল্যাজম্ হইতে বিধাতা উদ্ভিজ, পশু, এবং মনুষ্যকে উৎপন্ন করিলেন। মূলে জীবশক্তি ছিল না, কোথা হইতে তবে সে শক্তি আসিল? যিনি কুম্ভকার হইয়া প্রতিমা গড়িলেন, চিত্রকর হইয়া তাহাকে চিত্র করিলেন, সাজাইলেন, তিনিই আবার পুরোহিত হইয়া তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। অথবা এই কথা বলিলেই ঠিক হয়, যে তিনি স্বয়ংই জীবন হইয়া জীবদেহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই বিশাল বিশ্বদেহের তিনি জীবনী শক্তি, বিশ্বাত্মা পরম পুরুষ। যে আমির এত আড়ম্বর, সে অনন্ত বিধাতার মহাশক্তির প্রকাশ। তাই বুঝি তাহার এত আস্ফালন? এই অবিভাজ্য অদ্ভুত জীবনীশক্তি দৈহিক কর্ম্মেন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের পরিপোষক, পরিচালক। ইহা দ্বারা দেহ আত্মা একত্র সংযুক্ত এবং উভয়ে জীবিত এবং কর্ম্মশীল। ইহা দেহের জীবশক্তি, দেহ এবং বিদেহ আত্মাতে অনন্ত প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ বিচারে এবং মূল তত্ত্বানুসন্ধানে কি কিছু বুঝা গেল? বরং পূর্ব্বাপেক্ষা রহস্য আরো গভীর এবং জটিল হইল। ক্ষুদ্র আমিকেই বুঝিয়া উঠা যায় না, তাহার উপর ইনি যদি আবার অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান বিধাতার আভাস হন, তবে রহস্য খুবই বাড়িয়া গেল। এই পর্য্যন্তই থাকুক, আর বেশী ঘাঁটা ঘাঁটিতে কাজ নাই; শেষ কেঁচো খুড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া পড়িবে! আরম্ভ ত এই খানে, মধ্য এবং শেষ ভাগটা কি, ক্রমে ক্রমে তাহার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথমে অধিক তত্ত্বপ্রিয় হইলে চলিবে না, ঘর সংসার বজায় থাকিবে না। যে জন্য জন্ম গ্রহণ তাহার কাজ অগ্রে হউক। আপাততঃ এখন অনন্তের ক্ষুদ্র গবাক্ষ স্বরূপ আমিত্বের ভিতর দিয়া সেই গভীর রহস্যের অনন্ত ভাণ্ডার বিধাতাকে বিস্মিত বিনীত অন্তরে একটী বার প্রণাম করি, তদনন্তর জীবনগতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিধাতা পুরুষ একাকী গোপনে জননীগর্ভে মানব সন্তানকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া গড়িলেন। কি পদার্থ হইতে কি সুন্দর মূর্ত্তিই উৎপন্ন হইল! জন্মের কথাটা একটু ভাবি। সকলই যাদুকরের ভেল্কীবাজী, ভাবিয়াই বা কি বুঝিব? হে আমি, তুমি তখন কোথায় ছিলে? এক কণিকা প্রোটোপ্ল্যাজম হইতে দিব্যশ্রী নরদেহ। দর্শন বিজ্ঞানে ইহার রহস্য বুঝাইতে পারিল না। পণ্ডিত বিচার করিয়া অণুবীক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন, প্রথমে জেলির মত প্রোটোপ্ল্যাজম্, তাহার পর যাহা ঘটিল তাহার মুখ্য কারণ গূঢ় রহস্যে আবৃত। বিজ্ঞানদৃষ্টির গতি এই খানে অবরুদ্ধ হইল; সুতরাং জ্ঞানী ঘোর রহস্য দেখিয়া বলিলেন, প্রকৃতির অন্তরালে এক অজ্ঞেয় রহস্যশক্তি আছে। তিনি আর আমিত্বের জন্মবিবরণ ভাবিতেও চাহিলেন না। সে দিকে না গিয়া বাহিরে যাহা কার্য্যফল দেখিলেন তাহা লইয়া ইহ জীবনের কার্য্যোপযোগী এক প্রকার চৈতন্যবিহীন বিজ্ঞান দর্শন রচনা করিলেন। যে হেতু তিনি দুর্জ্ঞেয় অতীন্দ্রিয় বিষয়ে অমূল্য সময় নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহেন। ভক্তও মূলাধারে গভীর রহস্য দর্শন করিলেন; কিন্তু তদ্দর্শনে তিনি বিমোহিত, বিস্মিত এবং রোমাঞ্চিত হইলেন। এবং জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে ঊর্দ্ধনেত্রে গদ্গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, "দেব! হে মহাদেব! তুমি অদ্ভুত, তুমি অত্যাশ্চর্য্য দুর্জ্ঞেয় দুরাবগাহ। তুমি কি, তাহা কেবল তুমিই জান। তোমার সৃষ্টিতত্ব, বিচিত্র রচনার তাৎপর্য্য তোমা ভিন্ন আর কেহ জানে না। যেমন তুমি, তেমনি তোমার সৃষ্টি!" মাতৃগর্ভবাসে যখন শিশু ছিল তখন সে মাতারই এক অঙ্গ বিশেষ; সে অবস্থায় তাহার দৈহিক ক্রিয়ার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কিছুই নাই; অথচ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সে বর্দ্ধিত হয়। পান ভোজন শয়নের কি সুন্দর ব্যবস্থা! জননীর রসরক্তে তাহার পুষ্টিবর্দ্ধন, ঠিক যেন বৃক্ষের ফলটি। গর্ভস্থ শিশুর গঠনকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা স্বয়ং বিধাতা, এখানে মায়েরও কোন হাত নাই। যথাসময়ে সুপক্ক ফলটি বাহিরে আসিয়া দেখা দিল।

এইরূপে একটি ক্ষুদ্র পুত্তলিকার ন্যায় দেহ ধারণ করিয়া, তুমি আমি সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছি। চক্ষে দেখি আর না দেখি, অজ্ঞানে মাংসপিণ্ডাকারে নৈসর্গিক নিয়মে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি। যে আমিত্বের এখন এত মান অভিমান,

অহঙ্কার গরিমা তিনি তখন কোথায়? এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্ধান নাই। কেহ তাঁহাকে জানিতেও চায় না। ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি দেখিয়াই সকলে বিমোহিত, আনন্দিত। আত্মারাম যে এই বাহ্য কোলাহল, আহ্লাদ আমোদ, স্নেহ বাৎসল্য ও সাবধানতার মধ্যে লোকের জ্ঞানচক্ষু এবং চর্ম্ম-চক্ষের অগোচরে দেহসংযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে আর কোন ভুল নাই। দুইটি এক সঙ্গেই জন্মিয়াছে;—কেহ বেশী, কেহ কম, এক সঙ্গেই ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিতান্ত কৃপাপাত্র অসহায় শিশুটী ভূমিষ্ঠ হইল। ভূমিষ্ঠ হইয়াই রোদন। কেন রে ছেলে এত কান্না কেন? সকলে আহ্লাদে হাসিতেছে, তুমি কেন আসিয়াই কাঁদিতে লাগিলে? কার্য্যভার অতিশয় গুরুতর বলিয়া কি? কে তোমায় কাঁদিতে শিখাইল? এখন তো তোমার আমিত্ব বিকসিত হয় নাই, তবে এ রোদন কিসের জন্য? এ সব ঠাকুরেরই খেলা। যেন একটি যন্ত্র, ভিতরে যন্ত্রী কল টিপিতেছেন। শিশু যাই কাঁদিল, তৎসঙ্গে অমনি তাহার দৈহিক ইন্দ্রিয়গণের স্বাধীন জীবনক্রিয়া আরম্ভ হইল, মহাসমারোহের সহিত হৃৎপিণ্ড, মাংসপেশী, শিরা স্নায়ু, ফুস্‌ফুস্ নিজ নিজ কার্য্য করিতে লাগিল। এই খানেই জীবের স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সূত্রপাত। জননীর স্নেহবক্ষে ইতঃপূর্ব্বেই শিশুর জীবিকা সঞ্চিত ছিল, কিন্তু তাহার পরিপাক এবং দেহপোষণের ক্রিয়ার নিয়মপ্রণালী এখন হইতে স্বতন্ত্র।

সন্তানের কলেবর বৃদ্ধির জন্য জনক জননীকে ভাবিতে হইল না। মাতার স্তন্য দান, ধাত্রীর সেবা শুশ্রূষা, চিকিৎসকের প্রদত্ত পরামর্শ ব্যবস্থা কেবল উপলক্ষ। ছেলেটিকে কোলে লইয়া সকলেই আদর করিতে চায়। শিশু কাহাকেও অনুরোধও করে না, কাহারো নিকট সাহায্যও চায় না। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনবর্গের হৃদয়ে স্নেহ বাৎসল্য সঞ্চার করিয়া বিধাতা নিরাশ্রয় দুর্ব্বল শিশুকে রক্ষা করেন। কতক ভার বেনামিতে মানুষের হাতে দিয়া অবশিষ্ট গুরুতর কার্য্যভার নিজহস্তে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তিনি রাখিলেন; কারণ, সে সমুদয় অন্যের দ্বারা হইবার নহে। আহা! তিনি স্বহস্তে তাহার জ্ঞান এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি কেমন সুন্দর নিয়মে প্রস্ফুটিত করিলেন! কি এক অনির্ব্বচনীয় জীবনীশক্তি বীজরূপে ইহার ভিতর নিহিত ছিল! শিশুশক্তির অন্য স্বতন্ত্র স্বাধীনতা আর কিছুই দেখা যায় না। তাহার শৈশবসৌন্দর্য্য, মধুর সুকোমল অঙ্গ, স্নিগ্ধ-

কূজনবৎ অস্ফুট মিষ্ট বাণী, হাসি কান্না কে রচনা করিল? শিশু যেন ভগবানের একটি সুন্দর বালগোপাল মূর্ত্তি! প্রথমে সে যখন "মা" শব্দ উচ্চারণ করে, মরি মরি! সে কি সুমিষ্ট ধ্বনি, যেন স্বর্গের দেববাণী! দেখিতে দেখিতে তাহার মুখবিবরে কোমল মাংসের ভিতর কোথা হইতে শ্বেত বর্ণ শক্ত শক্ত হাড়ের দাঁত বাহির হইয়া পড়িল। মানবাত্মার কেমন আশ্চর্য্য অনুকরণ শক্তি! পাঁচ জনের মুখে শুনিয়া কোন্ বস্তুর কি নাম তাহা সে শিখিয়া লইল, তাহাদিগকে চিনিল। মূল বিষয়গুলি একবার শিখিয়া আর কখন তাহা ভুলিল না। এই তাহার প্রথম শিক্ষা। অল্প দিন পরে দেখি যে, সেই ক্ষুদ্র পুঁতুলটি কল্পনাশক্তি প্রভাবে ভাষা প্রস্তুত করে, গল্প রচনা করে, ক্রোধ অভিমান স্বাধীনতার পরিচয় দেয়। ক্রমে সে এইরূপে শৈশব হইতে বাল্যকালে পৌছিল। তখন সরলতার সহিত একটু একটু কুটিলতারও পরিচয় দিতে লাগিল। বাল্যখেলার সঙ্গে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়া সে মাঝে মাঝে দুই একটা মিথ্যা কথা বলে। কে জানে কি সূত্রে নির্দ্দোষ নির্ম্মল হৃদয়ক্ষেত্রে প্রথমে বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। অল্প কাল পরে দেখা গেল, দ্রাক্ষালতা কণ্টকলতার সহিত বিজড়িত হইয়া বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছে। যাহা নির্দ্দিষ্ট নিয়তি ব্যক্তিত্ব বিশেষত্ব তাহার অঙ্কুর বাল্যজীবনেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। অতঃপর সংসারের সাধারণ ছাঁচে পতিত হইয়া সে নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিতে লাগিল। কণ্টক বৃক্ষও বাড়িতেছে, তৎসঙ্গে অমৃত তরুর বীজও প্রস্ফুটিত হইতেছে। ক্রমে জ্ঞান ইচ্ছা ভাব বিকসিত হইয়া রূপ রস গন্ধের ভিতর দিয়া বালককে যৌবনের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

আত্মারামের জন্ম এবং শৈশব বাল্যের কাহিনী আমরা তদীয় স্বহস্তরচিত পাণ্ডুলিপি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। তদনন্তর কৈশোর হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা তিনি নিজমুখে আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। জীবনের সাধারণ ঘটনা সমূহের ভিতর তাঁহার অসাধারণ

অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্রধনুবৎ পার্থিব ঘটনাপুঞ্জের বাহ্যবৈচিত্র্য দৃশ্যে তাঁহাকে ভুলাইতে পারে নাই, অভ্যন্তরে অপার্থিব চিন্ময় সত্তার দিকেই তাঁহার ঝোঁক বেশী। এ সব বৃত্তান্ত তিনি নিজেই বলিবেন, আমাদের অধিক কিছু বলিতে হইবে না। স্মরণশক্তি বিকসিত হইবার পর হইতে আদ্যোপান্ত বিবরণ তিনি এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন ;—

"শৈশব হইতে পাঁচ জনে যাহা করে আমিও তাহাই করিয়াছি। কলে যেমন শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত হয় সেইরূপে প্রস্তুত হইয়াছি। কিছু অধিক বয়সে আমার বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। সহচর বালকবৃন্দের সহিত মিশিয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলাম, তথায় অনেক বিষয় শিখিলাম, কিন্তু শেষ প্রায় সবই ভুলিয়া গেলাম। যাহার সঙ্গে জীবিকার যোগ তাহাই কেবল মনে রহিল। তদনন্তর যৌবনে জীবিকা অন্বেষণ, ক্ষুধা নিবারণ, ইহাতেই অন্যান্য মনোবৃত্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। ক্ষুধা শান্তির জন্য যদি সর্ব্বাগ্রে অন্ন সংগ্রহ না কর, তাহা হইলে সে উদরের নাড়ী ভুঁড়ি পাকস্থালী পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলিবে। এই সর্ব্বগ্রাসী অন্নচিন্তা মানবের দ্বিতীয় প্রকৃতির এক প্রকার বিধাতা। তাহার ভীষণ স্রোতের টানে যখন পড়িলাম, দেখি সেখানে অসংখ্য যাত্রী। ইহাদের উদ্দেশ্যের কি চমৎকার একতা! সব জায়গায় এক বাঁধা দর। নানা জাতীয় মনুষ্য, বিভিন্ন মূর্ত্তি, বিচিত্র বেশ ভূষা, বিবিধ ভাষা, তাবৎ বিষয়েই ভিন্নতা; কিন্তু জীবিকা নির্ব্বাহ বিষয়ে বুদ্ধি প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র একই প্রকার। সকলে মিলিয়া ইহারা একই সুরে গীত গাইতেছে। বুদ্ধি, চিন্তা, কার্য্যকৌশল, কল্পনা সমস্ত উহার অনুরূপ। জীবিকার একতায় বদ্ধ হইয়া বিভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যগণ একসঙ্গে বাণিজ্য এবং রাজকার্য্য করিতেছে; এক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নাস্তিক আস্তিক, শত্রু মিত্র, ছোট বড়, জ্ঞানী মূর্খ এক স্থানে মিলিয়াছে। বিষয়জ্ঞান, বিষয়-তৃষ্ণা, বিষয়ভোগ, স্বার্থসাধন এবং আত্মপোষণ এই সকল উপাদানের সমবায়ে সাধারণ মানবজীবন গঠিত। সর্ব্বত্র বিষয়বুদ্ধির একতা দেখিলে মনে হয়, ইহারা কি এক গুরুর শিষ্য? না ভিতরে ভিতরে পরামর্শ করিয়া এক পথ ধরিয়াছে? একই যুক্তি, একই সিদ্ধান্ত। ভিতরে ক্ষুধা, ইন্দ্রিয়ভোগস্পৃহা; বাহিরে তাহার বিষয় এবং আত্মীয় স্বজনের উত্তেজনা। দুই দিকের চাপে পড়িয়া আমার জ্ঞান বুদ্ধি প্রবৃত্তি সংসারের দিকে অবিশ্রান্ত বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। অনেক টাকা উপার্জ্জন করিব, বাড়ী ঘর বানাইব, বড় লোক হব, সুখ বিলাস সম্ভোগ করিব; এই জপ, এই ধ্যান,

ঐই তপ।। তবু এখনও বিবাহ করি নাই। ভবের পথে বাহির হইয়া দুর্দ্দমনীয় বিষয়বাসনার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ভাগ্যে ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব একটু ছিল তাই রক্ষা, নতুবা গোলেমালে আত্মহারা হইয়া যাইতাম। প্রতিজনের ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্রতা এক আশ্চর্য্য বস্তু; বিষয় কার্য্যের অসীম কোলাহল গণ্ডগোলের মধ্যে ইহা কিছুতেই বিলুপ্ত হয় না, কাহারো সঙ্গে মিশিয়াও যায় না। একই উপাদানে নির্ম্মিত দেহ আত্মা, তথাপি ব্যক্তিত্বের কি অনন্ত বিচিত্রতা! এক হইতে বহু, এবং বহুর ভিতরে একতা; এই লইয়া সমস্ত বিশ্ব স্থিতি করিতেছে।

জনস্রোতের দুর্জ্জয় টানে, ক্ষুধার প্রবল পীড়নে আমাকে একবারে কার্য্যক্ষেত্রে লইয়া গিয়া ফেলিল। একদণ্ড ভাবিতেও দিলে না। আমি কে, কি করিতে আসিয়াছি, কি কাজ আমার স্বভাবোপযোগী, কেন আমি কাজ করিব, তাহার উদ্দেশ্য কি, কেই বা আমাকে এখানে পাঠাইলে? এ সকল বিষয় বিচার সিদ্ধান্তের অবসর পাইলাম না। মৃত্যুর শাসন যেমন অপরিহার্য্য, জীবিতাবস্থায় ক্ষুধার নিকট তেমনি একটী বেলাও ছুটি নাই। সর্ব্বাগ্রে উদরপূজা কর, তার পর অন্য কাজ। এই অপরিহার্য্য অন্নচিন্তার এমনি প্রচণ্ড প্রভাব যে, কেহ মরিলে শোক করিবার অবসর পাওয়া যায় না। পীড়া হইলে শয্যায় শুইয়া দুই দিন বিশ্রাম করিবে, কিম্বা নববিবাহিত বধূকে লইয়া দুই মাস ঘরে থাকিবে তাহারও ছুটি নাই। অধিক কি, মরিবারও অবসর পাওয়া যায় না। তাড়াতাড়িতে পাঁচ রকম উত্তেজনায় পথে বাহির হইয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম, কিন্তু পথ আর ফুরায় না। ক্ষুধা নিদ্রা পরিশ্রম, দিনের পর দিন চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। জীবনচক্রের এই তিনটী নেমি। এক দিন হঠাৎ মনে হইল, যাই কোথা? করিতেছি কি? কিই বা ভাবিতেছি? আমার পথ ত ভুল হয় নাই? কলুর বলদের মত একই পরিধি রেখার মধ্যে, একই পুরাতন অবস্থার ভিতরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, ইহার শেষ কোথায়? যেখানে আরম্ভ সেই খানেই শেষ, অথচ শেষ হয় না। কি বিপদ! যেন আমাকে নিশিতে দিশাহারা করিয়াছে। একটু থমকিয়া দাঁড়াইলাম, গায়ের কাপড় চোপড়গুল একবার ঝাড়িলাম, চোখ দুইটা রগড়াইলাম, পরে একটু বিচার করিতে লাগিলাম।"

"খুব দ্রুত গতিতে দশ জনের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে যাইতে সহসা পথের

মাঝে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকা ইহা একটা নূতন দৃশ্য। মনে মনে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিচার করিতেছি, জীবনের উদ্দেশ্য ভাবিতেছি, মন একটু বেশ স্থির হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে জনৈক পথিক গায় ধাক্কা দিয়া বলিল, 'চল না! মিছে সময় নষ্ট করিতেছ কেন?' আরো কেহ কেহ ঐরূপ উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রমে সেখানে লোক জমিয়া গেল। আমি বলিলাম, 'ভাই আগে উদ্দেশ্যটা ঠিক করিয়া লই, তবেত যাব; নৈলে কোথায় যাই?' সে কথা শুনে সকলে হেসে একেবারে কুটি কুটি। বলে, 'ওল্ড বয়, এখনো তোমার উদ্দেশ্য ঠিক হয় নাই? এত দিন কি তবে ভ্যারেন্দা ভাজিতেছিলে? উদ্দেশ্য ঐ সম্মুখের বিষয়ক্ষেত্র, পথ এই দরাজ পড়ে আছে। প্রাতে উঠিয়া স্নানাহার কর, তার পর মাথায় পাগড়ী বাঁধ, দশটা হইতে পাঁচটা খাট, তার পর বাড়ী এসে খাও, ঘুমাও, আবার পর দিন ঐরূপ কর। এই উদ্দেশ্য। বুঝিতে পারলে কি?' আমি কিছু বুঝিতে না পারিয়া মাঝপথে সঙের মত খাড়া হইয়া রহিলাম। তখন কেহ হাত ধরিয়া টানে, কেহ ধাক্কা দেয়, কেহ পাগল মনে করিয়া ঠাট্টা করে। কিন্তু আমার মনে সে দিন কেমন যে একটা ধোকা লাগিয়া গেল, কিছুতেই আর যেন পা উঠে না। মনে হইল, জীবন মানে কি? ইহা কি একটা নদীর প্রবাহ, না বায়ুর তরঙ্গবৎ কেবলই চলিয়া যাইতেছে? ইহার স্থায়ী নিত্যতা কি? সময় গেল, বেলা নাই, এই কথা প্রতি দিন বলিতেছি, আর তাড়া তাড়ি করিয়া কাজ সারিতেছি। যখন দিন গত হইল, কাজগুলি ফুরাইল, তাহার পর নিদ্রা; আবার নিদ্রার পর অমুক কাজ করিতে হইবে, অমুক অমুক স্থানে যাইতে হইবে। সেগুলি শেষ হইল যদি, আবার কতকগুলি নূতন কর্ত্তব্য এবং সঙ্কল্প আসিল। দিনের পর দিন কাজ ফুরাইতেছে, আবার জন্মিতেছে, তাহার সঙ্গে সুখ দুঃখ আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু থাকে কি? কেবল সময়-স্রোতে ভাসিয়া কতকগুলি সাময়িক কর্ত্তব্য নির্ব্বাহের জন্যই কি এই জীবন? কল্যকার সুখ দুঃখ আশা নিরাশা অদ্য নাই; আবার অদ্যকার অবস্থা কল্য থাকিবে না। অথচ এমনি মায়ার ঘোর, যখন যে কাজটা উপস্থিত হয় সেইটাই যেন জীবনসর্ব্বস্ব। এ জীবনে কত বার শোকে আচ্ছন্ন, বিষাদে ভগ্ন বিষণ্ণ হইয়া কাঁদিয়াছি, আবার মহা আনন্দে পরমোল্লাসে হাসিয়াছি, নৃত্য করিয়াছি, কিন্তু উভয়ই চলিয়া গিয়াছে। দুই অবস্থার দুইটা ছবি এক সঙ্গে দেখিলে মনে হয় মানবজীবন যেন স্বপ্ন কল্পনার খেলা।

কেবলই অবস্থান্তর, রূপান্তর। কিন্তু শেষটা থাকে কি? আমার জীবন কি এ সকলের অতীত নয়? এই পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাচক্রে জীবন গঠিত হয়; কেবল সাধু এবং অসাধু অভ্যাসগুলি আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তাহা হইতে ভবিষ্যতে কর্ম্মফল উৎপন্ন হয়। মন্দ অভ্যাসটা যদি কমিয়া যায়, তাহা হইলে ভাল অভ্যাস ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, তাহার প্রভাবে জীবনে শান্তি প্রসন্নতা সর্ব্বদা বিরাজ করে; অন্যথা মন্দ অভ্যাসেরই দিন দিন উন্নতি; কত দিনে কোথায় তাহার নিবৃত্তি কে বলিবে?"

"মাঝ পথে দাঁড়াইয়া এই সব ভাবিতেছি। কোন এক গম্ভীরাকৃতি ভদ্র লোক কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে, তুমি কোথায় যাবে?' আমি ব্যাকুল ভাবে উত্তর দিলাম, 'মহাশয় আমি কোথা যাব গা!'

বিজ্ঞ। কোথায় যাব কি! তুমি কি পাগল? এত বড় একটা চৌদ্দ-পোয়া সাড়ে চারি হাত লম্বা মানুষ, চেহারাটাও একটু ভদ্র ভদ্র রকম বোধ হচ্ছে, কোথা যাবে তা জান না?

আমি। না, কোথা যাব কিছু বুঝে উঠতে পারিতেছি না। যাবার আর অন্য পথ আছে কি?

বিজ্ঞ। দূর পাগল! তোর যাবারই ঠিক নাই, তবে পথ জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস কেন? এইত প্রকাণ্ড পথ পড়ে আছে, দেখতে পাচ্ছিস না? আবার নূতন পথ একটা তোর জন্য হবে নাকি? আর পথ নাই, যেতে হয় যা, না হয় মর! পথছেড়ে এক পাশে দাঁড়া।

"আমি একটু মুচকে হেসে বল্‌লাম, 'তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।' ভদ্রলোকটী বিরক্ত হয়ে রেগে চলে গেল।"

"আমার চাল চলন কিছু বেয়াড়া দেখে আর এক ব্যক্তি মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওহে তুমি কে?' প্রশ্ন শুনিয়া আমি একটা মহা ভাবনার মধ্যে পড়িয়া গেলাম। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তাহাতে সে লোকটা পুনরায় কর্কশ স্বরে কহিল, 'কে তুমি? কথার উত্তর দেও না কেন?' আমি বলিলাম, 'কি উত্তর দিব, তাই ভাবছি।' কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি কে গা বল না?' সে লোকটা কিছু চটুবাগীশ ছিল, যাবার সময় বলিয়া গেল, "দুঃশালা!"

বলা বাহুল্য যে আত্মারামের একটু ছিট্ আছে; যে পথে অধিকাংশ লোক চলে, সে পথের পথিক সে নয়; তাহার ভিন্ন পথ, ভিন্ন রুচি;

অন্তর্মুখ গতি; এক মিনিট চলে যদি, তবে আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া ভাবে। ব্যস্ততা কি তাহা সে জানে না। গভীর চিন্তাশীল আত্মারামের ভ্রমণবৃত্তান্ত বা জীবনেতিহাস (ইহার ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং জীবনবৃত্তান্ত এক সঙ্গে মিলিত) তিনি নিজেই বলিতেছেন, পাঠকগণ শুনিয়া যান।

"কি করি, শেষ লোকের ধাক্কা খাইয়া উদ্দেশ্যশূন্য মনে আমিও চলিতে লাগিলাম। যখন চলিতে আরম্ভ করিলাম, তখন দেখি, পা আর থামে না। কর্ম্মজীবী মনুষ্য কার্য্যচক্রে পড়িলে আর তাহার ক্ষান্তি নাই। পথে কত রকমেরই মূর্ত্তি দেখা গেল! বলিহারী কারীকর! কত প্রকার ছাঁচই তাঁহার আছে! কার সঙ্গে কারো মিশ খায় না। অসংখ্য অগণ্য নর নারী প্রাচীন প্রাচীনা, যুবক যুবতী, বালক বালিকার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি, বিচিত্র বেশ ভূষা, নানাসুরের কথা, ধরণ ধারণ, ভাব ভঙ্গী, চাল চলন দেখিতে দেখিতে এবং নানা কথা শুনিতে শুনিতে আমার চখে কাণে যেন চটক লাগিয়া গেল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। ভিতরে একটা অদম্য মহাশক্তিস্রোত বহিতেছে, তাহার উপর জড় পশু, মানবের স্থূল দেহগুলি বিবিধ রঙ্গ ভঙ্গে জলবিম্বের ন্যায় উঠিতেছে, ভাসিতেছে, আবার কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে। কেহ ধীরগতি, কেহ দ্রুতগামী, কেহ বিষন্নবদন, কেহ প্রসন্ন চিত্ত; কেহ গম্ভীর, কেহ চঞ্চল। যুবক দল শত অশ্বের বলে ধাবিত হইতেছে, তৎ পশ্চাতে বৃদ্ধ মৃদু পদবিক্ষেপে সমস্ত মাটি মাড়াইয়া হাঁটিতেছে। এক দল লোক নানা সাজে সজ্জিত হইয়া, বাদ্য বাজাইয়া বিবাহিত নব দম্পতীর সঙ্গে আহ্লাদের সহিত চলিতেছে, তাহার পশ্চাতে কতিপয় ব্যক্তি মলিন আর্দ্র বসনে, খালি পায়ে, শোকভারাক্রান্ত মনে আস্তে আস্তে পদ সঞ্চালন করিতেছে। উভয়ের সম্মুখভাগে হঠাৎ ভীষণ "হরিবোল!" শব্দে বিষয়মদান্ধ জীবদিগকে কাঁপাইয়া, শবাধারস্কন্ধে হুঁকা হাতে, গামছা কাঁধে, আর এক দল লোক দেখা দিল। অপরিহার্য্য হুঁকা কলিকা সকল দলেই বর্ত্তমান। এক স্থানে দেখি যে কেবলই ছেলের দল; বন্যার স্রোতের ন্যায়, পঙ্গপালের ন্যায়, দিক্ ছাইয়া তাহারা চলিতেছে। মহারণ্য মধ্যে প্রাচীন মহীরুহের চতুষ্পার্শ্বে ঘনসন্নিবিষ্ট নবীন তরুনিকর যেমন মস্তোত্তোলন করে, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধের চারি ধারে তেমনি ভাবীবংশের শিশু, বালক, কৈশোর, যুবক সন্তানবৃন্দ। কোথাও দেখি, শুভ্রবসনে সুন্দর ভূষণে সুসজ্জিত সুন্দর কান্তি নরনারী প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় মলয় মারুতহিল্লোলে ভাসিয়া যাইতেছে, আবার তাহার পার্শ্বে কলুষ

কর্দ্দমে আপ্লুত অঙ্গাররঞ্জিত কৃষ্ণকায় বিকট মূর্ত্তি সকল ভূগর্ভ হইতে উঠিয়া শ্বেত দন্তপাঁতি বিকসিত বদনে হাসিতে হাসিতে ভূত প্রেতের ন্যায় কৌতুক মদে মাতিয়া গীত গাইতেছে। প্রত্যেকের একই উদ্দেশ্য, কেবল বাহ্য বেশ ভূষা স্বতন্ত্র, আকার বিভিন্ন। কেহ কপালে গণ্ডস্থলে নাসিকায় অলকা তিলকা পরিয়া মালা জপিতে জপিতে, কেহ কোশাহাতে নামাবলী গায়ে স্তব পড়িতে পড়িতে চলিতেছে। মনুষ্য দ্বিবিধ,—পুরুষ এবং স্ত্রী-জাতি। দুইটি দুইটি করিয়া হাত পা নাক চোখ কাণ, এক একটী করিয়া মাথা, দুই দুই পাটী দাঁত সকলেরই আছে, কিন্তু ইহার ভিতর গঠনের অনন্ত বিভিন্নতা; ভিতরের চিন্তা ভাব রুচি ইচ্ছা বাসনা সঙ্কল্প আশার বিচিত্রতার ত অবধিই নাই।"

"মানুষের পার্শ্বে পশু, সুসভ্য সুন্দর শিক্ষিতের পার্শ্বে অসভ্য কদাকার, বর্ব্বর, অসভ্য; উপাদেয় মিষ্টান্ন, সুরসাল ফল এবং সুন্দর কুসুম-মালার পার্শ্বে পূতিগন্ধময় পুরিষের হ্রদ; সুরম্য দেবমন্দিরের পার্শ্বে পর্ব্বতাকার মলিন জঞ্জাল; বিদ্যালয়ের পুরোভাগে অবিদ্যাভবন, নীতিশিক্ষালয়ের পশ্চাতে শুণ্ডিকালয়; ধর্ম্মাধিকরণের পার্শ্বগৃহে মিথ্যা প্রবঞ্চনার আড্ডা; ঠাকুর ঘরের অন্তঃপুরে পঞ্চমকার; বৈরাগ্য আশ্রমের ভিতর আসক্তির বাণিজ্যাগার; বন্দীগৃহের পার্শ্বে দস্যুর নিভৃত কন্দর; শান্তিরক্ষকের দলের মধ্যেও চোর ডাকাত শাসনকর্ত্তা বিচারপতিদিগের ভিতরে অপরাধী বিদ্রোহী দণ্ডার্হ; স্বর্গের কাছে নরক, আবার ঘোর নরকান্ধকার মধ্যে স্বর্গের জ্যোতি।"

"কোথাও দেখি, দুই জন পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিয়া প্রণাম অভি-বাদন চুম্বন করিতেছে; আবার ঠিক তাহারই নিকটে অপর দুই জন বিশাল গাত্রসংঘর্ষণ, এবং বজ্রমুষ্টির বিনিময়ে পরস্পরের অঙ্গে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিতেছে। কেহ হাস্যমুখে মধুর স্বরে প্রেমপূর্ণ বচনে এক জনকে ভালবাসিয়া প্রীত হইতেছে, কেহ বা তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিষাক্ত বাক্যবাণে অন্য আর এক জনের হৃদয়কে বিদ্ধ করিতেছে। কোন গৃহে নবকুমারের ভূমিষ্ঠ-জন্য আনন্দোল্লাস, আবার ঠিক তাহার পার্শ্বগৃহে—কেবল যবনিকামাত্র অন্ত-রাল,—শোকের হাহাকার ধ্বনি। যেখানে নবদম্পতী নবপ্রেমানুরাগে পুলকিত হৃদয়ে সুখসঙ্গীত গাইতেছে; অপর একজন তাহারই অব্যবধানে বসিয়া প্রিয়জন বিরহশোকে চীৎকার রবে আকাশ কাঁপাইতেছে। কেহ

গুরুপক্ক দুষ্পাচ্য উপাদেয় প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুরাশি আকণ্ঠ ভোজন করিয়া চোঁয়া ঢেকুর তুলিতেছে, এবং বলপূর্ব্বক তাহা হজম করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ সোডা ওয়াটার উদরে ঢালিতেছে, ঠিক তাহার গৃহপ্রাচীরের অব্যবহিত সন্নিধানে বসিয়া অনাহারে এক জন জঠরানলে জ্বলিয়া মরিতেছে। এক জনের প্রচুর অর্থ, কোন প্রকার ভোগ্য বস্তুর তাহার অভাব নাই, কিরূপে সে টাকা উড়াইবে এই কেবল তাহার ভাবনা। আর এক জন প্রাণধারণোপযোগী এক মুষ্টি অন্নসংগ্রহের জন্য একটি টাকার ভিখারী। গরিব কিম্বা মধ্যবিধ শ্রেণীর ঘরে ছেলে ধরে না, বর্ষে বর্ষে নূতন নূতন ছেলে মেয়ে; আবার ছেলের ছেলে তস্য ছেলে, মেয়ের মেয়ে তস্য মেয়ে; তন্মধ্যে দুই পাঁচটাকে যদি মা মনসা কিম্বা ওলাদেবী অনুগ্রহ করিয়া লইয়া যান, গৃহস্বামী—ঋণভারগ্রস্ত পরিশ্রান্ত দরিদ্র গৃহস্বামীর তাহাতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই। পক্ষান্তরে ধনী একটি সন্তান অভাবে কখন বেরাল কুকুর ছাগল পোষে, কখন হনুমানের বিবাহ দেয়, কখন বা পিস্‌তুতো সম্বন্ধীর মাস্‌তুত ভাইয়ের ছেলেকে, না হয় খুড়তত শালীর মামাত ভগ্নীর নাতিনীর মেয়েকে পোষ্য গ্রহণ করে। তাঁহার বন্ধ্যা গৃহিণী বৃদ্ধ বয়সে একটি সন্তান প্রসব করিয়াছিল, সেও মরিয়া গিয়াছে; কাজেই তিনি প্রচুর ভোগৈশ্বর্য্য সত্ত্বেও দুঃখ শোকে জর জর, মর মর। এক জন পুরুষানুক্রমে আইবুড়; সর্ব্বস্ব বেচিয়া একটি কাণা কন্যাকে বেচারী বিবাহ করিয়াছিল, আহা! সেও বাঁচিল না; আর কুলীনের ঘরে গণ্ডায় গণ্ডায় বউ, কেইবা তাহাদের ভাত কাপড় যোগায়, কেইবা তত্ত্ব লয়! সুবিদ্বান্ বাঙ্গালী বাবু অর্থাভাবে বাড়ী বাঁধা দিয়া কন্যাদায় উদ্ধার হন, কোনরূপে শরীরটি তিনি আত্মার সহিত একযোগে রক্ষা করেন; পক্ষান্তরে নিরক্ষর নেংটীপরা মাড়োয়ারির ঘরে টাকার যখ। এবম্বিধ বিচিত্র বিমিশ্র আশ্চর্য্য দৃশ্য দরশন করিতে করিতে সংসারস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া চলিতে লাগিলাম। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল, কি এ সব কারখানা! ইহার মানে কি?"

অতঃপর আত্মারাম বাবুর আর কোন বিশেষ সংবাদ বহু দিন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আমাদের সঙ্গে যদিও তাঁহার বেশ আলাপ পরিচয় ছিল, প্রথম হইতে আমরা তাঁহাকে জানিতাম এবং ভালবাসিতাম; কিন্তু তিনি কখন কোথায় যাইতেন, কি ভাবিতেন, কি তাঁহার অভিপ্রায়, এ সকল

আমরা সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। যখন দশ জনের সঙ্গে মিলে মিশে তিনি চলিতেন, তখন বেশ ভদ্রলোকের মত বুদ্ধিমান্ কার্য্যক্ষম কর্ত্তব্য-পরায়ণ বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি জটিল দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকাবৎ এক বৈজ্ঞানিক পদার্থের মত হইয়া পড়িতেন। এইজন্য সময়ে সময়ে আমরা তাঁহার বেশী খোঁজ খবর লইতাম না। যৌবনে পদার্পণ করিয়া আমাদের বন্ধু কিছু কালের জন্য এমনি ডুব দিয়াছিলেন, যে একবারে যেম নিরুদ্দেশ। তার পর অনেক বৎসর পরে হঠাৎ এক দিন আসিয়া দেখা দেন এবং পুনরায় তাঁহার জীবনকাহিনী আমাদিগকে শুনান। আত্মারামের ইহ পরলোকের সমস্ত বিষয়েই বিশেষ মতামত ছিল। তিনি কোথায় কি ভাবে এই দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করেন, তদ্বিবরণ আমরা পরের অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চতুর্থ অধ্যায়।

আত্মারামকে কিছু মজার লোক দেখিয়া আমরা সময় সময় তাঁহাকে ডাকিয়া কাছে বসাইতাম এবং নানা প্রকার গল্প শুনিতাম। ইঁহার মতামত, সিদ্ধান্ত, চিন্তাপ্রণালী, দর্শন, সকলই উদ্ভট; সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক কি ধর্ম্মনৈতিক সমস্ত বিষয়েই তাঁহার আধ্যাত্মিক গবেষণার কিছু আধিক্য লক্ষিত হইত। এইজন্য আমাদের নিকট ইহা নূতন বলিয়া বেশ ভাল লাগিত। সহসা বহু দিন পরে পুনরায় তাঁহার দেখা পাইয়া উক্ত কতিপয় বৎসরের গুপ্ত বিবরণ আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহা এইরূপ। তিনি বলিলেন;—

"ভাই, আমি কোথায় এত দিন কি ভাবে যে ছিলাম, তাহা বিস্তারিতরূপে বলিতে পারি না; কারণ, আমার দেশ কাল সম্বন্ধে বিশেষ সংস্কার বড় নাই; তবে ঘটনা গুল যাহা মনে আছে বলিতেছি, স্থান কালের মোটামুটি যাহা পারি তাঁহারও হিসাব কিছু কিছু দিতে পারিব।"

"পৃথিবীর বিচিত্র দৃশ্য, মানবস্বভাবের অদ্ভুত রহস্য দেখিয়া আমার জ্ঞান-কৌতূহল অতিশয় বাড়িতে লাগিল। ইহার অনিবার্য্য পিপাসা চরিতার্থের জন্য আমি কেবল যে প্রকৃতির গূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতাম তাহা নহে, নানা প্রকার মনুষ্যসম্প্রদায়ের ভিতরেও মিশিতাম। আমার কূট প্রশ্ন এবং

সমাজবিদ্রোহী অভিনব জটিল মত সকল শুনিয়া আমাকে পাগল মনে করিয়া অনেকে হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু একবারে তাহা পারিত না। সহজজ্ঞানের সত্যের এমন এক আশ্চর্য্য দৈবপ্রভাব আছে যে তাহা প্রচলিত সংস্কারের বিপরীত হইলেও অতিশয় গুরুভার। এইজন্য অনেকে আবার কৌতূহলী হইয়া আমার কথা শুনিত। কেহবা মুখে অস্বীকার করিয়া মনে মনে তাহা স্বীকার করিয়া লইত।”

“যখন আমি পূর্ণযৌবনে পদার্পণ করিলাম, যখন দেহটি হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ এবং কার্য্যক্ষম হইল, বিষয়বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, পার্থিব কামনা সকল ফুটিয়া উঠিল, তখন কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতে শিখিলাম। এ দিকে ভিতরে ভিতরে অলক্ষিতভাবে দেখি যে “আমিত্ব” জ্ঞানটি বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমি এক জন ব্যক্তি, আমার জ্ঞান বুদ্ধি ক্ষমতা আছে, আমি স্বাধীন স্বতন্ত্র জীব, এই এই বিষয় আমার অধিকৃত; ঈদৃশ সংস্কারে মন পরিপূর্ণ হইল। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ মনের একান্ত অধীন হইয়া কার্য্য করে; এতই ইহাদের কার্য্যের ব্যস্ততা, যে জ্ঞানানুশীলন বৃত্তিকে ইহারা মাথা তুলিতে দেয় না। যে টুকু জ্ঞান বুদ্ধি ইচ্ছাশক্তি জন্মিয়াছিল তাহা আর আত্মার রাজ্যে গেল না, কেবল ইন্দ্রিয়রাজ্যে মনের প্রজা হইয়া দেহগর্দ্দভের সেবায় নিযুক্ত রহিল। দৈহিক এবং তাহার সমষ্টি সামাজিক অভাব মোচন, এবং তাহার উন্নতি বর্দ্ধন-জন্য এ সময় আমি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতাম। যন্ত্রের দ্বারা শিল্প সামগ্রী যেমন অনায়াসে গঠিত হয়, দৈহিক এবং সামাজিক জীবন তেমনি আপনাপনি নির্ম্মিত হইয়া গেল, সেজন্য বিশেষ কিছু চেষ্টা যত্ন করিতে হইল না। দেখি যে ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতে নিজ নিজ বিষয় সকল কোথা হইতে খুঁজিয়া আনে। তৎসংক্রান্ত বুদ্ধি এবং সংস্কার স্বভাবতঃ বেশ স্ফূর্ত্তি লাভ করিল। কোথায় গেলে কি করিলে দুইটি টাকা আসে, কিরূপ প্রণালীতে পান ভোজন বিলাস সম্ভোগ এবং অন্যান্য স্বার্থ স্বচ্ছন্দে সম্পাদিত হয়, কিরূপ ভাবে চলিলে আত্মাভিমান সম্ভ্রমলালসা সম্যক্‌রূপে চরিতার্থ করা যায়, এ সমস্ত কাহারও নিকট আর বড় শিখিতে হইল না। ইন্দ্রিয়সেবাযজ্ঞের সমারোহের মধ্যে আমিত্বেরও প্রাদুর্ভাব দিন দিন খুব বাড়িয়া উঠিল। ষণ্ডা-মার্কের ন্যায় সে কেবল “আমি” “আমি” বলিয়া মহা চীৎকার করে। অভি-মানে, ষড়রিপুর উত্তেজনায়, স্বার্থ প্রলোভনে তাহাকে এমনি স্থূল মনে হইত, যেন একটা প্রকাণ্ড জন্তু বিশেষ। তখন কেবা তাহার স্বরূপাবস্থা দেখিতে

চায়, কেইবা দেখিতে পায়, কেইবা তাহাকে শাসন করে; সমস্ত জীবনই যেন ইন্দ্রিয়াসক্তি। ক্রোধ, লোভ, স্বার্থ, অভিমান ইত্যাদি যখন যাহার কার্য্যের সময় আসে, তখন মনে হয় যেন জীবনটা তন্ময়। ইহা ব্যতীত মানবজীবনের স্বতন্ত্র কোন নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় অস্তিত্ব আছে কি না, তখন আমি দেহরাম কি আত্মারাম, এ কথাটা একবারে ভুলিয়া যাই। আমি ক্রোধ-রাম, আমি স্বার্থরাম, হিংসারাম, আমি লোভরাম, এইরূপই জ্ঞান জন্মে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমি স্বরূপতঃ কি, তাহা জানিবার অবসর থাকে না। কিন্তু এই যে ষড় রিপু, ইহা বাস্তবিক কি ছয়টা? না একটা? ইহাদের কার্য্যবিভাগ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু আমার বোধ হয়, একটার মধ্যেই ছয়টা অঙ্গ বিশেষ; প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকটার নিগূঢ় দুশ্ছেদ্য যোগ আছে। কারণ, দেখিতে পাই, ইহারা এক অন্যকে আত্মীয় জানিয়া সর্ব্বদাই সহায়তা করে। বাহ্য বিষয়ের স্বতন্ত্রতানুসারে, ছয় জনের ক্রিয়ার বিশেষত্ব লক্ষিত হয় মাত্র, কিন্তু ইচ্ছাটা একই। একান্নভুক্ত রিপুপরিবারে কি সুন্দর ভ্রাতৃভাব! কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। বাহ্য আকর্ষণ, অভ্যস্থ রুচি, ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় এবং আন্তরিক কল্পনা, ইহা দ্বারা যে প্রবৃত্তিমূলক ইচ্ছা উত্তেজিত হয়, তাহাই ষড়রিপু নাম ধরিয়া ছয় প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে। নিবৃত্তি বা বিবেকমূলক ইচ্ছা ভিন্ন উক্ত প্রবৃত্তিমূলক ইচ্ছার গতি রোধ করা যায় না; কেবল মৃত্যুভয় এবং স্বার্থহানির আশঙ্কা সময়ে সময়ে তাহাকে কিছু কিছু বাধা দিতে পারে।"

আত্মারাম এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই, সুতরাং পারিবারিক জীবনের সুপরিপক্ক বাসনা প্রবৃত্তির যে দুরতিক্রমণীয় শক্তি তাহা এখনো তাঁহার অপরিজ্ঞাত। আমাদের উদ্ভটচরিত্র চিন্তাশীল বন্ধুর কথিত বৃত্তান্ত সকল আনুপূর্ব্বিক না শুনিলে আসল ব্যাপারটা বুঝা যাইবে না, কিন্তু তদ্বিষয়ে পাঠক মহাশয়দের কত দূর ধৈর্য্য থাকিবে তাই আমাদের ভয় হইতেছে। আত্মারামের বর্ণিত এই অদ্ভুত কাহিনীর মধ্যে এক অংশ ইতিহাস, অপরাংশ বিজ্ঞান, মধ্যে মধ্যে দুজ্ঞেয় মিশ্রিত। স্থানে স্থানে কাব্য এবং কবিত্বেরও রস আছে। সচরাচর ভদ্র লোকেরা যেরূপ সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে চিন্তা ও কার্য্য করেন, তাঁহাদের মতামত যেমন নির্দ্বন্দ্ব নিরীহ এবং প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, আত্মারাম ভায়ার চিন্তা সেরূপ নহে। তাঁহার উদ্ভট মত সকল শুনিলে হঠাৎ লোকে চটিয়া যায়। এরূপ ব্যক্তির সমস্ত মন্তব্য বিচার নিষ্পত্তি অনেকের পক্ষে

যে সন্তোষকর হইবে না তাহা বলা বাহুল্য ; আমরাও তাঁহার সব কথায় সায় দিই না ; তবে কোন অংশ বাদ দিলে না কি আমাদের কর্ত্তব্যের হানি হয়, এই জন্য আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। কিন্তু সকলের সঙ্গে মতে মিলুক না মিলুক, আত্মারামের কোন কথা অর্থহীন চিন্তাহীন নহে। যৌবনসুলভ ভোগস্পৃহা সংসারবাসনার মধ্যেও তিনি কোন দিন স্থূলদর্শী অবৈজ্ঞানিক ছিলেন না। সমস্ত বিশ্ব যেন তাঁহার চক্ষে চিদানন্দের স্বচ্ছ একটী সুন্দর আবরণ বিশেষ। তোমার আমার দৃষ্টিশক্তি যেখানে বাধা পাইয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং আহাম্মকের মত অন্তরশূন্য হইয়া ফিরিয়া আসে, আত্মারামের অধ্যাত্ম দৃষ্টি তাহার অন্তর ভেদ করিয়া একবারে যেখানে গোড়া সেই অনাদি অনন্তে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সেখানকার গূঢ় সমাচার মুখে করিয়া আনে। তাহার পরের কথা এখন সকলে শ্রবণ করুন।

"এইরূপে বেড়াই, কাজ কর্ম্ম করি, খাই ঘুমাই, জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টায় ফিরি। এই সংসার যদিও বিষয় বাণিজ্য লইয়াই জীবিত, কিন্তু এখানে চাকরী সংগ্রহ করা বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অনেক ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা, অনেক নীচতা স্বীকার আবশ্যক। উমেদারের জীবন বড় ঘৃণিত জীবন। পথে পথে, আফিসে আফিসে ঘৃণা অপমান ধমক খাইয়া, প্রতিকূল অবস্থার সহিত বহু সংগ্রাম করিয়া একটু চাকরী জুটিল। কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে? চাকরী জোটানো যেমন বিড়ম্বনা, কিছু দিন তাহা সাধন করাও তেমনি বিড়ম্বনা। সকলেই ধমক দেয় ;—দপ্তরী চাপরাশি পর্য্যন্ত। প্রথম প্রথম বৈষয়িক কর্ত্তব্যের জন্য অভিভাবকেরা তাড়না, ভর্ৎসনা করিতেন ; এক্ষণে আর কাহাকে কিছু বলিতে কহিতে হয় না। পান ভোজন নিদ্রা জাগরণ যেমন সহজ কার্য্য, তেমনি দৈহিক জীবনের দৈনিক কার্য্য বেশ অভ্যস্ত, এবং সহজায়ত্ত হইয়া গেল। তজ্জন্য যে কিছু ভাবনা চিন্তা, বিচার মন্ত্রণা, সংকল্প কল্পনা তাহাও আপনা হইতে যাতায়াত করিতে লাগিল। বহির্ম্মুখে যাইবার জন্য এই সকল প্রবৃত্তি ধাঁ ধাঁ করিয়া বাড়িয়া উঠে। থামাইতে গেলেও থামে না ; তেমন ইচ্ছাও হয় না যে থামুক। ইহার মধ্যে আবার দেখিতাম, বিদ্যুতের ন্যায় পরদুঃখমোচনের নিমিত্ত একটু একটু ইচ্ছা হয়। পথে কিম্বা দ্বারে কাঙ্গালী ভিখারী অন্ধ খঞ্জকে কিছু কিছু দিতাম। দেশের হিতোদ্দেশে যেখানে যখন সভা সমিতি সদনুষ্ঠান

হইত, সম্ভবমত তাহার সঙ্গে মিশিতাম, কখন বা দুই পাঁচটা কথা বলিতাম। ভাই ভগিনী আত্মীয় অভিভাবক প্রতিবাসীদিগকে সেবা করিতে এবং ভালবাসিতেও ভাল লাগিত। কিন্তু এ গুলি তত প্রবল নহে, গাঢ় অনুরাগ এবং আসক্তিমূলক নহে, কতকটা যেঁন সখের হিসাবে। আসল প্রাণের প্রধান স্রোতটা এই দিকে, যে কেমনে শরীরটী সবল সুস্থ সুন্দর হইবে, ভাল খাব ভাল পরিব, ভাল স্থানে থাকিব, স্বাধীন ভাবে সুখে স্ত্রী পুত্র সহ সভ্য সমাজে মান্য গণ্য হইয়া নিরাপদে কাল কাটাইব। দিবা নিশি এই চিন্তা এই বাসনা। বিবাহ করিয়া বউ আনিব, ঘর সাজাইব, বউকে ভাল ভাল কাপড়, গহনা দিব, গায়ে আতর গোলাপ মাখিব, বেতন বাড়িবে, শ্বশুরবাড়ী গিয়া আমোদ করিব, এই সমস্ত মিষ্ট চিন্তা এবং সুমিষ্ট ভাবীকল্পিত সুখের আশায় হৃদয়কে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। এমন কি, তজ্জন্য কত রাত্রি ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিতাম না। সুতরাং অন্যান্য সৎকার্য্য সচ্চিন্তা অপেক্ষা এই বিভাগের প্রবৃত্তি গতিশক্তি মহাবেগে নিরন্তর ধাবমান হইতে লাগিল। যত দিন যায়, ততই অভ্যাসগুল বর্দ্ধিত এবং সুপক হয়।"

"এক একবার মাঝে মাঝে যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। তখন ভাবিতাম, আমার নাম ত আত্মারাম, কৈ তাহার তো কোন খোঁজ খবর লওয়া হইতেছে না। প্রবৃত্তির কার্য্যেই দিন চলিয়া যাইতেছে, কৈ নিবৃত্তি এবং সৎপ্রবৃত্তির কোন কার্য্যত দেখি না। জড় দেহ সম্বন্ধীয় কার্য্যগুলি অন্ধ শক্তির কার্য্য; একটু পথ দেখাইয়া একটী বার ঠেলিয়া দিলেই হইল, অমনি গড় গড় করিয়া চলিতে থাকে। খুব যদি বাধা প্রতিঘাত পায়, তবে একটু থামে; কিন্তু হয় বামে, না হয় দক্ষিণে, না হয় পশ্চাতে আবার সেই প্রতিঘাতের গতিতে প্রধাবিত হয়। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী মন স্বীয় সহচরবৃন্দের সহিত উক্ত অন্ধশক্তিকে নিজগুণে নিয়তই ঠেলিতেছেন, সে জন্য আর অন্য বিধ চেষ্টা যত্নের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। ভাবিতাম, যেমন ক্ষুধা পায়, ঘুম পায়, এবং আর আর সকল দৈহিক ক্রিয়া পায়, আত্মার ধর্ম্ম নীতির কার্য্য সেরূপ 'পায়' না কেন? আপনাকে আপনি ভাবিতেও ইচ্ছা করে না, শরীর লইয়াই ব্যস্ত। এটাও স্বভাবের কার্য্য, ওটাও স্বভাবের কার্য্য; তবে সমান ভাবে স্বাভাবিক নিয়মে কেন উভয়ের কার্য্য চলে না? বিষম সমস্যার কথা।"

"ছেলে বেলা হইতেই দেখি, যে কথা কহিতে বা যে কাজটা করিতে অভিভাবকেরা নিষেধ করে, বালক তাই আগে করিতে যায়। ও আমাকে

শুধু শুধু আগে কেন মারবে, আমিও মেরিছি, গায়ে থুথু দিইছি। এই তাহার যুক্তি। যেটা নাড়িতে বারণ করিবে সেইটায় আগে গিয়া হাত দিবে। আহারের সময় "ও কেন বেশী পাবে! আমি কেন কম নেব? আধ খানা নেব্ না, সব দেও।" দৈহিক সুখলালসার স্বার্থ এই খান হইতেই আরম্ভ হয়। আদমের সন্তান কোথায় কোন্ দিন গোপনে নিষিদ্ধ ফল ভোজন করিয়াছে, তাহারও প্রথম পরিচয় এই খানে। অরণ্যবৃক্ষ, কণ্টকবন অযতনে অধিক বৃদ্ধিশীল; দগ্ধ মৃত্তিকা, মরুভূমিতে তাহার আরো অধিকতর তেজ। আধ্যাত্মিক ধর্ম্মনৈতিক বৃত্তির মূলেও স্বভাব আছে, কিন্তু তাহার উৎপাদনী শক্তি উৎকর্ষসাপেক্ষ, যত্ন চেষ্টা শিক্ষা শাসন সৎসঙ্গ ব্যতীত তাহার বিকাশ হয় না। জ্ঞান বাড়িবে, বিচারশক্তি জন্মিবে, সদসৎ বিবেক বিকসিত হইবে, তদনন্তর ভগবানের বিশেষ কৃপার আলোক তাহাতে পড়িবে, তবে সে সব ফুটিয়া উঠিবে। তদ্বিষয়ে অনুরাগ, সুরুচি জন্মিতে অনেক সময় লাগে। এক থাল গরম গরম লুচি পটোল ভাজা রসগোল্লা পানিতোয়া গ্রহণের জন্য রসনা যত শীঘ্র প্রস্তুত, একটু ভগবচ্চিন্তা, আত্মসংযম, সাধুদর্শন বা হরিসঙ্কীর্ত্তনের জন্য হৃদয় তত শীঘ্র আগ্রহ প্রকাশ করে না। বলপূর্ব্বক করাইতে হয়। রূপ রস গন্ধ স্পর্শসুখের জন্য মন যেমন সপরিবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে, অরূপ সচ্চিদানন্দের দর্শন শ্রবণ স্পর্শ এবং অমৃত রস পানের নিমিত্ত আত্মা সহজে তেমন ব্যাকুল নহে। অতীন্দ্রিয় বিষয়ে সহজে বিশ্বাসই জন্মে না। পূজার ঘরে যাও, ফুল চন্দন ধূপ ধূনা দিয়া তাহাকে গন্ধে আমোদিত কর, সুকোমল অজিনাসনে স্থির ভাবে উপবিষ্ট হও, স্তব স্তোত্র গাথা বন্দনা সঙ্গীত শ্রবণ কীর্ত্তন কর, বীণা মৃদঙ্গ শঙ্খ ঘণ্টা বাজাও, মুদ্রিত নয়নে বদ্ধকৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষণ কাল বসিয়া থাক, তার পর কিছু ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ হইবে। আর যদি মন মহাশয় উৎপাত আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সকল আয়োজনই ব্যর্থ; বাহিরেও সংসার, ভিতরেও হাট বাজার। এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা গেল, দেহ যৌবন সীমা পার হইয়া বার্দ্ধক্যের সীমায় পৌছিলেও, আত্মার হাতেখড়ী আরম্ভ হয় না। ইহার জন্য আর এক রাজ্য, নূতন শিক্ষক, অভিনব শিক্ষা-প্রণালী, নবীন আদর্শ, বিশুদ্ধ জল বায়ু, নির্ম্মল আকাশ, স্বর্গীয় অন্ন পান আবশ্যক। এক প্রকার নূতন জন্মের দরকার। ইহলোকের নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে সকলের পক্ষে তৎসমুদায়ের আয়োজন হইয়া উঠিবে কি না সন্দেহ।"

"বন্ধুগণ! জীবনে অনেক দিন এমন চলিয়া গিয়াছে, যে সময় আত্মা কি, তাহার ধর্ম্মোন্নতির আবশ্যকতা আছে কি না, ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে তাহা জানিতেও পারি নাই। যে বিষয়ে আদৌ অভাব বোধ ছিল না, তাহা মোচনের জন্য কি কখন ইচ্ছা হয়? বরং সে সমস্ত আপাতরম্য সুখ বিলাসের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া তৎপ্রতি বিরক্তি জন্মিত। শারীরিক সুখসাধন, বিষয় সম্ভোগেও অনেক ক্লেশ কষ্ট ত্যাগস্বীকার আছে সত্য, কিন্তু তবুও তাহা ভাল লাগে। ধর্ম্ম নীতির উৎকর্ষ সাধন তেমন রুচিকর লোভজনক বোধ হয় না, তাহাতে কেবল কষ্টই জ্ঞান হয়। কাজেই যাহা ভাল লাগে তাহারই দিকে মন ছোটে, যাহা ভাল লাগে না তাহাতে বিরক্তি জন্মে। ভবিষ্যতে কবে মঙ্গল হবে, সে কি প্রকার মঙ্গল, তাহার কিছুই জানা নাই। স্বয়ং ভগবান্ আসিয়া যদি বলেন, "বাপু, দুই দিনের সুখের মোহে কেন ভুলিয়া রহিয়াছ, অনিত্য দেহ কোন্ দিন ধ্বংস হইয়া যাইবে, এখানে কত রোগ, শোক, ভয় ভাবনা, "মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকি"; অতএব এ সব মায়ার আসক্তি ছাড়িয়া চল! তোমার জন্য ইহা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দজনক নিত্য স্বর্গ সাজাইয়া রাখিয়াছি, তাহা ভোগ করিবে চল!" মন বলে, 'ঠাকুর, এখন নয়, পরে এ বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিব। এখন আপনি বাড়ী যান, বেলা হইয়াছে, আমার অনেক কাজ, সময় নষ্ট করিতে পারিব না।' প্রকাশ্যে এই বলিয়া, সে ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হইয়া বলে, 'হাঁ! আমি সাজানো গোছানো সংসারটি ফেলে, সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে এখন নিরাকারের পাছে পাছে আকাশ চিবাইয়া বেড়াই! ও সব ছেঁদো কথার মানে বুঝ্‌তে পারি না। নিরাকার কি একটা পদার্থ? তুমি সরে পড় গোসাঞী, আমার এখন মৌতাতের সময়। বেশ আছি বাবা, কোথায় কোন্ দেশে গিয়া নিরাকার অন্ধকারমধ্যে পড়ে প্রাণ হাঁপ হাঁপ করবে, এক কল্‌কে তামাকও কেউ দেবে না। স্বর্গ ফর্গ সব মিছে, খাও, ঘুমাও, আমোদ কর; বস্! এই সার বুঝিছি।' এই বলিয়া বৃদ্ধ শান্ত শিষ্ট ভগবানকে কত বারই বিদায় করিয়া দিয়াছি! তিনি আর কি করেন, ছেলের বিদ্যা বুদ্ধি দেখে শুনে অবাক্। স্বাধীনতা দিয়াছেন, বলপূর্ব্বক কিছু করিতেও পারেন না; যাহা কিছু করিতে হইবে বুঝাইয়া করিতে হইবে। চৈতন্য জগতের কাজ জড়ের নিয়মে অন্ধভাবে আরম্ভ হয় না, সুতরাং তাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। চৈতন্যের উদয় করিয়া দিয়া তার পর আধ্যাত্মিক জীবন

গঠন করিবেন। দেহলীলা এখন আরম্ভ, এ সময় আত্মতত্ত্বের কথা ভাল লাগে না। জ্যাঠামো জ্যাঠামো বোধ হয়। স্বভাবতঃ যত দূর হইয়া উঠে তাই ভাল। কিন্তু সব সময় এ কথা খাটিত না। কখন কখন চিত্ত শান্ত গম্ভীর হইলে সে ভিতরে যাইবার জন্য পথ খুঁজিয়া বেড়াইত। বিচিত্র বিশ্বের রঙ্গভূমির সুদৃঢ় যবনিকার অন্তরালে নাট্যকার একা বসিয়া কি করিতেছেন, কাহাকে কিরূপে সাজাইতেছেন তাহা দেখিবার জন্য এক এক বার মন বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইত। কিন্তু আমার মত যুবা লোক তথায় বালকের ন্যায় গণ্য। কে যেন ধমক দিয়া বলিত, "যা ছোঁড়া খেলা কর্‌গে যা! এ দিকে আসিস্ না, ভয় পাবি, পালা!" বিধাতার সাজঘর কিন্তু ভাই দেখতে বড় ইচ্ছা করে। সেই কত দিন থেকে ঘরে প্রবেশ করবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি, আজ পর্য্যন্ত দরজা খুলতে পারলাম না। খুব জোরে ধাক্কা দিলে খোলে, কিন্তু জোর কৈ?"

পঞ্চম অধ্যায়।

আত্মারামের কোন কথা গোপন করা নাই। সমস্তই যখন আত্মদৃষ্টির সম্মুখে প্রমুক্ত, তখন আর গোপনের প্রয়োজন কি? এই তাঁহার কথা। আত্মা দেহরাজ্যের অধিপতি হইয়া কখন কি ভাবে চলিয়াছিল, স্বভাবের অযত্নসম্ভূত কার্য্য কোথায় কিরূপ হইয়াছিল, সমস্তই তিনি আমাদের নিকট বলিয়াছেন। তদনন্তর স্বভাব আপনি আপনাকে কেমন সংশোধন করে, সুশিক্ষা এবং সুশাসন দ্বারা কেমন সে যথাসময়ে সংস্কৃত পরিমার্জ্জিত হয়, তদ্বিবরণও আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি।

আজ কালের লোকেরা যেমন কৃত্রিমতা ভালবাসে, নিজেদের যথার্থ ইতিহাস না বলিয়া যেমন তাহারা আপনাদিগকে প্রথম হইতে শুকদেব গোস্বামীর ন্যায় জন্মযোগীরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, আমাদের বন্ধু সে ধাতুর লোক ছিলেন না। তিনি স্বভাবদর্শী, যাহা ঘটে সত্যদৃষ্টিতে তাই দেখেন, এবং তাই বলেন। পরকে যে চক্ষে দেখেন, আপনাকেও ঠিক সেই চক্ষে নিরপেক্ষ ভাবে দেখিয়া থাকেন; অথচ ইহারই ভিতরে দেবত্বের গৌরব, অনন্তের মহত্ব, মানবের নিয়তি ও আদর্শের সহিত তাহার সাময়িক ঘটনা

পুঞ্জের গভীর তারতম্য স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। লোকাচারত্যাগী স্পষ্টবাদী সরলচিত্ত আত্মারামের কঠোর কর্কশ মন্তব্যগুলি যথাশ্রুত মৌলিক ভাষায় মুদ্রিত করিলে আমাদের পুস্তক মূল্য দিয়া কেহ লইবে কি না তাই ভয় করি, নতুবা তাঁহার মতামতের জন্য আমাদের কোন দায়িত্ব নাই। তদীয় বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে যদি রাজবিদ্রোহিতা, সমাজবিদ্রোহিতা, প্রচলিত প্রথা-বিদ্রোহিতা কিম্বা শ্রেণীবিশেষের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা কিছু থাকে, তজ্জন্য তিনিই দায়ী। কিন্তু তাহার আমাদের কোনই ভয় নাই। তিনি আত্মারাম, সুতরাং কোন সামাজিক কিম্বা রাজদণ্ড তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। এক স্থানে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, "আমি ভাই নিন্দা প্রশংসার ধার ধারি না; বিশ্বরাজ্যে যেখানে যাহা সত্য ঘটনা, প্রকৃত অবস্থা দেখিয়াছি তাহাই বলিতেছি; যেটা নয় তাহা কেন বলিব? যদি বল তোমারও ভুল হইতে পারে। আমারই যে ভুল তাহার প্রমাণ কি? তোমার ভুল নয় কে বলিল? ঠিক ঠিক যাহা দেখিয়াছি তাই বলিতেছি। যদি বল যে, 'কথা ঠিক বটে, আমরাও তাহা মানি, স্বার্থের অনুরোধে প্রতিবাদ করি আর যাই করি তোমার কথা ঠিক। কিন্তু জুগোপিষা বলিয়া একটা কথা আছে।' আবার কিন্তু কেন? জুগোপিষা, জিঘাংসা, চিকিমিষা আমার কাছে নাই। যা তাই, ইহার আর কিন্তু পরন্তু কি?"

পাঠক মহাশয়েরা এখন দেখুন, আত্মারাম কেমন শক্ত লোক। এই জন্য আমরা তাঁহার কথিত ভাষার একটু আধটু এ দিক ও দিক করিতে সাহস পাইলাম না, যেমনটী শুনিয়াছি ঠিক কড়ায় গণ্ডায় মিলাইয়া তেমনিটী লিখিয়া যাইতেছি। অবশ্য উপরের ঐ কথাগুলি তাঁহার শেষ জীবনের, যৌবন কালের নহে। কিন্তু যৌবনেও অর্থাৎ বিবাহের আগেও এই সকল অদ্ভুত ভাবের আভাস তাঁহার জীবনে অনেক দেখা গিয়াছিল। এক্ষণে আত্মারামের বিবাহ এবং ঘরকন্নার কথা সকলে শ্রবণ করুন।

"প্রথমে অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার বিবাহ করিতে বড় একটা ইচ্ছা ছিল না। ভাবিতাম, বিবাহ করিলে আত্মোন্নতি, জ্ঞানচর্চ্চা এবং দেশ উদ্ধারের কার্য্যে ব্যাঘাত হইবে। এই ভাব লইয়া নানা স্থানে বেড়াই, লোকের সঙ্গে তর্ক বিচার করি, পারিবারিক এবং দাম্পত্য জীবনের গভীর আধ্যাত্মিক বড় বড় সব কথা বলি, লিখি। ইহাতে পাড়াপ্রতিবাসী আত্মীয় সহচরেরা ভারি বিরক্ত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ পিতা এবং অপর আত্মীয়বর্গ আমার বিবাহ

বিষয়ে মতামত শুনিয়া বড় দুঃখ প্রকাশ করিতেন। ইহার উপর আবার পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলিয়া তাঁহাদের মন খারাপ করিয়া দিয়াছিল। আত্মচিন্তা এবং তত্ত্বদর্শিতার আধিক্য বশতঃ আমি সে সময় যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে বড় তর্ক করিতাম; কেন না, প্রচলিত ভ্রান্ত সংস্কার, মিথ্যা সিদ্ধান্তগুল আমার বড়ই অসহ্য বোধ ছিল। কাজে যাহা করিতে পারিবে না, কখন করিবেও না, তাহার বিষয়ে কাহাকেও তর্ক যুক্তি বিদ্যা প্রকাশ করিতে দেখিলে গাঁয়ে যেন আমার জ্বর আসিত। যাহারা তর্কে হারিয়া যাইত, এবং সত্য সিদ্ধান্ত অন্তরে মানিয়াও যাহারা স্বার্থ কিম্বা অহঙ্কার বশতঃ তাহা মানিতে চাহিত না, আমার প্রতি তাহাদের বড়ই রাগ। শাস্ত্রবিধি, লোকাচার, গুরুজনের কথা মানি না, নিজে যাহা বুঝি সেই মতে চলি, এ জন্য তাঁহাদের বিরক্তির আর অবধি রহিল না। কিন্তু উপায় কি? তর্জ্জন গর্জ্জন ভ্রূকুটিতে কি সত্য দুর্ব্বল হয়, না সার সিদ্ধান্ত উল্টিয়া যায়? যখন তাহারা শাস্ত্র গুরু চণ্ডী মনসার দোহাই দিয়া, রাগ করিয়া চেঁচাইয়া, শাপ দিয়া কিছু করিতে পারিল না, তখন সকলে আমার বিবাহের জন্য পীড়াপিড়ি আরম্ভ করিল। যদি কোন দিন একটু মাথা ধরে কিম্বা ধাত গরম বোধ হয়, সকলে বলে, 'যুবা বয়স, বিবাহ করিবে না, কিছু না, মাথা ধরবে না কেন? দেখো, এর পর মজা টের পাবে!' কোন দিন একাকী নির্জ্জনে চিন্তায় মগ্ন আছি, স্থির চিত্তে কোন তত্ত্ব কথা ভাবিতেছি, এক জন আসিয়া বলিল, 'এঃ! এককারে গেছ বল! বিবাহ কর না কেন? ভাব্‌তে ভাব্‌তে শেষ কি পাগল হবে না কি?' কোন দিন কাহিল দেখলে ঐ কথা। কোন দিন কারো সঙ্গে উৎসাহের সহিত তর্ক করিতে দেখিলে ঐ কথা। চাকরাণী, দিদিমা, ঠাকুরমা সকলের মুখে ঐ কথা। হাড় জ্বালাতন। যার সঙ্গে দেখা হয় সেই বলে, 'কি হে! বুড় হয়ে গেলে যে! বিবাহ করবে কবে?' সকলে মিলিয়া এইরূপে যেন আমায় পাগল করিয়া তুলিল।"

"দশচক্রে ভগবান্ ভূত। ইহা দ্বারা ক্রমে অলক্ষিতভাবে আমার পূর্ব্বকার বিবাহপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। কিন্তু উঠিলে কি হয়? মনের মত বউ কোথা? এই সব ভেবে চিন্তে এত দিন চুপ চাপ করে বসেছিলাম। এ বিষয়ে অনেক খুটি নাটি মত গড়ে রেখেছি কি না, বিবাহ করাত আর সোজা কথা নয়! যে কারণেই হউক, শেষ মোদ্দা অত বাঁধাবাঁধি আঁটা

আঁটি আর রহিল না; আদর্শ ক্রমে কমিয়া আসিল। কমিতে কমিতে শেষ সাধারণ সমতল ক্ষেত্রে নামিল।"

"এক দিন কোন এক জনের বাড়ীতে বেড়াতে গেছি, সেখানে পরিচিত অপরিচিত উভয়ই আছে। দুইটি লোক কাণে কাণে বলিতেছে, 'এই ছেলেটাকে জামাই করলে বেশ হয়।' তদনন্তর তার মধ্যে যিনি গৃহস্বামী তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবু, তোমার নামটী কি গা?' আমি বলিলাম, আমার নাম আত্মারাম। [প্রশ্ন] পিতার নাম? [উত্তর] পিতার নাম প্রাণারাম। আমাকে যিনি চিনিতেন (ঘটক মহাশয়) তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'না, না, ওর নাম আত্মারাম নয়, আসল নাম জলধর। ওরা খুব বড় ঘরের ছেলে, নৈকুশ্য কুলীন। ছেলেটি একটু মাথাপাগলা। ওটী কৃষ্ণপুরের বিষ্ণু বাবুর কনিষ্ঠ সন্তান। বেশ ছেলে জ্ঞানবান্, উপার্জ্জনক্ষম, চরিত্রও ভাল।' [প্রশ্ন] তুমি এমন উচ্চ বংশের কুলীনসন্তান হয়ে কেন বাপু পিতার নাম ভাঁড়াচ্চ? প্রাণারাম কে? তোমার পিতার আসল নামটী কি বল দেখি? [উ] তাঁর আসল নাম ঈশ্বর, আমি প্রাণারাম বলিতে বড় ভাল বাসি। [প্র] ঈশ্বর আবার কে? ঈশ্বর নাপিত না কি? (সকলের হাসি) এমন বড় ঘরের ছেলে ইচ্ছা করে আপনাকে ছোট বলে পরিচয় দেওয়া কি ভাল? [উ] কেন মহাশয়! ছোট বলে কেন পরিচয় দেব? আপনি আমি আমরা সকলেইত উচ্চ বংশের কুলীনসন্তান! হাঃ হাঃ হাস্যধ্বনি সহকারে গৃহস্বামী বলিলেন, 'আমরা তোমাদের পা ধোয়াতেই সাহস করি না। তোমরা কি কম লোক?' [উ] কম লোকত বাস্তবিকই নই। ঈশ্বর আমার পিতা, আমি তাঁর অংশ এবং বংশ, ইহা অপেক্ষা উচ্চতা আর কি হতে পারে? কিন্তু আমি এবং আপনারা সকলেই সেই উচ্চ বংশোদ্ভব।

"এ কথা শুনিয়া সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল। তাঁহারা পরস্পরের পানে চাহিতে লাগিলেন। গৃহস্বামীর মর্ম্মান্তিক দুঃখ উপস্থিত হইল এই জন্য যে, হায়! এমন ভাল কুলীনের ছেলেটী, অল্প বয়সে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বড়ই আক্ষেপের বিষয়। তাঁদের ঈদৃশ দুঃখ সন্দর্শনে পরিচিত ব্যক্তিটী আমার পিঠে একটা চাপড় দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওগো না না তোমরা ওর কথা শুন কেন? পাগল ছেলে, বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে, এখন কি পাগলামি ভাল দেখায়? তোমাদের অত দুঃখ করতে হবে না। আমি

ওকে বিলক্ষণ চিনি। ও আমাদের কৃষ্ণপুরের বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ছেলে। পাগল টাগল নয়, একটু পাগলামি আছে। চল্ তোকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাই।’

"গৃহস্বামী বলিলেন, ‘কিহে উনি যে বলছেন, উনি তোমায় চেনেন?’ আমি বলিলাম, ‘আমি নিজেই আপনি আপনাকে এত দিনে চিনিতে পারিলাম না, উনি কেমন করে চিনবেন?’ অপর এক ব্যক্তি বলিলেন, ‘তবে তোমার বাড়ী কোথা? [উ] বাড়ী বিদেহপুর। [প্র] নাম কি ঠিক আত্মারাম? [উ] ঠিক আত্মারাম, বাহিরে যা দেখছেন শুনছেন ও সব কিছু নয়।

"এইরূপ কথা বার্ত্তার পর, পরিচিত লোকটী অপর সকলের সঙ্গে চোখ টেপাটিপি করে কি বলিল। বোধ হয় ভিতরে ভিতরে আমার বাপেরও ইহাতে যোগ ছিল। যাহা হউক, আমাকে শেষে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। তখন বাড়ীর মেয়েগুল কেহ মাথায় তেল ঢালে, কেহ গায়ে হলুদ মাখায়, কেহ স্নান করায়, কেহ বা গা মুছাইয়া দেয়। শেষ ভাল ভাল কাপড়, উত্তম উত্তম খাবার সামগ্রী, গদী বিছানা, আদরের আর সীমা নাই। তার পর মধুরেন সমাপয়েৎ, দিব্য একটী সালঙ্কারা সুসজ্জিতা সুন্দরী কন্যা আসিয়া বামে বসিলেন। তখন আমি আমোদ আহ্লাদ আদরের সমুদ্র-মধ্যে একবারে যেন ডুবিয়া গেলাম। যে নিতান্ত গরীব কুটুম্ব, সেও দেখি এক থান নূতন কাপড়, কতকগুল মিঠাই পাঠিয়েছে। কেবল মিষ্টান্ন, কেবল মিষ্ট কথা, নূতন কাপড়, নূতন জুতা, ফুলের মালা, আতর গোলাপ; আর তার সঙ্গে হাস্যকোলাহল, মধুর বাদ্য, নৃত্য গীত আমোদ আহ্লাদ আদর। তখন মনে হইল, আমি কি নির্ব্বোধ, এমন সুখের বিবাহে এত দিন মত দিই নাই! বিয়েটা বেশ লাগল ভাল। এমন আনন্দ জীবনে আর কখন ভোগ করি নাই।"

"পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা ছিল, যাহার আত্মা আছে এমন মেয়ে আমি বিবাহ করিব। পরে যখন ঐ সকল চাকচিক্য, আনন্দোল্লাস, নারীগন্ধ, এবং পান ভোজনের বিশাল তরঙ্গমধ্যে পড়িলাম, তখন আর আপনাকেও খুঁজিয়া পাই না। কেবল মাথাটী একটু জাগিতেছে, আর সব ভবসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। আজ জুড়নি, কাল আইবুড় ভাত, পরশু বাসর ঘর, তার পর দিন বউভাত, তার পর দিন ফুলশয্যা, তার পর আবার নবৈসং।

বেশ কিন্ত সামাজিক ব্যবহার গুলি। গৃহধর্ম্মে অভিষিক্ত করিবার জন্য স্বজাতি কুটুম্ব আত্মীয় প্রতিবাসীরা কাপড় সন্দেশ ইত্যাদি বিবিধ উপহার দ্বারা সাহায্য করে। একের সহিত অপরের কেমন বন্ধন! এ সকল সামাজিক ব্যবহারতত্ত্ব ভাবিলে অনেক জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু আমাকে ইহারা হাঁপ ছাড়িবার কিম্বা ভাবিবার অবসর দিলে না। ক্রমে তেলে জলে হলুদে মাথাটা খুব ঠাণ্ডা এবং হৃদয়টা কোমল বোধ হইতে লাগিল। মাথা যখন ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তখন মুখের শ্রী, গায়ের রং ফিরিল, চক্ষে স্নিগ্ধ জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। আহ্লাদে এক এক বার প্রাণের ভিতর থেকে যেন গুর গুর করে হাসির লহর উঠিত। এইরূপ পান ভোজন শুশ্রূষায় যখন মেজাজ ঠাণ্ডা হইল, তখন সেই চক্ষে বউ দেখিলাম। একেত চারিদিকে উজ্জ্বল আলোকমালায় ঘেরা নানা বর্ণের বসন ভূষণে সজ্জিত সুন্দরী মহিলা এবং বালক বালিকার দল, তার মাঝ খানে কুসুমমালা-খচিত, লোহিত বসন এবং রত্নালঙ্কারে ভূষিত নববধূ আসিয়া দাঁড়াইল; সে দৃশ্য যখন দেখিলাম এবং ঢোল সানাই ব্যাণ্ডের বাজনা শুনিলাম, তখন আর তাহার আত্মানুসন্ধানে আমার প্রবৃত্তি রহিল না। চারি দিক্ হইতে 'আহা দিব্যি বউ! খাসা বউ! বেশ বউ' এই ধ্বনি উঠিতে লাগিল। সকলে মিলে আমার চোখে যেন ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিলে। এরা সকলেই হাত পা নাক মুখ চোখ, মাথার চুল, গায়ের রং এবং কাপড় গহনা দেখে, আত্মা আছে না আছে তাহা কেহ দেখতে চায়ও না, দেখতে দেয়ও না। তখন হঠাৎ আমার মনে হইল, শুনিছি কোন কোন হিন্দুশাস্ত্রকার না কি বলেছেন, "স্ত্রীলোকের আত্মা নাই। উহারা পক্ক কদলী সদৃশ।" থাক্‌লেই বা তখন সেই ভিড়ের ভেতর থেকে তাকে বার করে কে? শরীর যখন আছে, তখন অবশ্যই আত্মা আছে, এই মনে করে নিলাম। তোমরা হাসই আর ঠাট্টাই কর, আমি কিন্তু ভাই আত্মা টাত্মার কথা তখন এক প্রকার সব ভুলেই গিয়াছিলাম। নিজের নামটা পর্য্যন্ত মনে রহিল না আর অধিক কি বলব! রণবাদ্য শ্রবণে যেমন সৈনিকেরা ক্ষেপিয়া উঠে, বিবাহের বাদ্য রবে আমাকে তেমনি মাতাইয়া তুলিয়াছিল। চক্ষে যেন কেমন এক প্রকার চটক লাগিয়া গেল। তোমরা বোধ হয় সকলেই ইহা জান। আমার পক্ষে এটা একটা ভারি নূতন ব্যাপার, অতিশয় রমণীয়, কিন্তু এখন স্বপ্নের মত মনে হয়।"

"সে সময়কার এবং তাহার পরের বহু দিনকার সমস্ত কথা আমার

এখন মনে আস্‌ছে না। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে স্বপ্নের বৃত্তান্ত যেমন আব্‌ছায়া আব্‌ছায়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা রকম মনে হয়, সেইরূপ কতকটা এখন স্মরণ হচ্ছে। এত দিন আমি এ সকল কথা কাহাকেও বলি নাই, বলিতে লজ্জা লজ্জা করত। তবে তোমরা না কি শুনতে চাইলে, তাই বলছি। যা যা ঘটেছে তাই বলছি, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না।"

"বিবাহের পর বাস্তবিক আমি যেন এক জন নূতন মানুষ হলেম। বউকে দেখলাম, একটী কাপড়ঢাকা, গয়নাপরা চামড়ার পুতুল, আমিও ঠিক তাই। দুইটী যেন আত্মাহীন জন্তু; ইহারা দুই জন ইচ্ছামত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করে, কথা কয়, হাসে, কাঁদে, খায় ঘুমায়, কিন্তু অচেতন। এ সব কাজে চৈতন্যেরত বেশী দরকার হয় না। কেবল সংস্কারগুণে সব কাজ চলে। এই চর্ম্মপুত্তলিকার পূজা অর্চ্চনার জন্য যে সমস্ত উপকরণ সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহার আয়োজন করিতে করিতে এবং দেবতার প্রসাদী নৈবিদ্য ভোগ সম্ভোগ করিতে করিতে আমি সংসারে অর্থাৎ সঙের সারে পরিণত হইলাম। তখন কোথায় বা আত্মচিন্তা জ্ঞানচর্চ্চা আর কোথাই বা পরসেবা দেশোদ্ধার। তখন আত্মারাম কেবল দেহরাম হইয়া রহিল। কিন্তু প্রথম কিছু দিন ইহাতে বড়ই আমোদে ছিলাম। ঠিক সৌখীন বাদুমণি বাবুটীর মত। তখন চুল ফেরান, কাপড় কোঁচানো, আতর মাখা, জুতা বুরুষের ঘটা দেখে কে! এ পথের পথিক সহায়ও অনেক আসিয়া জুটিল। তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম, এইটেই ঠিক। দশে মিলে করি কাজ হারি জিনি নাহি লাজ।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আত্মারামের কথাগুলি আপাততঃ শুনিতে যেমন হাস্যরসোদ্দীপক উদ্ভট, বস্তুতঃ তাহা নহে; প্রত্যেক কথাটির এক গভীর তাৎপর্য্য আছে। পাঠক মহাশয় যদি সরলহৃদয় সত্যবাদী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে, এ সব কথা প্রতি জীবনেই পরীক্ষিত। যতই তিনি এ পুস্তক পাঠ করিবেন, ততই ইহার প্রমাণ পাইবেন। কেনই বা তা না হবে? এত বাস্তবিক আরত মনঃকল্পিত কোন গল্প উপন্যাস নয়, শুনা কথা

যা পুঁথির কথাও নয়, জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা, এক জনের নিজমুখের কথা; কাজেই সর্ব্বত্র ইহা সংলগ্ন হয়। আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, "আত্মারামকাহিনী এক দিকে যেমন গম্ভীর, চিন্তাশীল, বৈজ্ঞানিক; অপর দিকে তেমনি চিত্তমোদিনী, রসময়ী। জ্ঞানী পণ্ডিত এবং প্রেমিক কবি উভয়ের পক্ষেই ইহা সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, এবং মৃত্যু হইতে পরলোক পর্য্যন্ত বিশ্বরাজ্যের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ যাবতীয় বিষয়ের কিছু কিছু আভাস ইহাতে আছে। ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিলে লাভ ভিন্ন কারো কোন ক্ষতি হইবে না। এক হাঁড়ী ভাতের মধ্যে একটা ভাত টিপিলে যেমন সমস্ত ভাত হইয়াছে কি না তাহা টের পাওয়া যায়, তেমনি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডস্থালীর অন্তর্গত একটী মানবাত্মের পরিপাক ক্রিয়া অবগত হইলে সমগ্র মানব জাতির গতি প্রকৃতি নিয়তি বুঝিতে পারা যায়। আত্মারামের ভিতর সমস্ত মানব জাতির জীবনক্রিয়া পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ত আর একটী খণ্ড জীব নহেন, অখণ্ড জনসমাজের প্রতিনিধি বা পরিণতি। প্রত্যেক আধারে যাহা আছে তাহা এখানেও অল্পাধিক আছে। তিনি যে কোন যুগ কিম্বা দেশবিশেষের অবতার তাহাও নহেন, দেশ কালের অতীত সার্ব্বভৌমিক মানবাত্মা। বেশী কথা বলিবার আর আমাদের কিছু দরকার নাই, তাঁহার নিজের কথাতেই এ সকল তত্ত্ব প্রতি জনের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে। অবশ্য আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কাহিনীর সমস্ত মুদ্রিত করিতে যাইতেছি না, তাহার কোন প্রয়োজনও নাই; অনেক বিষয় আছে যাহা কাহারো ভাল লাগিবে না। যে যে অংশ চিত্তমোদক, শিক্ষণীয়, সারগর্ভ, সেই সেই অংশ আমরা মৌলিক আকারে সংগ্রহ করিয়াছি। একটী মাত্র কেবল আমাদের অনুরোধ, সহৃদয় সুরসিক পাঠকবৃন্দ কেহ যেন এমন মনে না করেন যে, আমরা একটা মনগড়া "আত্মারাম" খাড়া করিয়া তাহার মুখ দিয়া নিজেদের কল্পিত নূতন মত প্রচার করিতেছি এবং তদ্দ্বারা দেশের প্রচলিত রীতি নীতির দোষ ঘোষণা করিতেছি। এখন সকলে আত্মারামের ঘরকন্নার কথা কিছু শ্রবণ করুন।

"বিবাহের পর আমি বেশ শান্ত শিষ্ট লোকানুগত বশীভূত হইলাম। যে যা বলে তাই করি। শ্বশুর শাশুড়ী যেন স্বর্গের দেবতা, শালা শালী যেন বৈকুণ্ঠের দূত। মা বাপ ভাই ভগ্নীদের অপেক্ষাও তাঁহাদিগকে যত্ন করিতাম এবং ভাল বাসিতাম। শ্বশুরবাড়ীর যে মত, আমারও সেই মত

রা যখন যে দলে যায়, আমি তখন সেই দলের গোঁড়া হই। এখন আর থা তেমন গরম হয় না, কাহারও সঙ্গে তর্ক বিবাদও ঘটে না; বিশেষ মত, শেষ রুচি, বিশেষ কার্য্য এবং অত্যুচ্চ বৈজ্ঞানিক বিচার সিদ্ধান্ত সকল ধারণের সঙ্গে মিশে অল্পে অল্পে সাধারণ হইয়া গেল। পূর্ব্বে ছিলাম দ্বিপদ, বাহের পর চতুষ্পদ হইলাম; তদনন্তর যথাসময়ে একটী সন্তান জন্মিল, খন ষট্পদ হইয়া সংসারসরোবরে বিষয়পদ্মের মধু পান করিতে লাগিলাম।"

"এ সময়ের শিক্ষার সঙ্গে পূর্ব্বের মতামত কিছুই মিলিত না। একটী াশ্চর্য্য এই, কিরূপে অলক্ষিতভাবে যে এই ঘোর পরিবর্ত্তন হইল তাহা কছুই বুঝিতে পারি নাই। সহচর বন্ধুগণ সকলে দুঃখ এবং উপহাস করিয়া ালিতেন, "কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন!" আমি তার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে ারিতাম না। বরং বলিতাম, আমি ঠিক আছি, তোমাদের বুঝিবার ভুল। জীবন নূতন, শাস্ত্র নূতন, বিচার সিদ্ধান্ত প্রবৃত্তি এবং আদর্শ দৃষ্টান্ত সমস্তই নূতন। বাল্যকালে এবং যৌবনের প্রারম্ভে যে সকল চাণক্য শ্লোক, বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশ, বাইবেল, মহাভারতের নীতি কথা শিখিয়াছিলাম তাহা এখন ভুল বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে পরোপকার দেশোদ্ধারের কার্য্যে বেশ অনুরাগ উৎসাহ ছিল, এক্ষণে আর তাহা রহিল না। বাল্যচাপল্য, যৌবনের উন্মত্তা বলিয়া সে সব মনে হইত। পাঁচ জনে যেমন করে দেখিতে পাই তাই করি। ক্রমে বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, প্রকাণ্ড পরিবার ছেলে মেয়ে কতকগুল কোথা থেকে এসে একবারে ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। দুই হইতে দশ হইল। তাদের প্রতি কর্ত্তব্য আগে, না পরসেবা আগে? বৃদ্ধ পিতা এবং গুরু জনের সেবাও আর করিবার সুবিধা হয় না। তাঁরা সব মনে মনে টেন; ঘোর সংসারী স্ত্রৈণ হইয়াছি বলিয়া মাঝে মাঝে তিরস্কারও করেন, কিন্তু আমি কি করব? আমিও মনে মনে বলি; 'স্ত্রীর স্বামীভক্তি যদি দোষের া হয়, তবে স্ত্রৈণ হওয়ায় দোষ কি? আর যদিই বা কোন দোষ থাকে, তোমরাইত এ উৎপাত ঘটিয়েছ, বিয়ে দিলে কেন? আত্মীয়েরা ত একেবারেই পর হইয়া গেল। সহাধ্যায়ী সহচর তোমরা, তোমাদের বোধ হয় ক বার একটী সংবাদও লইতে পারি নাই। একা মানুষ কোন্ দিকে যাবে? মে যেন গভীর সমুদ্রে ডুবিতে লাগিলাম। তাই কি দুই দশ দিনের জন্য? হু কালের মত একবারে আত্মবিস্মৃতি। পরে শ্বশুর বাড়ীর প্রতিও আর বেশী ন ভক্তি শ্রদ্ধা রহিল না। আগে যখন তাঁরা তত্ত্ব তল্লাস করতেন, দিতেন

থুতেন, তখন ভালবাসতাম, কিছু দিন পর বুড় জামাইকে আর তারা ডাকিয়া সুধায় না। এইরূপে আমার প্রতি যখন আত্মীয় কুটুম্বদের মায়া মমতা আদর যত্ন কমিয়া আসিল, তখন আমিও স্বার্থপর আত্মম্ভরী হইয়া পড়িলাম; বাধ্যবাধকতার ভিতর প্রেমানুরাগ আর কিছুই রহিল না, কেবল একটু চক্ষুলজ্জা আর কঠোর কর্ত্তব্য রহিয়া গেল। এই বলিয়া আপনাকে আপনি প্রবোধ দিতাম, যে একা মানুষ কোন্ দিক সাম্‌লাবো? দশটা ছেলে, একটা স্ত্রী পালন করা কি সোজা কথা? সমস্ত দিন আফিসে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, অন্য সৎকার্য্যের অবসরও নাই, সামর্থ্যও নাই। প্রতি জনে যদি নিজ নিজ পরিবার পালন করিতে পারে তাই তার পক্ষে যথেষ্ট।"

"আগে আগে যেখানে যত সভা সমিতি ছিল,—হরিসভা, ব্রহ্মসভা, আর্য্যসভা, সনাতন ধর্ম্মসভা, থিয়সফি ফ্রিমেসন্ সভা, ভারতসভা,—সব তাতেই যোগ দিতাম, তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু খরচও করিতাম; বিবাহের পর অল্পে অল্পে সে সব সখ মিটে গেল। কেহ যদি বলে, "ওহে! আর যাও না কেন?" আম্‌তা আম্‌তা করে সেরে দি। শেষ দেখাও দিতাম না। আমি এখন যে পথের যাত্রী, সে পথের সঙ্গীরোত কিছু অভাব নাই; দুই পাঁচ জন সভা-পাগলের সঙ্গে নাই বা মিশিলাম? মিছে কেবল খরচান্ত আর সময় নষ্ট।"

"দুঃখী কাঙ্গাল কি বৃদ্ধ আতুরদিগকে দেখিলে পূর্ব্বে যেরূপ দয়া হইত, এখন আর সহজে তা বড় হয় না। প্রথমেই ন্যায়ান্যায় বিচার মনে আসে। সময়ে সময়ে রাগও হয়। দুই প্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় একটু শুয়ে বিশ্রাম কচ্ছি, কি কেতাব পড়ছি; কোথা থেকে এক মিন্‌সে বৈরিগী কাণের কাছে;—"বিদেশে আসিয়ে মাগো প্রাণ গেল গো ত্রিণয়না" বলিয়া গান ধরিল। তার সঙ্গে সঙ্গে অমনি, "ওগো গিন্নী মা, বৈষ্ণব সাধুকে শীঘ্র দয়া কর মা।" খানিক চেঁচাইয়া আবার গান—"আমি যদি মরি দুর্গে, দুর্গা নাম আর কেউ লবে না।" আমার মনে বিচার আসিল, কেন তোকে ভিক্ষা দেবরে ব্যাটা! তুমি রোদে রোদে পথের ধূলা খেয়ে ঘুরে বেড়াতে পার, আর খেটে খেতে পার না? তুমি যদি বিদেশে এসে মর, আর তোমার দুর্গানাম কেউ যদি সে জন্য না লয়, আমার তাতে কি? আমি সে জন্য দায়ী নই। ব্যাধিগ্রস্ত কুষ্ঠ-রোগী কাণা খোঁড়া দেখিলে মনে হয়, ব্যাটা কোথায় দুষ্কর্ম্ম অসৎ কর্ম্ম করতে গিয়াছিল তার প্রতিফল এখন ভুগছে। তোকে বিধাতা সাজা দিচ্ছেন, আর আমি দয়া করব? অত গোরুর মাস খেয়েছিলি কেন? চাচা আপনা

বাঁচা। এই বলিয়া কর্ত্তব্য শেষ করি। ভদ্রলোক কেউ কাছে থাকলে বলি, 'এক জনকে দিলে এখনি পালে পালে এসে পড়বে।' অন্য কেহ এ সকল লোককে যদি কিছু ভিক্ষা দেয়, তাও দেখলে মনে হয়, এরা কি নির্ব্বোধ আহাম্মক! দানের পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই। অর্থাৎ পরোপকার, দেশোদ্ধার এ কাজগুল যদিও ভাল বলে বোধ আছে, কিন্তু করতে একটুও ভাল লাগে না। মনে মনে ইহাও ভাবিতাম, ও সব অনেক করিছি। ব্যাটারা কেবল ফাঁকি দেয়, ঠকায়। আমি যে বিলক্ষণ চতুর, এ জ্ঞানটা খুব টনটনে হয়ে উঠল। এ দিকের যতই শ্রীবৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি, আত্মারাম ততই জীর্ণ শীর্ণ, চিঁ চিঁ। কিছু দিন পরে সে চিঁ চিঁ শব্দও আর কাণে লাগিত না। সভার সভ্য ভায়ারা বলিতেন, "ওহে, তোমার মুখ শুকনা শুকনা কেন? কৈ আর আস না, কিছু না, কায কর্ম্মে যোগ দাও না; উৎসাহ উদ্যম সব ফুরিয়ে গেল না কি?" আমি মনে মনে উত্তর দিই, "হাঁ বাবা! ঐ কথা বলে তোমরা আমাকে আবার চক্রের মধ্যে ফেলবে! সে আর বড় হচ্ছে না! এমন ভ্যাড়াকান্ত পাওনি। পরে প্রকাশ্যে বলিতাম, "না, না, উৎসাহ কি কখন ফুরায়? তোমরা সব বেশ কায কোচ্ছ কর না, আমিত আছিই!" আসল কথাটা এই যে, এখন সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ অপেক্ষা সন্তানাদি সহ স্ত্রীসঙ্গ বেশ ভাল লাগিত। পরসেবা কি দেশের হিত এ সব পাগলামি মনে হইত। পূজা প্রার্থনায় বসিলে ঘুম পাইত। ধর্ম্মের কি নীতির উপদেশ বক্তৃতায় একবারে ভয়ানক অরুচি জন্মিয়াছিল। ঘরে বসিয়া কেবল বিষয় বৃদ্ধি, পরিবারের সুখ বৃদ্ধির জন্য নানা প্রকার মৎলব আঁটিতাম। আর নিরীহ ভদ্র সন্তানের মত আপনাতে আপনি নিরাপদে থাকিতাম। পাদরীদের উপদেশগুল নিতান্ত পেশাদারী মনে হইত।"

"ও দিকে সংসারভূতে গায়ের রক্ত চুষে খাচ্ছে, যমে গলায় ফাঁসি লাগিয়েছে, সভা করে কে? সে সময়কার কথা মনে হইলে এখন হাসি পায়, নিজের প্রতি একটু দয়াও হয়; কিন্তু তখন এ সকল ভাবিতেও পারিতাম না।"

"যখন সংসারতাপে, মোহ আসক্তিতে আত্মা একবারে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল, তখন দেহভারে কুটুম্বভারে ভবসাগরে ক্রমে তলিয়ে যেতে লাগলাম। কেউ আর ধরে তোলে না, সকলেই ঘাড়ে চাপিয়া ডুবাইতে চায়। ইতিপূর্ব্বে পরের সুখে সুখী এবং পর দুঃখে দুঃখী হইয়া সকলের সহিত সহানুভূতি করিতাম। এখন লোকের সুখ দেখিলে মর্ম্মান্তিক দুঃখ এবং দুঃখ

দেখিলে অতিশয় সুখবোধ হয়। ছি ছি ছি! বড় নিকৃষ্টতা! এ সংসা
পরদুঃখকাতর দয়ালু লোকেও অনেক আছে, তবে আমার কেন এ দুর্দ
হইল? বোধ হয় আগে আগে নাকি খুব বড় হইবার সাধ করেছিলাম, তারা
এই প্রতিফল। দুঃখের কথা বলব কি ভাই, বল্‌তে লজ্জা করে। কারে
কোন প্রকার সুখ সৌভাগ্য দেখিলে প্রাণটা হিংসায় যেন জলে পুড়ে খাব
হয়ে যেত। নিজের সুখ সৌভাগ্যের কোন অভাব নাই, তথাপি—অথব
সেই জন্যই কারো ভাল দেখতে পার্‌তাম্ না। আমার ছেলেটা পাস করুক
অন্যের ছেলে ফেইল হউক; আমার সন্তানগণ, পুত্রবধূ জামাতা নাতি পুতি
বেশ সুন্দর সুন্দরী গুণবান্ গুণবতী হবে, অন্যের খাঁদা বোঁচা গন্নাকাটা গণ্ডমূ
একটা ভূত পেত্নীর মত কুৎসিত হউক। আমার ছেলে মেয়ে নিরোগী সবল
হয়ে থাক, অন্যেরা ঝাড়ে বংশে সব রোগা কুকুর বিড়ালের মত হয়ে আমার
বাড়ীতে এসে পাত চাটুক। অর্থাৎ মোট কথাটা এই যে, আমার বংশ
উপবংশ পুরুষানুক্রমে সর্ব্বাংশে খুব সুখী সমৃদ্ধিশালী হইতে থাকুক, আর
অন্যেরা না খেতে পেয়ে রোগে ভুগে, মূর্খ হয়ে ক্রমে ক্রমে সবংশে লোপ
পেয়ে উৎসন্ন যাক্! আহা কি চমৎকার উচ্চ ভাব! আত্মারাম মরে
এখন ভূত হয়েছেন কি না, কাজেই এ সকল ভূতের কামনা কে আর বন্ধ
করে রাখে? হায় রে পোড়ার বাঁদর! শেষ তোমার এই দশা! বাহিরে
ভদ্রবেশধারী সভ্য সম্ভ্রান্ত, আর ভিতরে এই দুর্গন্ধময় নরক! মুখের চেহারা
খান এক বার দেখ না! লোভ হিংসা অহঙ্কার যেন তাহাতে কাল কীটের মত
কিল্ কিল্ কচ্ছে। রাগ দ্বেষ প্রতিহিংসার মোটা মোটা শির বেরিয়ে
পড়েছে। কি কদর্য্য! কি জঘন্য দুর্গন্ধ! রাধাকৃষ্ণ! রাধাকৃষ্ণ!”

“এইরূপ আসক্তি মায়ার ঘোরে, স্বার্থ হিংসার বিকারে শেষ আস্তে
আস্তে কোথায় যে ডুবে গেলাম তার আর অনুসন্ধান নাই। এ পরিবর্ত্তন কে
ঘটাইল? এ কি বিবাহের দোষ? তাই বা কিরূপে বলিব? বিবাহ সম্বন্ধত
ইহ পরলোকের সুখ শান্তি মঙ্গলের জন্য। স্ত্রী পুত্র পরিবারমধ্যে পরস্পর প্রেম
স্নেহ ভক্তি আনুগত্যের বিনিময়ত স্বর্গীয় ব্যাপার। অর্থ বিত্ত বিদ্যা সম্ভ্রম,
শরীর ইন্দ্রিয়, বসন ভূষণ, ভোজ্য পানীয়, ইহাদেরই বা অপরাধ কি? এরা
সকলেইত নির্দ্দোষ, এবং মানবাত্মার অনুকূল সহায়। দুঃখ তাপ রোগ
শোক ব্যসন দণ্ড ভয় শাসন মৃত্যু পর্য্যন্ত; ইহারা উপকার ভিন্ন আমাদের
অনিষ্ট সাধনের জন্য কেহ আসে নাই। তবে এ দুর্গতি, আসক্তি, বিড়ম্বনা

অধঃপতন কোথা হইতে আসিল? সংসারে পরিবারবর্গের ভিতর যেমন সৎ শিক্ষা লাভ এবং মানসিক সৎবৃত্তির বিকাশ হয় তেমনটী আর কোথাও হইবার যো নাই। "দোষ কারো নয় গো মা, স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।" এ কেবল আত্মারামের আত্মবিস্মৃতি এবং আত্মহত্যা। অথবা ভবের মেলায় মায়ার খেলা।"

"ইহার পর বহু দিনের আমি আর কোন হিসাব দিতে পারিব না। ভবের বাজারে মহাভিড়ের মধ্যে, সংসারের দুর্জ্জয় পেষণে একবারে আত্ম-বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। কত কাল যে সে অবস্থায় ছিলাম তাহাও মনে নাই। ডুবিবার প্রথম অবস্থাটা কেবল একটু স্মরণ আছে। সংসারের মোহ প্রলোভন কি ভয়ানক! সব ভুলিয়ে দেয়। দশ দিকে সোণা রূপা বেলোয়ারি কাচের সামগ্রীগুল ঝগ্‌মক্ ঝগ্‌মক্ করিতেছে, তাহাদের চাকচিক্যে এবং সাটীন সিল্ক সাচ্চা ঝুটো জরি সল্‌মা রেসম পসমের নানা বিধ লাল নীল হলুদ এবং সবুজ রঙ্গে চক্ষু যেন ঝলসে যায়; বহু বিধ দিশি বিলাতী সুগন্ধ বস্তর আঘ্রাণে, গীত বাদ্যের সুললিত মধুর নাদে মস্তিষ্ক এক-বারে উন্মত্ত হইয়া উঠে। মানুষের হট্টগোলে, এঞ্জিনের ভোঁ পোঁ শব্দে, ট্রাম রেল কেরাঞ্চি এবং গোরুগাড়ীর ঘড় ঘড়ানিতে, হই হই চৈ চৈ রবে কাণে তালা ধরে। আশে পাশে উপরে নীচে যেখানে সেখানে মণিহারী দোকান, কোথাও ফুল ফলের শোভা, কোথাও মেঠাই মণ্ডা সজ্জিত দোকান; কোথাও নানা রঙ্গের পোষাক, মানুষের প্রাণে সহিবেই বা কত? আবার কোথাও বা চর্ম্মবিমুক্ত আস্ত ভগবতী, পচা মাচের আঁসটে গন্ধ, তাহাতে মাছির ভ্যান ভ্যানানি, দক্ষিণে বামে সম্মুখে বিষ্ঠাভারবাহী মেথর মেথরাণীর গমনাগমন; চীৎকার গণ্ডগোলে লোকের ভিড়ে, বৃষ্টি কাদা গরমিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম, ইহার মধ্যে কি চিত্ত স্থির রাখা যায়? লোকে ক্রয় বিক্রয়ের সময় কথা কয় তাহার মধ্যে মিথ্যাই অধিক। সত্য এবং ধর্ম্মের নাম দিয়া সপথ করিয়াও মিথ্যা বলিতেছে। তার পর আবার বাড়ী পৌছিয়া দেখি, কোন ছেলেটার ব্যাম, কোনটা অবাধ্য; ঝি চাকর চুরি করে, বললে আবার চেঁচিয়ে মরে। বেরালে বেরালে ঝগড়া, ঝির সঙ্গে গিন্নীর কোঁদল। হয়তো প্রতিবাসীর ঘরে মড়া মরেছে, তাকে নিয়ে ঘাটে যেতে হবে। গৃহিণী বলেন, জামাইকে তত্ত্ব করা হল না, লোকে যে নিন্দা করবে? কন্যা বলেন, বাবা কিছু দেও না, আমার প্রতি কি মায়া দয়া নাই? ছেলে বলেন,

আমার ভাল জুতা চাই। দরোজায় ট্যাক্স আদায়ের সরকার বিলহাতে দাঁড়াইয়া আছে, সে বলছে, "আজ শেষ দিন, দাওত দাও, নৈলে দরোজা জানালা সব বেচে নেব।" এই সমস্ত বাহিরের কার্য্যকোলাহল ভাবনা চিন্তা রোগ শোক উদ্বেগের অভ্যন্তরে রিপুপরিবার দলবেঁধে বসে আছেন, এবং কেহ মধুর সাজে, কেহ রুদ্র বেশে পর্য্যায়ক্রমে নিজ নিজ অভিনয় সম্পাদনের জন্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেছেন। একটীতো মোটে আত্মা, সেও আবার এমনি সূক্ষ্ম নিরাকার যে চক্ষে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না; এই সঁকল ভয়ানক প্রলোভন পরীক্ষা ব্যস্ততার মধ্যে সে বেচারি কত ক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? বিলিয়ে যায়।"

"কিন্তু ভাই, আশ্চর্য্য এই দেখিলাম, এত ব্যস্ততার মধ্যে আমিত্ব কাহারো একবারে হারায় না। আমার এক এক বার মনে হইত, বড় বাজারের বড় ভিড়ের মধ্যে বুঝি বা আপনাকে আপনি ফেলে এসেছি। বাড়ী এসে দেখি, সুখ দুঃখ ভয় ভাবনার মধ্যে আত্মার একত্ব ঠিক আছে, বিভক্ত বিচ্ছিন্ন হয় নাই। রোগের সময়, প্রবৃত্তিবিশেষের মহা উত্তেজনার সময়, লোকের সঙ্গে তর্ক বিবাদের সময়, কোন কোন গুরুতর সমারোহের কাজ কর্ম্মের সময় কিম্বা ঘোর বিপদ আপদে বাস্তবিক আমিত্ব যেন হারাইয়া যায়। কিন্তু আবার ঝড় তুফান থামিয়া গেলে স্থির ধীর হ্রদের ন্যায় যে আমি সেই আমি। ভাল মন্দ, বিপদ সম্পদ, সুখ দুঃখ, সাধু অসাধু ভাব জোয়ারের মত আসে, ভাটায় সরিয়া যায়, আমিত্ব যেন নদীগর্ভের মত শুয়ে পড়ে থাকে। খানিকটা জল, খানিক কাদা, দুয়ে মাখামাখি। বিষয়ের সংযোগে রিপুর আবির্ভাব, যেন ভাটার ভিতর হইতে জোয়ারের উদয়। ভাল মন্দ পাপ পুণ্যের আধার ইচ্ছা—স্বাধীন এবং অবস্থাধীন ইচ্ছাটার নামই "আমি"। সেই পুরাতন আমি আজ পর্য্যন্ত সমান ভাবে আছে। সে কতকটা অভ্যাসের দাস, প্রকৃতির অধীন, কতকটা ভগবানের অনুগত। ভগবান্ তাহাকে সংসারের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইতে চান, সে তা যাবে না। তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর প্রেরিত স্বর্গদূতদিগের সঙ্গে ঝগড়া করিবে, লড়াই করিবে, কিছুতে যাবে না। সেই জন্য মানবজীবন দেবাসুরের নিত্য সংগ্রামস্থল। ভোগের মাত্রা, স্বাধীনতার সীমা অতিক্রম করিলেই অসুরের জন্ম হয়, ক্রমে সে অতিভোগ, অত্যাচারে বলিষ্ঠ হইয়া উঠে, সুতরাং দেবতারা তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।"

"অনেক কাল পরে হঠাৎ যেন আমার ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। ইতি পূর্ব্বে মাঝে মাঝে স্বপ্নের ঘোরে দেখিতাম, ইহা ছাড়া আর একটা জীবন এবং রাজ্য আছে। এক দিন সহসা চারি দিকে চেয়ে দেখি, মেলা লোক জন বসে কি সব কথা কচ্ছে! হাসছে, পান ভোজন কুটুম্বিতার ধূম লাগিয়া গিয়াছে। কেহ বলছে দাদা, কেহ বলছে শালা; কেহ জামাই কেহ বোনাই; কেহ বাবা, কেহ মামা; কেহ খুড়, কেহ জ্যাঠা, কেহ পিসে, কেহ মেস; কেহ বেহাই, কেহ ঠাকুর্দ্দা; কেহ দাদা মহাশয়, কেহ বা কর্ত্তা মশাই; আর এক জন কেবল ওগো হেঁগো তিনি উনি, এইরূপে নানা জনে নানা শব্দে আমাকে সম্বোধন করিতেছে। আমি বলিলাম, তোমরা কে, আমি চিনিতে পারিতেছি না। মনে মনে বুঝলাম, এ সবতো ভূত পেত্নীর আড্ডা দেখ্‌ছি। কে এরা? আমিই বা কে? এখান থেকে পালান যাক্। এইরূপ ভেবে আমি অন্যমনস্কের মত উস্ক খুস্ক হয়ে এ দিক্ ও দিক্ চাইতে লাগলাম। বিদেশী পথিক হঠাৎ কোন অপরিচিত স্থলে চোর ডাকাতের দলে ভুলক্রমে পড়িলে তার যে দশা হয় সেইরূপ আমার দশা ঘটিল। খানিক পরে দেখি, কেহ দড়ি এবং শেকল আনিতেছে, কেহ ডাব কাটিতেছে, কেহ মিছরির সরবৎ বনাইতেছে, কেহ তেল জল মাথায় ঢালিবার আয়োজন করিতেছে। ভাবলাম, কি বিপদ! আবার তেল জল! আর বেশী কিছু কথা কইলাম না, তারাও একটু চেপে গেল। ইহার অল্প দিন পরে সুযোগ পাইয়া আমি বাড়ী পরিত্যাগ করি। সেই হইতে বহু দিন পর্য্যন্ত দূর দেশে শ্মশানে মশানে দেশ দেশান্তরে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতাম।"

আমাদের উদ্ভট বন্ধু কখন কোন শাস্ত্র বিধি ধরিয়া কাজ করেন নাই, স্বভাব কর্ত্তৃক নীত হইয়া নানা অবস্থার ভিতর দিয়া জীবনপথে ভ্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার স্বাভাবিক ক্রিয়া গুলি শেষ আপনাআপনি মহাজনপ্রতিষ্ঠিত পন্থার অনুসরণ করিয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে উদাসীন ভাব, তদনন্তর সংসারগতি, পুনরায় শেষ যৌবনে সংসার ত্যাগ, সর্ব্বশেষে আবার গৃহে কর্ম্মযোগ সাধন, এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার জীবনগতি প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। বেদবিধিবহির্ভূত এরূপ অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন। সুবিজ্ঞ পাঠকগণ হয়ত আমাদের অপেক্ষা তাঁহাকে আরো ভালরূপে বুঝিতে পারিবেন। গৃহ ত্যাগের অব্যবহিত পরক্ষণের ঘটনাটি বড়ই আমোদজনক। তিনি বলিয়াছেন;—

"আমি যখন একটু সুযোগ পাইলাম, তখন বাড়ী ছাড়িয়া একেবারে এক দৌড়ে একটা মাঠের মাঝ খানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। চারি দিকে ধূ ধূ করিতেছে মাঠ, কেহ কোথাও নাই, একা এক গাছতলায় বসিয়া খানিক চিন্তার পর, স্থির ভাবে আত্মানুসন্ধান করিতে লাগিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? গৃহাবদ্ধ যুবক বৃষকে ছাড়িয়া দিলে সে যেমন লাঙ্গুল তুলিয়া চারি পায়ে নৃত্য কুর্দ্দন এবং আস্ফালন করে, প্রশ্ন শুনিয়া আমার আমিত্ব তেমনি করিতে লাগিল। দেখি যে সে বিলক্ষণ স্থূল হইয়াছে, ধরিয়া রাখা যায় না। সমস্ত মাঠময় যেন ছুটো ছুটি করিতে লাগিল। বিস্তৃত বিষয়রাজ্য ভোগ করিয়া করিয়া সে মহা ষণ্ডা রকম হইয়া উঠিয়াছিল। "হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা, হাম বাড়া। তোম্ ছোটা" এই বলে আর লাফায়। আমি বলিলাম, আচ্ছা বাবা! তুমি রোসো, তোমায় এবার আমি মজা দেখাচ্ছি! এই বলে সেই খানে খুব চেপে বসে রইলাম। আত্মদৃষ্টিকে আরো ঘনীভূত সংযত করিলাম। বেশ স্থির হয়ে, নিরীক্ষণ করে, দেখে দেখে শেষে আস্তে আস্তে,—ঠিক ব্যাধেরা যেমন পাখী ধরে,—তেমনি সংযম আর বিবেক বৈরাগ্য লইয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইলাম। যতই কাছে যাই ততই দেখি ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া আসে। প্রথমে তাহার তর্জ্জন গর্জ্জন বিক্রম আস্ফালন দেখিয়া নিকটে যাইতেই পারিতাম না। তদনন্তর বিবেকালোকের জ্যোতিতে তাহাকে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম এক বিন্দুর মত বোধ হইতে লাগিল। যখন এইরূপে তাহাকে কোন্‌ঠেশা করিয়া ফেলিলাম, তখন বলিলাম, "আর তুমি যাও কোথা? ব্যাটা তুমি বড় ভুগিয়েছ।" অতঃপর সব জারি জুরি হাঁক ডাক ফুরিয়ে গেল, তখন ভেউ ভেউ করে এই কান্না! সেও কাঁদে আমিও কাঁদি। দুই জনে খানিক সেই খানে বসিয়া বসিয়া কাঁদিলাম। হায়! হায়! আমি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি। দাঁড়াও, একটু ভাবি। এই খানে কিছু গোলযোগ বোধ হইতেছে। দুই জনে কাঁদিলাম তাহার মানে কি? না, আমি একাই কাঁদিলাম; যাহাকে লইয়া ধরা পাকড়া সেত ভূত পেত্নীর মত কোথায় মিলাইয়া গেল। তাহার হইয়া আমিই কাঁদিলাম। অর্থাৎ আমার পুরাতন আমির ছায়াটা বিদায় কালে কাঁদিয়া গেল। তাহার রোদন বিলাপ শুনিয়া নূতন অর্থাৎ আসল মৌলিক বুনিয়াদী আমিটা হাসিয়া উঠিল। সে নিজেই বলিল, "ভূত ছাড়িয়া গিয়াছে, আমি বেশ আছি, তুমি কেঁদ না চুপ কর।

কোন কালে আমার বিকৃতি নাই, আমি বিশুদ্ধ চৈতন্য আত্মারাম। এত দিন মোহনিদ্রার ঘোরে পড়িয়াছিলাম, তাই এই সব অবস্থা মিথ্যা আমার ভূত প্রেতের উৎপাত। তদনন্তর অতি সূক্ষ্ম আত্মারাম হইয়া আমি পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হই। তদবস্থায় যেখানে যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহার বাহ্য আবরণ স্বচ্ছ কাচের ন্যায় জ্ঞান হইয়াছে।

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।]
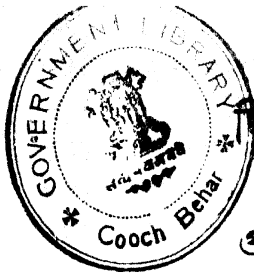
দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

আত্মারামের চিন্তা যেমন গভীর, মত এবং অভিপ্রায় গুলি যেমন দুর্ব্বিগাহ্য, জীবনটী তেমনি একটী ঘোর রহস্য। নাম শুনিলেই বুঝা যায়, ইনি এ দেশের লোক নহেন। জন্মের কথা এবং চরিত্রকাহিনী শুনিলে মনে হয়, ইনি বিধাতার মানসপুত্র, স্বর্গচ্যুত কোন দেবতনয়। কোথায় কোন্ দেশে, কার বংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তিনিও জানেন না, আমরাও জানি না, কিন্তু হরিপুরের বিষ্ণুরাম পণ্ডিত পিতা এবং তস্য পত্নী ভগবতী দেবী মাতা; এ কথা তিনিও জানেন, আমরাও জানি। এই শুদ্ধাচারী দ্বিজ দম্পতী হরিপুরবাসী সর্ব্বসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কি ইতর, কি ভদ্র, সকলেই তাঁহাদিগকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। বিষ্ণুরাম ধনীও নহেন, দরিদ্রও নহেন, কিন্তু দিব্যজ্ঞানে জ্ঞানী সুবিজ্ঞ পণ্ডিত এবং পরমার্থ ধনে ধনী তপস্বী। সংসার আশ্রমই তাঁহার তপোবন ছিল।

এইরূপ কিম্বদন্তী যে, চিরস্মরণীয় বার শত ত্রিশ সালের মহা বন্যায় যে সময় ঐ দেশ জলপ্লাবিত হয়, একদা তৎকালে তিনি তৃষানদীর তটে তপস্যায় নিরত ছিলেন। একাকী গভীর ধ্যানে মগ্ন আছেন, এমন সময় বন্যার জলোচ্ছ্বাসে নদী স্ফীত হইয়া উঠিল, উপকূল ভাসিল, ক্রমে তাঁহার কটিদেশ পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল। অবশেষে যখন আকণ্ঠ তাহাতে মগ্ন হইল তখন তিনি সচকিতভাবে উন্মীলিত নেত্রে সহসা চাহিয়া দেখেন, চারি দিক জলময়। নদীর ভীষণ কল্লোলে আকাশ আপ্লুত; স্রোতপ্রবাহে স্তূপাকারে ভগ্নগৃহ, উন্মূলিত বৃক্ষ, মৃতদেহ, সিন্দুক তক্তাপোষ বাসন তৈজস মৃৎপাত্র কত কি ভাসিয়া যাইতেছে। বিষ্ণুরাম আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া গৃহের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তদবস্থায় পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এক মুক্তকেশা দিব্য লাবণ্যময়ী নারীমূর্ত্তি কলার ভেলায় শুইয়া প্রফুল্ল শ্বেত পদ্মের ন্যায় স্রোতে ভাসিতেছে। তাহার উন্মুক্ত বক্ষে এক সুকুমার

শিশু স্তন্য পান করিতেছিল। সহসা সেই নিদারুণ দৃশ্য সন্দর্শনে বিষ্ণুরামের চিত্ত যুগপৎ বিস্মিত এবং কারুণ্য রসে পরিপ্লাবিত হইল। অতঃপর স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র খণ্ড দ্বারা সেই দিগ্‌বসনা অঙ্গনার অঙ্গ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাহাকে তিনি আশ্রমে আনয়ন করিলেন। মাতা এবং শিশু উভয়ে তখন মুমূর্ষু প্রায়। জননী কেবল নাম মাত্র জীবিত ছিলেন। তিনি অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "বন্যার জলে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এই শিশুটীকে বক্ষে লইয়া অকূল জলে ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছি। এই শিশু ব্রাহ্মণ কুমার।" এই কয়টী কথা বলিয়া তিনি নীরবে দেহ ত্যাগ করিলেন।

শিশুর বয়ঃক্রম তখন চারি কিম্বা পাঁচ মাস হইবেক। অতঃপর পতিপ্রাণা বিষ্ণুপত্নী ভগবতী দেবী অতি যত্নে স্বীয় গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় জানিয়া শিশুটীকে লালন পালন করেন। শিশুর ললাট এবং নয়ন যুগলে কতিপয় সুলক্ষণ চিহ্ন দেখিয়া বিষ্ণুরাম তৎকালেই বলিয়াছিলেন, "এ ছেলে সামান্য ছেলে নয়।" শিশু দুগ্ধ পান করে আর ঘুমায়, এই তাহার প্রধান কাজ; মাঝে মাঝে হাসে কাঁদে, কখন বা হস্ত পদ সঞ্চালন পূর্ব্বক ব্যায়াম এবং ক্রীড়া করে। তৎসঙ্গে অস্ফুট মধুর স্বরে সঙ্গীতবচনে কথা কয়। তাহার নিদ্রা কি এক অপূর্ব্ব দর্শন! ঘুমাও শিশু, খুব ঘুমাইয়া লও; ঘুমাও আর বড় হও। এমন বিশ্রামের দিন আর পাবে না, সুখে মাতৃক্রোড়ে নিদ্রা যাও। অনেক সুদীর্ঘ পথ তোমায় অতিক্রম করিতে হইবে। ভবিষ্যতে কত নিশি জাগিতে হইবে। জীবনসংগ্রামের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সম্মুখে। ননীর পুতুল আত্মারাম, তোমার ভিতর বিধাতা কি দুর্লক্ষ্য নিয়মে কার্য্য করিতেছেন তাহা আমরা কিছুই বুঝি না; কেবল রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া আছি। স্নেহবিগলিতনেত্রা শান্তিময়ী জননী তোমাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া মৃদু ললিত তানে যে সঙ্গীত করেন তাহা তোমারই অলৌকিক প্রভাবে বিরচিত হয়। গম্ভীর স্বভাব পিতা, যিনি বাল্যচাপল্যের অতীত, শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় নীরস, তিনিও অজ্ঞাতসারে ব্যঙ্গচ্ছলে তোমার স্বরভঙ্গী ও মুখভঙ্গী অনুকরণ করিতে লজ্জিত নহেন। ক্ষুদ্র শিশু সকলেরই ক্রীড়ার সামগ্রী। তাহাকে সং সাজাইয়া নাচাও, রাধাকৃষ্ণের বেশে সিংহাসনে বসাও, ধমক দাও, ভ্যাংচাও, দুই হাতে চটকাও, কোন বিষয়েই তাহার আপত্তি নাই। হে স্বর্গের দূত, তুমি বৃদ্ধকেও নবীন কর, যে কখনও হাসিতে চায় না, তাহাকেও হাসাও।

তুমি কে, এবং কি, তাহা কেহই জানে না। বিধাতা তোমার ভিতর লুকাইয়া কত খেলাই খেলিতেছেন! কি এক আশ্চর্য্য লীলার অমর বীজই তোমার মধ্যে আছে!

তদনন্তর কালবশে শিশু শৈশব পার হইয়া বালকত্বে পৌঁছিল। জলেতে প্রাপ্ত এই জন্য মাতা ভগবতী ইহাকে নারায়ণ বলিয়া ডাকিতেন। বালক দিন দিন বড়ই প্রিয়দর্শন এবং মধুরভাষী হইয়া উঠিল। বাল্য সহচরেরা ইহার নাম রাখিয়াছিল জলধর। আত্মারামকে সহসা দেখিলে যেমন আউলে বাউলের মত এখন বোধ হয়, বাস্তবিক তাহা নহে; তাঁহার স্মরণশক্তি অতিশয় প্রখরা ছিল। এমন কি, অতি শৈশবের কথা পর্য্যন্ত তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন। পরজীবনে যখন তাঁহার অধ্যাত্ম দৃষ্টি-শক্তি অতিশয় প্রতিভাশালিনী হইয়া উঠিল তখন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালের কথাই তিনি বলিতে পারিতেন। পরকালের জ্ঞান পর্য্যন্ত তাঁহার প্রজ্ঞাচক্ষুর নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। তদীয় বাল্য জীবনের কবিতাময়ী মধুর কাহিনী তিনি নিজমুখে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন;—

"নদীর উপকূলে পিতার তপস্যা কুটীরপ্রাঙ্গণে প্রমুক্ত আকাশতলে বিশুদ্ধ বিমল সমীরণের কোলে বসিয়া যখন আমি খেলা করিতাম, আর নভমণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্য তারকাগণের বিচিত্র শোভা দর্শন করিতাম, তখন মনে কি যে এক অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের উদয় হইত তাহা আর বলিতে পারি না। নবরাগে রঞ্জিত প্রকৃতি দেবী প্রতি ক্ষণে নব নব সুন্দর ছবি আমার হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিতেন। আহ্লাদের বাল্য জীবনে সকলই আহ্লাদময়। তখন পশু শাবকদিগের সহিতও ভ্রাতৃভাব। বনবিহঙ্গ সখা সহচর; পথপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র কাচখণ্ড, ভগ্ন চূর্ণ পরিত্যক্ত পদার্থগুলি যেন অমূল্য রত্ন। পত্র পুষ্প ধূলিকণা সকলই স্বর্ণময় মধুময়। নক্ষত্রখচিত সুনীল আকাশ যেন একটা আনন্দের মহামেলা। ধরাতল যেন অমরোদ্যানের মত রমণীয়। যাহা দেখি, তাহাই নূতন বোধ হয়, এবং তাহার তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রাণ যেন কেমন করে। বিশ্বের সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া সমস্তই এক সঙ্গে সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা হইত। বাল্যসহচর খেলার সঙ্গীদিগকে কি মিষ্ট চক্ষেই দেখিতাম! ছোট বড় উচ্চ নীচ ভেদজ্ঞান তখন কোথায়? অক্ষমা বিদ্বেষ কুটিল বুদ্ধি মানাভিমানই বা কে জানিত? বিবাদ ঝগড় মারামারিতেও প্রেম কমিত না। আমি যে স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি, দৃশ্য স্পৃশ্য

যাবতীয় পদার্থ যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, ঈদৃশ বিশেষত্ব এবং ব্যক্তিত্ব বোধ তখন পরিষ্কার হয় নাই। খেলনা খাদ্য কাপড় জুতা সহচরগণের সহিত বিনা বিচারে বিনিময় করিতাম। পশু পক্ষী মনুষ্য জড় চৈতন্য সব যেন এক পরিবারভুক্ত। আকাশ ভূতল, জলপথ স্থলপথ সব একাকার। রজনীর চন্দ্রালোক, দিবসের সূর্য্য কিরণ একাকার। পল মুহূর্ত্ত দণ্ড প্রহর দিন রাত্রি সপ্তাহ মাস বর্ষ অখণ্ড অভেদ।"

"বালকই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী, বিষ্ঠা চন্দন তাহার নিকট সমান। বৃষ্টি বাত মেঘ বিদ্যুৎ বজ্রনাদে মনের মধ্যে কত বিজ্ঞান চিন্তা এবং বীর রসেরই আবির্ভাব হইত! বনবীথিকা, কুসুমোদ্যান, চন্দ্রালোকশোভিত লহরীময় তটিনীবক্ষ, জলসিক্ত মৃদু সমীরণ, বিহঙ্গের সঙ্গীত, পশু শাবকের নৃত্য কুর্দ্দন, আর তার সঙ্গে সহচরগণের হাস্যামোদ, এই সমস্ত একত্র মিলিত হইয়া আমার হৃদয়বৃত্তিকে কেমন সহজে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল! প্রকৃতির শিক্ষা প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় অন্তরে চির মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের পুস্তকের শিক্ষা, শিক্ষকের উপদেশ তেমন কি মনে থাকে? হায় এ পৃথিবীর শিক্ষাপ্রণালী কেন প্রকৃতির অনুসরণ করে না।"

"নবোন্মেষিত সজীব সুস্থ বাল্যদেহ আপনা হইতে যেন বেগে দৌড়াদৌড়ি করিতে চায়। প্রথম যে দিন কথা কহিতে এবং হাঁটিতে শিখিলাম, সে দিন বড় আহ্লাদের দিন। তার পর যখন স্বাধীন ভাবে দৌড়িতে শিখিলাম, তখন আমিই বা কে, আর রাজাই বা কে! আপন হাতে খাব, নিজে কাপড় পরিব, পথ দিয়া একা হাঁটিয়া যাইব এবং সব কাজ নিজে করিব, ইহার জন্য পিতা মাতা ভৃত্যের সঙ্গে কতই না ঝগড়া করিয়াছি। প্রথম ব্যায়াম শিক্ষার যে ব্যবস্থা, তাহাও স্বভাবের হাতে। উদ্দাম অনুরাগ যেন বিজলীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে খেলা করিত। বালক মাত্রেই তত্ত্বানুসন্ধায়ী; যখন আমার বয়ঃক্রম পঞ্চম বর্ষ, তখন হইতেই জানিবার প্রবৃত্তি কিছু অধিক হইয়াছিল। যাহা দেখিতাম তাহারই বিষয় পিতাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতাম, এবং তিনি ধৈর্য্যের সহিত তাহা বুঝাইয়া দিতেন। আমার প্রথম শিক্ষা এইরূপে পিতার নিকটেই আরম্ভ হয়। তিনি দৃশ্যমান ঘটনা সকল যে ভাবে বুঝাইয়া দিতেন, তাহার অবলম্বনে সে বিষয়ে আরো অনেকানেক চিন্তা এবং ভাব আমার ক্ষুদ্র মনে উদয় হইত। ইহাতে তরল বাল্য হৃদয় ভাবোদ্গমে যেন এক এক বার

বিস্ফারিত হইয়া উঠিত। কিন্তু প্রকাণ্ড এক অভিনব অত্যাশ্চর্য্য বিশ্বরাজ্য সম্মুখে, একা আমি দুই দশ দিনের মধ্যে তাহা কত দেখিব, কত বুঝিব, কতই বা ভোগ করিব? এই অনিবার্য্য কৌতূহল এবং অপরিতৃপ্ত বৃদ্ধিশীল অনুসন্ধানস্পৃহা আমার হৃদয় মনকে অকালে বলপূর্ব্বক প্রসারিত এবং বিকসিত করিয়াছিল। পিতৃদত্ত শিক্ষা কেবল তাহার উদ্ঘাটন মাত্র। বিদ্যালয়ের পঠিত জ্ঞানের অগ্রেই বস্তু জ্ঞান, কতকটা দেশ কাল পাত্র জ্ঞান এইরূপে আপনাপনি আমার অন্তরে সমুদিত হয়।"

"মনুষ্যের জন্ম মৃত্যু এবং দৈনিক ব্যবহার, প্রাকৃতিক ঘটনা, জল ও স্থল পথে লোকের গমনাগমন, অনন্ত আকাশে সূর্য্য চন্দ্রের উদয়াস্ত এবং গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি ও নৈসর্গিক দৃশ্য, এই সকলের ভিতর দিয়া পিতৃদেব আমাকে ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, জ্যোতিষ এবং চিত্রকাব্য শিক্ষা দিতেন। এই রমণীয় শিক্ষা অদ্যাবধি আমার মরমে মরমে গাঁথা রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত কিছু মাতৃভাষা এবং বৈদেশিক ভাষা, ও ব্যাকরণ তাঁহার নিকট শিখিয়াছিলাম। নদীর স্রোতে পালতোলা নৌকাগুলি যাতায়াত করিত, তদ্দর্শনে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, এ সব কি? এরা যায় কোথা? এবং কেনই বা যায়? তিনি বলিতেন, বাণিজ্য সামগ্রী দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বিতরণ করিবার জন্য ইহারা যাইতেছে। ইহার পর বড় নদীতে পড়িবে, তার পর সমুদ্রে যাইবে। (প্রশ্ন) তার পর? (উ) তার পর মহাসমুদ্রে। পিতার কথা শুনিতে শুনিতে আমি যেন সম্মুখস্থ তৃষানদীর জলস্রোতে ভাসিয়া এবং মিশিয়া ক্রমে সমুদ্র মহাসমুদ্রে গিয়া উপস্থিত হইতাম। ভাবিতাম, এ জলস্রোতের আদি কোথায়, অন্তই বা কোথায়? শেষ কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া অনাদি অনন্তে আত্মহারা হইতাম। যখন আমার বয়স সাত কি আট বৎসর তখনকার কথা বলিতেছি। সম্মুখের পথ দিয়া গাড়ী ঘোড়া লোক জন যাইত, আমি ভাবিতাম এরা যায় কোথা? এই পথেরই বা আদি অন্ত কোথা? পরিশেষে মনে হইত জলপথে এবং স্থলপথে সমস্ত পৃথিবী তবেত ঘুরিয়া বেড়ান যায়! তখন হইতেই ভ্রমণেচ্ছা মনে বলবতী হইয়াছিল।"

"এক দিন খুব ছেলেবেলায় নদীতটে বসিয়া আছি। দেখি যে পশ্চিম গগনে সূর্য্য ক্রমে নামিতে লাগিল এবং বিচিত্র কিরণচ্ছটায় মেঘমালাকে অনুরঞ্জিত করিল; এবং সেই প্রতিবিম্বরাশি তটিনীর মৃদু তরঙ্গে মিশিয়া কত

সুন্দর ছবি আঁকিল। আহ্লাদভরে এই মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমি আপনিও যেন সেই বিমিশ্র বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে পরিণত হইলাম। খানিক পরে দেখি, সে রক্তিমরাগে রঞ্জিত সূর্য্য নাই, কেবল তাহার সুন্দর কিরণচ্ছটা আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে। আর খানিক পরে তাও রহিল না। শেষ চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, "হে সূর্য্য দেব! আমাকে আঁধারে ফেলিয়া তুমি কোথায় গেলে? হায় আর কি তোমার রাঙ্গা মুখ খানি আমি দেখিতে পাব না।" ভাবিলাম, আর হয়ত সুয্যি মামা ফিরিয়া আসিবেন না। এইরূপে নিরাশ ভগ্নান্তঃকরণে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরে নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া দেখি, পূর্ব্বদিকে আবার সেই রক্তিম বর্ণ সূর্য্য! তখন আহ্লাদে হাসিলাম। তদনন্তর দিনের পর দিন এই দৃশ্য দেখিয়া বিশ্বাস জন্মিল, আঁধারের পর আবার আলো হবেই হবে। এই সঙ্গে সময়ের এবং আকাশের অখণ্ড অসীমত্বে মন প্রাণ ডুবিয়া গেল। রাত্রিকালে নীল আকাশের গায়ে অগণ্য গ্রহ তারা চন্দ্রমা ঝলমল ঝলমল করিত দেখিয়া সাধ হইত, উহাদের সঙ্গে গিয়া বসিয়া খেলা করি। তারাগুলি বেশ ছোট ছোট ডাকের চুমকির মত, কুড়াইয়া লইতে ইচ্ছা হইত। পিতার মুখে প্রথম যে দিন শুনিলাম, উহারা ছোট নয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক একটী পৃথিবীর মত; আর এক জায়গায় বসানও নয়, শূন্যে ঝুলিতেছে এবং মহাবেগে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; সেই সঙ্গে আমাদের এই পৃথিবীটেও বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে; সে দিন আমার মনে যে কি অদ্ভুত ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা আর বলা যায় না। ইহারা দিবা নিশি মহাবেগে ঘুরিতেছে শুনিয়া আমারও বড় ঘোর লাগিল। তখন পিতার ক্রোড়ে মাথা লুকাইলাম।"

"মেঘ বাতাস বিদ্যুৎ যাহা কিছু দেখিতাম সকলের ভিতরেই অনন্তের অনন্ত লীলা। সে সকল না ভাল করিয়া মনে ধরাই যায়, না মুখে বলাই যায়। ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ডের বড় বড় ভাব ও চিন্তাগুল যেন আমার ক্ষুদ্র হৃদয়াধারে হুটপাট করিয়া বেড়াইত। এক এক বার ভয় হইত, কি জানি বা পাছে ক্ষুদ্র আধারটী ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু ইহাতে বড় আমোদ। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া প্রাণ পুলকিত হইত। তখন হাততালি দিয়া গান গাইতাম, নাচিতাম, হাসিতাম। আমার রকম সকম দেখিয়া পিতা বলিতেন, "কি রে বাপু, তুই কি পাগল হলি না কি?" এই বলিয়া তিনিও মুখ মুচকিয়া হাসিতেন। প্রতিবাসী আত্মীয়গণ এ জন্য আমাকে অকালপক্ক বলিয়া

ঠাট্টা করিত। এই সকল বাল্যচাঞ্চল্যে অনেক সময় পিতার তপস্যাদির ব্যাঘাত ঘটিত। আমি তাঁহাকে কত বারই বিরক্ত করিতাম। কিন্তু তিনি হাস্য মুখে মধুর ভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তাঁহার ঈদৃশ বাৎসল্য প্রভাবে আমি সে সময় নীতি বিষয়ে অনেক সৎশিক্ষাও পাইয়াছিলাম। তিনি বসিয়া ধ্যান চিন্তা করিতেন, আমি কুটীরপ্রাঙ্গণে খেলা করিতাম, খাবার খাইতাম। দিনের পর দিন চলিয়া যায়, আবার আসে আবার যায়; কত ছোট্টটি ছিলাম আমি, ক্রমে কেমন বড় হইয়া উঠিলাম! দেখিতে দেখিতে সময় আমাকে শৈশব ও বাল্যসীমা পার করিয়া কৈশোরে পৌঁছিয়া দিল। দেহ আত্মায় মিলিত এই মানব জীবন কি আশ্চর্য্য দৈবশক্তির খেলা; আপনিই বাড়ে, আপনিই ফুটিয়া উঠে।"

আত্মারাম অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ বালকের ন্যায় হইলেও চিন্তাশক্তি বিষয়ে অসাধারণ। পিতার নিকট যখন কৈশোরে ভাষা এবং ব্যাকরণ শিক্ষা আরম্ভ করেন তখন যে সকল অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তচ্ছ্রবণে বিষ্ণুরামও অবাক্ হইয়া যাইতেন। এই কয়টী সামান্য সংখ্যক অক্ষর হইতে এত বড় প্রকাণ্ড অনন্ত ভাবব্যঞ্জক ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল ইহা ভাবিয়া বালক একবারে বিস্মিত হইত। প্রথমে সে দুই একটা শব্দ সংজ্ঞা দ্বারা অন্তর বাহিরের বহুল জ্ঞান ব্যক্ত করিত। অতঃপর পিতার নিকট যখন শুনিল, প্রত্যেক পদার্থ, প্রত্যেক জ্ঞান এবং ভাবের এক একটী নির্দ্দিষ্ট বিশেষ সংজ্ঞা আছে, তখন আত্মারাম ভাষাশক্তির মহাসাগরে একবারে ডুবিয়া গেল। ইহার অদ্ভুত উন্নতি, বিচিত্র বিকাশ এবং বহুবিধ সুর স্বর উচ্চারণ-প্রণালীর কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া তাহার মনে বিপুল চিন্তাস্রোত উথলিত হইল। এক দিনের কথা তিনি এইরূপ বলিয়াছেন;—"ভাবিলাম, আন্তরিক ভাবের উদ্গম এবং কণ্ঠনালী ও রসনাযোগে আকাশে তাহার অনুরূপ শব্দ প্রকাশ, বাতাসের ভিতর দিয়া অপর কর্ণরন্ধ্রে আবার তাহার প্রবেশ, তদনন্তর অপরের অন্তঃকরণেও সেই শব্দের যথার্থ অর্থবোধ, এত শীঘ্র শীঘ্র এ সকল কার্য্য কেমন করিয়া হয়! এক জনের মনের নিগূঢ় অদৃশ্য চিন্তা ভাব আর এক জন এই প্রণালীতে কেমন করিয়াই বা বুঝে, ইহা আমি ধারণা করিতে পারিতাম না। নিমেষের ভিতরে পরস্পরের মধ্যে এইরূপে ভাব চিন্তা অভিপ্রায় এবং জ্ঞানের বিনিময় আদান প্রদান বড়ই আশ্চর্য্য; ইহাতে প্রতিপদে ভুল হইবারই সম্ভাবনা। কত কাল ধরিয়া, কত লোকের দ্বারাই

এই ভাষা গঠিত হইয়া আসিতেছে! এইরূপ চিন্তায় আমার মনকে যেন পাগল করিয়া তুলিত। যে জিনিসটায় হাত দিই, তারই আড়ালে দেখি অনন্ত গভীর সমুদ্র। এই জন্য আজ পর্য্যন্ত বর্ণ পরিচয়েরও ভালরূপ পরিচয় পাইলাম না। এক ভাষার মধ্যেই দেখি অনন্ত জ্ঞান প্রচ্ছন্ন।"

আত্মারাম এই ভাবে খেলা করেন, তৎসঙ্গে স্বভাব কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া পিতৃ সাহায্যে নানা বিষয়ে শিক্ষা সংস্কার লাভ করেন। এক দিন পিতা মাতার অগোচরে বাল্যসুলভ চাঞ্চল্যের বশীভূত হইয়া আর কতিপয় বালক বালিকার সহিত তিনি খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বালকের মনের গতি কে বুঝিতে পারে? তাহারা দুইটী বেরাল ছানা ধরিয়া তাহাদের গায়ে তেল হলুদ মাখাইয়া স্নান করাইয়া, গলায় ফুলের মালা এবং কপালে সিন্দুর চন্দন পরাইয়া দিব্য এক বিবাহোৎসব আরম্ভ করিয়াছে। কতক কৃত্রিম, কতক সত্য সামগ্রী দিয়া বর কন্যা সাজাইল, বাজী পোড়াইল, পরিশেষে আহারাদি এবং আনুষঙ্গিক আমোদ আহ্লাদ হইল। বিবাহের পর এক বালক প্রস্তাব করিল, এস ভাই কালী পূজা করি। যেমন প্রস্তাব তেমনি কার্য্য! মাটি ছানিয়া ঠাকুর গড়িল, নৈবিদ্য সাজাইল, ফুল পাতা আনিল। শেষ বলে ভাই বলিদানের কি হবে? তখন সেই নববিবাহিত বেরাল দম্পতীকে ধরিয়া টানাটানি। একে তাহারা তেলে জলে হলুদে এবং পাঁচ জনের আদরে অস্থির হইয়াছে, তার উপর এখন প্রাণ দিতে হইবে। যতই মেউ মেউ করিয়া ডাকে, ছেলেদের ততই আমোদ। এক জন চাকু ছুরি বাহির করিল, আর এক জন বেরাল বধূর সম্মুখের পা এবং কাণ টানিয়া ধরিল; আত্মারামকে বলিল, তুই পিছনের পা এবং ল্যাজটা খুব টেনে ধর। আমোদের স্রোতে পড়িয়া যখন এই অবস্থায় আত্মারাম অবস্থাপিত, এমন সময় তাহাদের চাকর আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল, "মা ঠাকুরাণী ডাকিতেছেন খাবে চল।" তখন কি আর খাওয়া দাওয়া মনে থাকে? বালক রাগিয়া বলিল, "যা আমি যাব না যা! ছেড়ে দে! তুই চলে যা! তুইত চাকর, কেন তুই আমায় ডাকবি?" বিষ্ণুরাম এই কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হন, এবং সন্তানকে বলেন, "তুমি আমার বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্যকে চাকর বলিয়া ঘৃণা কর? ও যে তোমার ভাই, তা জান?" ইহাতে আত্মারাম বড় লজ্জিত হন। তদনন্তর পিতা তাঁহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

"বিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের কথা বোধ হয় তোমরা সকলেই জান স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময় আমাকে একটী বড় গোলে পড়িতে হইয়াছিল স্কুলগুলি ঠিক যেন দোকানের মত আমার মনে হয়। কোথাও বিজ্ঞা কোথাও নীতি, কোথাও ব্যায়াম, এবং সঙ্গীত, কোথাও বা প্রাচীন ধর্ম্মশা শিক্ষা দিবার বিজ্ঞপ্তি আছে। তদ্ব্যতীত যত অল্প সময়ে অল্প ব্যয়ে যি পাস করাইতে পারেন তৎসম্বন্ধে তিনি অতীব আশাজনক বিজ্ঞাপন দিয় ছেন। যেখানে নীতি শাস্ত্রের শিক্ষা হয় তথায় আমি ভর্ত্তি হইলাম কুকুরে দলে একটা দিশাহারা কুকুর হঠাৎ প্রবেশ করিলে তাহার যেম দশা হয়, প্রথমতঃ আমার ঠিক তাই হইল। কেহ চিম্‌টি কাটে, কেহ বে হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, কেহ বা নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করে। সহ ধ্যায়ীদের অত্যাচারে আমার কান্না পাইত। তাহারা এইরূপে কাঁদাই আবার ফিচ্‌ কাঁদুনে বলিয়া আমায় ঠাট্টা করিত। পৃথিবীর প্রবেশদ্বা বিনা সংগ্রামে এক পাও অগ্রসর হওয়া যায় না, তাহা প্রথমে আমি এ খানেই বুঝিয়াছিলাম। দিন কতক পরে সকলের সঙ্গে বেশ ভাব হইল তখন আমিও নূতন ছেলেদের প্রতি ঐরূপ করিতে শিখিলাম। আমা বোধ হয়, পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে।"

"নীতিশিক্ষা ভাল হয় শুনিয়া পিতা আমাকে এই স্থানে ভর্ত্তি করিয় দেন। কিন্তু এ নীতিতে আমার পূর্ব্ব সংস্কার সব উল্টাইয়া দিয়াছিল বাড়ীতে পিতার নিকট পূর্ব্বে যে যে বিষয়ে সৎশিক্ষা পাইয়াছিলাম, স্কুলে এসে সেগুলি প্রায় ভুলিয়া গেলাম। তৎপরিবর্ত্তে দুষ্টামি তামাসা ঠাট্ট বাচালতা অনেক শেখা গেল। যিনি নীতি শিক্ষক, তিনি বলিতেন, "তোম মিথ্যা কথা বলিও না, এবং গুরুজন ও শিক্ষকদিগকে মান্য করিও, কদাপি তাঁহাদের কোন দোষ ত্রুটি ধরিও না।" আমি এক দিন জিজ্ঞাসা করিয় ছিলাম, মহাশয়! মিথ্যা মানে কি? [উ] তা আর জান না! অর্থাৎ সা সত্য পথে চলিবে। [প্র] সত্যই বা আপনি কাহাকে বলেন? [উ আঃ অত ফাজিল বক কেন? [প্র] সত্য মিথ্যা ভাল করিয়া বুঝাই দিবেন না? [উ] ওহে বাপু, সত্য মানে ভাল, আর মিথ্যা মানে মন্দ

প্র। ভাল মন্দই বা আপনি বলেন কাকে? [উ] দশ জন ভদ্রলোকে যা ভাল বলে তাই ভাল; তদ্বিপরীত যা তাই মন্দ। "মহাজন যেন গতস্ত পন্থা" এ কথা শুন নাই কি? [প্র] ভদ্রলোক কিংবা মহাজন আপনি কাহাকে বলেন? [উ] তুমিত বড় জ্যাঠা ছোক্‌রা দেখি হে! তুমিই কেন এত কথা বলছ? কৈ আরত কেউ কিছু বলে না? চুপ করে শুনে যাও! [প্র] ভদ্রলোক চিন্‌ব কিরূপে? শিক্ষক মহাশয় তখন চোগ মুখ লাল করে, দাঁত খিচিয়ে টেবিলের উপর বই খান ছুড়ে ফেলে দিয়ে বল্লেন, "তোমাকে আমি ভয়ানক সাজা দেব তা জান? অতি বদ্‌ তুমি।" এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাড়ী রওনা হইলেন। একটী ছাত্র আমার কাণে কাণে বলিল, "এক ঘণ্টা নীতিশিক্ষা দিবার নিয়ম আছে, মাষ্টার মশায় আধ ঘণ্টায় সেরে এখন বোধ হয় প্রাইভেট্‌ টিউশনে গেলেন।" অন্য আর একটী বুদ্ধিমান ছাত্র বলিল, "উনিত তবু পদে আছেন, হেড্‌ মাষ্টার মহাশয় ভিতরে ভিতরে ঢুকু ঢুকু।" আর একটী সাহসী স্পষ্টবক্তা ছেলে বলিল, "ও সব ব্যাটাই সমান। কেবল পেসাদারী। আমি ওদের উপদেশ গ্রাহ্যও করি না।" ইহাদের মুখে যা কিছু শুনিলাম, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও আমি অনেক পাইয়াছিলাম। নীতির এই ছাঁচে এখানে পুরুষানুক্রমে ছাত্র সকল প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। এই ছাত্রেরা আবার শিক্ষক হবে, তারা আবার এখানে কিম্বা অন্য স্থলে ঐরূপ শিক্ষা দিয়া ছাত্র এবং শিক্ষকের বংশ ক্রমাগত প্রবাহিত করিবে। বেশ যেন একটী স্বকৃতকর্ম্মা কল; আপনিই আপনাকে চালায়, স্কুল সংস্থাপককে সে জন্য আর কিছু করিতে হয় না।"

"এখানে নীতি শিক্ষার অতিশয় উৎপীড়ন দেখিয়া পিতা আমাকে অন্য এক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেখানে অন্য কোন গোলযোগ ছিল না, যাহাতে অল্প সময়ে অনেক ছাত্র পাস হয় তদ্বিষয়ে শিক্ষকেরা ভারি মনোযোগী। এই পাসের জন্য আমাকে বুদ্ধি কিম্বা চিন্তাশক্তিকে কোন কষ্ট দিতে হয় নাই। কেবল স্মরণশক্তি আর কণ্ঠশক্তি অধিক মাত্রায় প্রয়োজন হইয়াছিল। অন্য স্থানে ছয় বৎসর লাগে, এখানে চারি বৎসরে পাস করা যায়। রাত্রি জাগরণ, স্মরণশক্তি, এবং কণ্ঠশক্তি এই তিনের সাহায্যে আমি শীঘ্রই একটা পাস দিয়া ফেলিলাম। তার সঙ্গে নিজগুণে বুদ্ধিশক্তিও কিছু কিছু উন্মেষিত হইয়াছিল। নীতির কলটী যেমন স্বকৃতকর্ম্মা, পাসের

কলটীও তেমনি ; ইহার দ্বারা প্রতি বর্ষে অনেক ছেলে—পেসো ছেলে প্রস্তুত হয়। পাসের অনেক গুণ, খুব হাই প্রিমিয়মে শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ হয়, এবং ভাবীবংশকে পাস করাইবার উপযুক্ত চাকরীও তদ্দ্বারা সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক দিকে নীতিশিক্ষার কলে ভদ্রলোক, অন্য দিকে পাসের কলে জ্ঞানী বিদ্বান্ সকল বর্ষে বর্ষে উৎপন্ন হইয়া দেশে দেশে, গ্রামে নগরে তাহারা আবার নীতি এবং পাসের কল কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। কিন্তু নীতির কল অপেক্ষা পাসের কলের উপকারিতা বেশী, সুতরাং তাহার আদরও যথেষ্ট। উভয় কলের ভিতর দিয়া যে ছেলে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহার মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।"

"পিতার নিকট স্বভাবের বিদ্যালয়ে বাল্যক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল শিক্ষা পাইতাম তাহাতে হৃদয় মন বড় পুলকিত হইত ; কিন্তু স্কুলের শিক্ষায় সেরূপ আনন্দ অনুভব করিতে পারিলাম না। ইহাতে মাথা ধরে, গলা শুকায়, চক্ষে বেদনা হয়, মন প্রাণ যেন অবসন্ন হইয়া পড়ে। অন্য চিন্তা বা জ্ঞানচর্চ্চার সময় থাকে না, পাঠ মুখস্থ করিতে করিতেই প্রাণ যায়, আর কেমন করিয়া পাস দিব অহর্নিশি কেবল এই ভাবনা। যাই হউক, অল্প বয়সেই পাস করিয়াছিলাম। ফাষ্ট ডিভিসনে পারিতাম, একটী দৈব ঘটনার জন্য তাহা হইল না।"

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে আত্মারাম নিজ জীবনের আদি বৃত্তান্ত শুনিয়া এক অভিনব চিন্তার মধ্যে নিপতিত হন। বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইত না, স্বভাবের গতি তাহার প্রতিবাদ করিত। অন্যান্য বালকের ন্যায় তিনি চঞ্চল ক্রীড়াশীলও ছিলেন না, খেলার সময় একাকী এক নিভৃত স্থানে বসিয়া ভাবিতেন, কিম্বা উদ্যানের ঝোপের মধ্যে বেড়াইতেন। এ জন্য অপর বালকেরা তাঁহাকে খেলার ভাগে লইতে চাহিতও না। এক দিন একটা নূতন রকমের খেলার আয়োজন দেখিয়া জলধর (সহচর সহাধ্যায়ীরা ইঁহাকে এই নামে সম্বোধন করিত) কিছু অনুরাগ প্রকাশ করেন। কিন্তু সঙ্গীরা তাঁহাকে খেলার ভাগে লইল না। ইহাতে তিনি দুঃখিত এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি কি তবে ভেসে এইচি, তাই আমাকে ভাগে নেবে না?" একটী বালক হাসিয়া বলিল, "তুমি ভেসেইত এয়েছ? নৈলে জলধর তোমার নাম হইল কেন?" সহসা এই নূতন কথা শুনিয়া জলধর যেন স্তম্ভিতের ন্যায় নির্ব্বাক হইলেন।

এবং সহচর বালকবৃন্দের মুখে জীবনের আদি বিবরণ কিছু কিছু জানিতে পারিলেন। তৎকালকার মনের ভাব তিনি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন ;—

"এই নূতন কথা শুনিয়া আমার মন উদাস হইয়া গেল। নানা প্রশ্ন, বহু প্রকার চিন্তা মনে উদয় হইল। শৈশব হইতে যাঁহাদিগকে পিতা মাতা বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি তাঁহারা ভিন্ন অন্য পিতা মাতা ছিল ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, অথচ বাল্য সংস্কারের উপর একটা বিষম আঘাত লাগিল। আন্দোলিত চিত্তে গৃহে আসিয়া পিতার মুখে যখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিলাম, তখন আমি আমাকে এক অদ্ভুত দুর্ব্বোধ্য জীব মনে করিতে লাগিলাম। সহজেইত মানুষ আপনার নিকট আপনি চির দিন এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য রহস্য, তার উপর জন্ম এবং প্রতিপালন রহস্য ভাবিয়া সে রাত্রে আর আমি ঘুমাইতে পারিলাম না। ভাবিলাম, মাতা আমাকে বক্ষে লইয়া অকূল জলে ভাসিয়াছিলেন, আহা! কি অনুপম স্নেহ! কি গভীর দুর্ব্বিগাহ্য ভালবাসা! শেষ আমি শিশু বাঁচিয়া রহিলাম, মাতার মৃত্যু হইল! মৃত্যুটা কি? মরিয়া লোকে কোথায় যায়? আমার মা মরিয়া কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? তাঁহাকে কি আর দেখিতে পাওয়া যায় না? যে দেশে তিনি গিয়াছেন আমি বড় হইয়া সেই দেশে গিয়া তাঁহাকে খুজিয়া আনিব।"

"এইরূপ ভাবিয়া এবং নিজের আদি বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া আমার হৃদয় বড় আর্দ্র হইল। নিজের কথা যেন উপন্যাসের মত মনে হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে প্রতিপালক পিতা মাতার উপর প্রেম আনুগত্য পূর্ব্বাপেক্ষা যেন আরো বাড়িয়া গেল। নাইবা বাড়িবে কেন? সম্বন্ধের টান, নাড়ীর টান কার্য্য ব্যবহারগুণে ক্রমে বৃদ্ধি হয়, তাহার অভাবে ক্রমে ক্রমে আবার কমিয়াও যায়। যে স্নেহ যত্নে প্রতিপালন করে, রক্তের সম্বন্ধ থাক আর নাই থাক, সেই পিতা মাতা ভাই ভগিনী আত্মীয় প্রিয়। সুতরাং পিতা মাতার প্রতি আমার ভালবাসা আনুগত্য বশ্যতা আরো ঘনতর হইল।"

"এই সময়ের অল্প দিন পরে আমার প্রতিপালিকা জননী দেবী পরলোক গমন করেন। মৃত্যু কি, তাহা এখন বুঝিতে পারিলাম। অথবা দেখিলাম, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সুখের সংসারে মৃত্যু কি এক ভীষণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য! উপরে আনন্দের মেলা, অভ্যন্তরে যেন ঘন তিমিরাবৃত

মৃত্যুর দিগন্তব্যাপী গভীর গহ্বর মুখ ব্যাদান করিয়া অল্পে অল্পে আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে। মৃত্যুর গ্রাসেই আমাদের স্থিতি তাহা তখন বুঝিতে পারিলাম। ইহা বুঝিয়া আমার হৃদয় শূন্য হইয়া গেল, চারিদিক মহান্ধকারে ঘেরিল, কালের করাল মূর্ত্তি আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে অতি ক্ষুদ্রতায় পরিণত করিয়া ফেলিল। ইহার পূর্ব্বে মৃত্যু কখন দেখি নাই। জননীর অদর্শনে মহাশোকে, অনন্ত অন্ধকারে ডুবিয়া গেলাম; কিন্তু কাঁদিলাম না। পিতা নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে স্থাণুর ন্যায় নিষ্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। আমিও তাঁহার পার্শ্বে মৃত্যুর বিস্ময়কর লীলা ধ্যান করিতে লাগিলাম। আহা! মৃত্যু কি শান্তিরসপূর্ণ গম্ভীর দৃশ্য। প্রাণহীন প্রশান্ত মৃতদেহ দর্শনে আমি যেন নির্ব্বাণের শান্তিময় নিস্তব্ধ এক সুবৃহৎ রাজ্য দর্শন করিলাম। মৃত্যু যেন নিরাপদের দুর্গ। পৃথিবীর মান অপমান দুঃখ দারিদ্র্য অন্নচিন্তা ভাবনা উদ্বেগ বিচ্ছেদ বিবাদ, রিপুর পরাক্রম এই দুর্গদ্বারে প্রবেশ করিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হতাশ মনে ফিরিয়া যায়। কেবল আসক্তি এবং পাপের ছায়া দিন কতক সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তার পর ইন্দ্রিয় এবং তাহার বিষয়ের অভাবে আপনাপনি সে সব লয়প্রাপ্ত হয়।"

"জীবন মৃত্যু উভয়ই আমার নিকট তখন এক অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হইল। ঘোর রহস্যের মধ্যে অনেক ক্ষণ নীরবে একাকী কত কি ভাবিলাম। হৃদয়াবেগ বশতঃ এক এক বার চক্ষুর্দ্বয় বাষ্পাকুলিত হইতে লাগিল। তদনন্তর শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার ভাবনা চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া খানিক ক্ষণ নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিলাম। পরিশেষে স্পষ্ট বোধ হইল, কে যেন এক জন ইহার ভিতর লুকাইয়া কি করিতেছেন বেশী আর কিছু বুঝা গেল না। অতঃপর প্রতি পদার্থ এবং ঘটনার মধ্যে গভীর অভিপ্রায়পূর্ণ এক মহাদৃষ্টি যেন সর্ব্বত্র দেখিতে লাগিলাম। চর্ম্মচক্ষুবিহীন জীবন্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি। অন্তর্ভেদী সর্ব্বগত দৃষ্টি। এই দৃষ্টিজালে আমি জড়িত, দৃষ্টিবাণে আমি বিদ্ধ। কোন ব্যক্তি নাই পদার্থ নাই, কেবল অন্ধকার যেখানে, সেখানেও ঐ জ্বলন্ত দৃষ্টি। আবার যেখানে ভৌতিক ক্রিয়া, স্বভাবের অনন্ত কার্য্যসমারোহ সেখানেও ঐ দৃষ্টি। সর্ব্বসাক্ষীর সর্ব্বব্যাপিনী দৃষ্টি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশেও বর্ত্তমান।"

তৃতীয় অধ্যায়।

আত্মারাম আমাদের আধুনিক সভ্যতার সময়ের জীব, সুতরাং তাঁহাকে উচ্চ শ্রেণীর কলেজে যথারীতি কয়েক বৎসর পড়িতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগের ভদ্র সন্তানেরা সচরাচর যে যে অবস্থার ভিতর দিয়া সংসাররাজ্যে প্রবেশ করে, এবং তথায় প্রবেশপূর্ব্বক মানব জীবনের শেষ সীমা প্রাপ্ত হয়, ইনিও ঠিক সেই সেই অবস্থার ভিতর দিয়া আসিয়াছেন; তৎসম্বন্ধে কোন উদ্ভট লক্ষণ কিছু দেখা যায় না। এই মাত্র কেবল প্রভেদ, অন্য দশ জন যে ভাবে বস্তু দর্শন করে, ইনি সেরূপ দর্শনে সন্তুষ্ট নহেন। আত্মারামের দর্শন অন্তর্ভেদী, তিনি বস্তুর বস্তু আদি তত্ত্ব দেখিবার জন্য সর্ব্বত্র দৃষ্টিকে প্রসারিত এবং ঘনীভূত করিতেন। আদর্শ সারবত্তার দিকেই তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ বদ্ধ থাকিত; এই নিমিত্ত জগতের ব্যবহারিক ক্রিয়াগুলিকে তিনি প্রায় নির্দ্দোষ বলিতে চাহিতেন না। তজ্জন্য তাঁহাকে সহসা দোষানুসন্ধিৎসু সর্ব্বসংশয়ী বিশ্বনিন্দক বলিয়া অনেকের ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। তিনি বিরক্ত বৈরাগী কঠোর হৃদয় দুর্ম্মুখ জ্ঞানী নহেন। মনুষ্যকৃত কীর্ত্তি সমুদয়কে তিনি যে চক্ষে দেখিয়াছেন, সে চক্ষু তোমার আমার নাই। এক দিকে তিনি যেমন ক্ষণভঙ্গুর বাহ্যদৃশ্যকে অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে অসার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন, অন্য দিকে তাহাকে আভ্যন্তরীণ অব্যক্ত দেবভাবের ঈষদ্বিকাশ, অদৃশ্যের দৃশ্য নিদর্শন, নিত্য সত্তা অনন্ত চৈতন্যের ছায়া বলিয়া তৎপ্রতি অবনত মস্তক হইতেন। এই দৃশ্যমান বিশ্ব অদৃশ্য মহাসত্তার ছায়া বা প্রতিবিম্ব স্বরূপ, তাহার প্রতি পরমাণু ভেদ করিয়া অভ্যন্তরস্থ অনন্ত পরমাশক্তির জ্বলন্ত জ্যোতি এবং শুভ অভিপ্রায় প্রতি ক্ষণে উদ্ভাসিত হইতেছে, আত্মারামের এই গভীর বিশ্বাস ছিল। কোন কোন জ্ঞানী যেমন একটা অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট অকর্ম্মক কবিত্বময় উচ্চতর কল্পিত আদর্শের প্রতি চাহিয়া মানবের দৈনিক জীবনের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকলাপ সমুদায়কে কেবল নিন্দাই করেন, অথচ সেই আদর্শ কোন কালে তাঁহারা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না; ইনি সে শ্রেণীর জ্ঞানীও ছিলেন না। তবে অনেকানেক বিষয়ে তাঁহার যে অসন্তোষ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার কারণ অতি গভীর। অর্থাৎ যে ভিতরের পূর্ণতা দেখে সে বাহিরের

অসম্পূর্ণ কাজে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তথাপি ইনি অসম্পূর্ণ বাহ্যক্রিয়া নিদর্শ উপলক্ষে তৎ প্রকাশক অব্যক্ত মূল কারণের মহা মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেন। অধ্যয়নের শেষ বৃত্তান্ত তিনি এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"আমার জীবনের স্বাভাবিক গতির প্রতিকূলে যে সকল ঘটনা উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে স্কুলের প্রথম শিক্ষা একটী প্রধান। যদিও এখানে আমি ঐতিহাসিক মানবচরিত্র এবং বস্তু বিজ্ঞানের তত্ত্ব অনেক শিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে আমার চিন্তাস্রোত, এবং তত্ত্বজ্ঞানস্পৃহাকে কিছু বাধা দিয়াছিল কিছু দিন পরে পিতার বিশেষ অনুরোধে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলাম এই কারণে কিয়ৎ কালের জন্য তোমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া আমাকে দূরে যাইতে হইয়াছিল। তোমরা সকলে যখন চাকরী কর, আমি তখন কলেজে পড়ি, বোধ হয় তোমাদের স্মরণ আছে। এই হইতেই আমার বিদেশ গমন এবং ভ্রমণ আরম্ভ।"

"উচ্চ শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যাপার অতিশয় উচ্চ। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তাহাতে মোটা মোটা থাম, চস্‌মানাকে বড় বড় বিদ্বান্ স্বদেশী বিদেশী অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, বড় বড় গোঁফদাড়িওয়ালা যোয়ান ছেলে। সকলই বড় বড়। এখানে আসিয়া প্রথমে কিছু সভ্য ভব্য হইতে হয়। নবাগত ছাত্রকে চিম্‌টি কাটার প্রথা এখানে প্রচলিত নাই, কিন্তু অন্যান্য সাংঘাতিক উপসর্গ অনেক আছে। যাহা হউক, শিক্ষার ব্যবস্থা বড় চমৎকার! বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, অল্প কিঞ্চিৎ নীতি শাস্ত্র যথারীতি অধীত হয়। এই শিক্ষা দ্বারা চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে আদমতনয়দিগকে এক প্রকার বেশ বুদ্ধিমান চতুর কার্য্যক্ষম করিয়া তুলে। প্রথমে কিছু দিন আমার এ সব বেশ ভাল লাগিত। দিব্য বাড়ী ঘর, উচ্চ উপাধিধারী জ্ঞানী শিক্ষক অধ্যাপক উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য গ্রন্থ এবং তাহার বিশদ ব্যাখ্যা। ইহার ভিতর মনুষ্যের ক্ষমতা শক্তি বুদ্ধি বিদ্যা ব্যুৎপত্তি নিয়ম শৃঙ্খলা দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। বাস্তবিক এই সকলের মধ্যে ভূত কালের মনুষ্যবংশের ভূরি পরিশ্রম, অটল অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কত কাল হইতেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সাহিত্য ব্যাকরণ ইতিহাস বিজ্ঞানের তত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন! তাঁহাদের সহস্র সহস্র বৎসরের পরিশ্রমজাত ফল আমরা পঞ্চ বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে পৌছিয়াই সম্ভোগ করিতে পাই। এ সমস্ত আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি, অল্প আয়াসে অধিকৃত হইয়াছে।"

"কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সুন্দর শিক্ষাপ্রণালী শীঘ্রই আমার নিকট প্রাণহীন বদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। ইহাতে না বুদ্ধিই সুরূপে বিকসিত হয়, না হৃদয়ের ভাবই খোলে, না চরিত্রই গড়ে; সব যেন প্রাচীরে ঘেরা। প্রাচীন সভ্য জাতির পুরাতন ইতিহাস পড়িতে পড়িতে মনে কত ভাবের তরঙ্গ উঠে, কিন্তু অধ্যাপকেরা ঘটনা মাত্রের ব্যাখ্যা করিয়া তাহার প্রস্রবণ মুখ বন্ধ করিয়া দেন এবং নরপতিদিগের রাজত্বের সন কাল বংশ নাম এই সকল স্মরণে রাখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। সুতরাং ভাবের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হওয়াতে বুদ্ধিও আর খেলে না, ক্রমে তাহা শাখাচ্যুত পল্লবের ন্যায় শুকাইয়া যায়। ইতিহাসের অনিত্য অসার ঘটনারাজী, এবং সাধারণ মানব চরিত্রের স্বার্থ পশুভাব এবং দৌর্ব্বল্যের ভিতর ন্যায় নীতি দয়া ধর্ম্ম এবং সত্যের জয় কেমন অবশ্যম্ভাবী, তন্মধ্যে বিধাতার মঙ্গল সঙ্কল্প কেমন সুস্পষ্ট, সে দিকে শিক্ষক ছাত্র উভয়েরই দৃষ্টি অন্ধ। অবশ্য পার্থিব জীবনের আপাততঃ প্রয়োজনীয়, দৈনিক জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষা ইহাতে যথেষ্ট হয়। কিন্তু মানুষত কেবল উদর আর মস্তিষ্ক নয়; তাহার আত্মা আছে, এবং সেই আত্মাতে বিবেক, হৃদয়, ধর্ম্মজ্ঞানবাসনা, নিগূঢ় তত্ত্বপিপাসা আছে; কেবল বিষয়বুদ্ধি লইয়া টানাটানি করিলে চলিবে কেন? তাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন চিত্তবৃত্তি কি কর্ষিত এবং চরিতার্থ হয়?"

"বিজ্ঞান শিক্ষাতেও আমার জ্ঞানস্পৃহা সম্যক্ চরিতার্থ হইত না; অধ্যাপক মহাশয়েরা আমার পিপাসু শুষ্ক কণ্ঠে যেন উষ্ণ জল ঢালিয়া দিতেন। কি শারীরবিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কি জ্যোতিষ; নীতিবিজ্ঞান কি গণিত; যাবতীয় বিজ্ঞান বিভাগের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় ঈশ্বরের নিগূঢ় নিয়ম, মঙ্গল অভিপ্রায় দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ পুলকিত এবং বিস্মিত হইত; কিন্তু শিক্ষকেরা সে দিক আড়াল করিয়া আমার সাম্নে দাঁড়াইতেন; তত্ত্বের তত্ত্ব, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, ইতিহাসের ইতিহাস, সূত্রের সূত্র চিন্তা করিতে দিতেন না। বিজ্ঞান আমার বড় প্রিয় সামগ্রী; বিশ্বনিয়ন্তার স্পষ্ট ইঙ্গিত, অভ্রান্ত নিয়ম তন্মধ্যে অবলোকন করিয়া আমার প্রাণ যেন মাতিয়া উঠিত। অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র সেই একেরই শাসনবিধি নিয়মশৃঙ্খলা, কল্যাণ সঙ্কল্প; একের সহিত অন্যের সুসামঞ্জস্য এবং প্রতি জীবনের সহিত তাহাদের উপযোগিতা কি মনোহর! ইহার ভিতর দিয়া তিনি

স্বয়ং আমার অন্তঃচক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেন। ভাবিতাম, হায়! এমন সুন্দর, মধুর গভীর তত্ত্ব যাহারা আবিষ্কার করিল এবং যাহারা তাহা শিখিয়া শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হইল, কেন তাহারা সকলেই পরমজ্ঞান ভগবত্তত্ত্ব-রসে মজিল না! তবে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকার গতিবিধি আকৃতি প্রকৃতির আবিষ্কর্ত্তারা কি চন্দ্র সূর্য্যবৎ অচেতন পদার্থ? রাসায়নিক, প্রাকৃতিক, জীবন এবং মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা কি তাঁহাদের আবিষ্কৃত বস্তুর ন্যায় ভৌতিক? না দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণাদি যন্ত্রের ন্যায় যন্ত্র বিশেষ? অনেক সময় আমার ঠিক তাই মনে হয়। জড়, উদ্ভিদ্, প্রাণীজগতের কার্য্যপ্রণালী, নিয়মশৃঙ্খলা যেমন রমণীয় হৃদয়ানন্দকর; ভগবদ্ভক্তিবিহীন মহামহা বুদ্ধিমান বিচারনিপুণ বিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ তেমনি এক একটী অতীব সুন্দর জ্ঞানযন্ত্র। আশ্চর্য্য এবং দুঃখের বিষয় যে সক্রেটিস্ প্লেটো নিউটন্ মিল্টন্ সেক্সপিয়ার্ ওয়াডস্‌ওয়ার্থ মার্টিনো পড়িয়া কেন ইঁহাদের আত্মা জাগ্রত হইল না! কি তবে ইঁহারা বুঝিলেন, এবং কিবা বুঝাইলেন? এই বিজ্ঞান শিক্ষাও কেবল সংসারেরই উপযোগী দেখিলাম। পাছে এ বিষয়ে অধিক ভাবুক চিন্তাশীল হইলে লোকের ঘরকন্নায় মন না বসে, তাই বোধ হয় আধুনিক বিজ্ঞানবিদেরা নিয়ন্তা ছাড়িয়া নিয়ম, পদার্থ ছাড়িয়া ছায়া, আত্মা ছাড়িয়া কায়া, সত্য ছাড়িয়া মায়া, ব্যক্তি ছাড়িয়া শক্তি, কারণ ছাড়িয়া কার্য্যের পশ্চাতে ধাবিত হন এবং ছাত্রদিগকে সেই পথে লইয়া যান। তাঁহাদের অবস্থা ভাবিলে আমার কাঁদিতে ইচ্ছা করে। আহা এমন সুন্দর সুন্দর বলিষ্ঠকায়, প্রখরবুদ্ধি শিক্ষক এবং ছাত্র-বৃন্দের যদি আত্মা থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গধাম হইয়া উঠিত। বিষয়-বুদ্ধি বন্য বৃক্ষের ন্যায় বাড়িল, কিন্তু তাহার বিষময় উত্তাপে অমরোদ্যানের অমৃত তরু শুকাইয়া গেল! যে সকল ছাত্রের সাহিত্য বিজ্ঞানে একটু প্রতিভা শক্তি আছে তাহারা কথঞ্চিৎ দেবী সরস্বতীর গৌরব রক্ষা করে, অবশিষ্ট অধিকাংশ যন্ত্রবৎ সংসারচক্রে পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া বুদ্ধি অবশ্য বাড়ে, কিন্তু সে বুদ্ধি উদরী রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় অত্যন্ত স্থূল; তাহাতে নীতির স্বাস্থ্য, হৃদয়ের লাবণ্য, সূক্ষ্ম দর্শন, এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানশক্তি নাই, কেবল দেখিতে খুব হৃষ্ট পুষ্ট, এবং জনমনোরঞ্জন।"

"এই মোটা বুদ্ধি বংশপরম্পরা মোটা বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া আসিতেছে, ভুল ধরিবার কেহ নাই। এণ্ট্রেন্স স্কুলগুলি যেমন কেরাণীর কল, কলেজগুলি তেমনি শিক্ষক অধ্যাপক উকীল হাকিম ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের কল।

কল যত দূর ভাল হইতে পারে, এ সকল কল তাহা হয়, এবং অনেক কার্য্যও করে; পৃথিবীতে ইহার যেমন প্রয়োজন আমদানিও তেমনি; বরং অভাব অপেক্ষা আমদানি বেশী; সবই অতি উৎকৃষ্ট, কেবল আত্মা নাই এই যা দুঃখ। কিন্তু কলের রাজ্যে আত্মা জন্মিবেই বা কিরূপে? আত্মা দ্বারা আত্মা উৎপন্ন হয়, কলের দ্বারা কল উৎপন্ন হয়, এই চিরপ্রসিদ্ধ অখণ্ড নিয়ম। পূর্ব্বকালে শুনিয়াছি, ঋষিদের তপোবনে না কি অনেক আত্মা উৎপন্ন হইত। এখন কেরাণীকল হইতে ছোট বড় বহু সংখ্যক কেরাণী বংশের পর বংশ আবির্ভূত হইয়া কেরাণীলীলার অভিনয় করিয়া যাইতেছে। উকীল ডাক্তার শিক্ষক অধ্যাপক হাকিম ইঞ্জিনিয়ার কলগুলিও তেমনি বংশের পর বংশ স্ব স্ব জাতীয় কল উৎপাদনে নিযুক্ত আছে। মাঝে মাঝে বহু অশ্ববলশালী বড় বড় কলও দেখা যায়, কিন্তু বেশী নয়; দুই একটী। উকীল এবং ডাক্তার-কলে কালক্রমে জমিদার, রাজা, বণিক, সওদাগরের উৎপত্তি, এবং তাঁহারা কলের মত হইয়া ভবিষ্যতে এইরূপ কল উৎপাদন করিয়া থাকেন। এক বার এই সকল কল কারখানা যদি রীতিপূর্ব্বক স্থাপিত হইল, তাহা হইলে সে বিষয়ের জন্য আর কোন ভাবনা নাই; মাঝে মাঝে তৈল চর্ব্বি, জল আগুন কয়লা যোগাইতে পারিলেই উহা অবাধে পুরুষানুক্রমে চলিয়া যাইবে।"

"এই সব ভাবিতে ভাবিতে মানবের পার্থিব জীবনের চরম সীমায় যে দিন আমি উপনীত হইলাম, সে দিন মনে হইল, এই জন্য কি এত চেষ্টা সংগ্রাম? হরি বোল হরি! কেবলই উদর, আর মস্তিষ্ক, আত্মা কৈ? তবে না জ্ঞানীরা বলেন, মানুষের ভিতর অনন্ত মহাশক্তি সর্ব্বদা ছট্‌ফট্ করিতেছে, সেই জন্য অল্পে তাহার অভাব মেটে না, দুঃখ ঘুচে না? অনন্তর এই প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি এরূপ কলের মত হইয়া কল উৎপাদন করিব না। আত্মা হইয়া যাহাতে আধ্যাত্মিক বংশ বৃদ্ধি করিতে পারি তাহাই করিব। যন্ত্র হইব না, যন্ত্রী হইতে চাই। এত জ্ঞান সভ্যতার আড়ম্বরের চরম ফল যদি দৈহিক আহার বিহারে পর্য্যবসিত হয়, তবে আর বাঁচিয়া সুখ নাই। বাস্তবিক, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনের উচ্চ শিখরে উত্থিত হইয়া সাংসারিক জীবনের তুঙ্গ শৃঙ্গ সহসা দর্শন করিয়া আমি বসিয়া পড়িলাম। এ দিকের আশা ভরসা সব যেন ফুরাইয়া গেল। তদনন্তর উহার অতীত স্থানে স্বর্গ-মুখী কোন মহোচ্চ শিখর আছে কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। চারি দিকে বিষয় বাণিজ্যের মহাভিড়, মাথার উপর সাংসারিক দায়িত্বের প্রকাণ্ড

পর্ব্বত, তাহার ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়া, মুক্তপথে গমন করা যে কত দ
কষ্টকর তাহা আর কি বলিব।”

কলেজে কেবল জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, ধর্ম্ম নীতি, ভদ্র ব্যবহা
সদাচার শিক্ষার এ স্থান নয়। তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে সাম্প্রদায়ি
ধর্ম্মমতের বিবাদ বিতর্ক উপস্থিত হয়, এবং তাহা হইতে অশান্তির অ
জ্বলিয়া উঠে; এই জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তৎসম্বন্ধে নিরপেক্ষ। ছাত্রেরা আপনাপ
পরিবারমধ্যে যাহার যেরূপ ধর্ম্ম এবং নীতি তাহা শিক্ষা করিবে। অতি উত্ত
কথা। কিন্তু শিখাবে কে? ধর্ম্মনিরপেক্ষ শিক্ষারগুণে যাঁহারা ধর্ম্মহীন স্বেচ্ছা
চারী হইয়াছেন তাঁহারাইত পরিবারের অভিভাবক পিতা ভ্রাতা গুরুজন
সুতরাং বিদ্যালয়ের ধর্ম্মনিরপেক্ষ শিক্ষা পরিবার গৃহাশ্রমকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ
করিয়া তুলিয়াছে। মন্ত্রীসভা, বিষয়ক্ষেত্র, সমস্তই ধর্ম্মনিরপেক্ষ; কোন ধর্
কেহ হস্তক্ষেপ করিবে না। কিন্তু সর্ব্বত্র সকলেই যদি এই প্রতিজ্ঞা করি
লেন, যে আমরা কেহ কাহারো ধর্ম্মে হাত দিব না, তাহা হইলে ধর্ম্ম স্বয়
কি সকলের উপর আপনা হইতে হস্তক্ষেপ করিতে আসিবেন? নিশ্চয়
আসিবেন! যোদ্ধার শাণিত অসি যদি কাহাকেও বিনাশ করিতে না পায়
কালে সে আপনি আপনাকে বিনাশ করে। ধর্ম্মনীতি ব্যবহারে না আসিলে
উহা মানবস্বভাবকে জর্জ্জরিত করিয়া মহাবিপ্লব আনয়ন করিবে। এ
ধর্ম্মনীতি কি কোন সাম্প্রদায়িক বিষয়? সার্ব্বভৌমিক মানব স্বভাব কি
তাহার উৎপত্তির স্থান নহে? যাক্, আমাদের আর বেশী কথার দরকা
নাই। আত্মারাম যাহা বলেন তাই এখন শুনিয়া যাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

মনুষ্যসন্তানের যদি পেটের জ্বালা না থাকিত, সে সহজেই চিন্তাশী
ঋষি মুনি হইতে পারিত। সর্ব্বগ্রাসী অন্নচিন্তা তাহাকে কেশে ধরিয়
সংসারের পদতলে নিক্ষেপ করে। সকলেই প্রায় অবস্থার দাস, দু
এক জনের স্বাধীন অস্তিত্বের পুরুষকার দেখা যায়। মনুষ্য এই জ
দুঃখ অভাবেও আত্মবিস্মৃত, সুখ সৌভাগ্যেও তাই। দুঃখে নিরাশ, সুখে
উন্মত্ত আসক্ত। সংসারের প্রকাণ্ড কল দিবা রাত্রি অবিশ্রান্ত বেগে ঘুরি
তেছে, তুমি আমি কি তাহার মধ্যে পড়িয়া পুনরায় আবার বাহির হইতে

পারি? ভয়ানক পুরুষকার বলের প্রয়োজন। আত্মারামের সে বল এখন অধিক হয় নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক গতি সেই দিকে বরাবর ছিল। এই কারণে তিনি মাঝে মাঝে ঐ কলের ভিতর পড়িয়াছেন এবং ক্ষত বিক্ষত অঙ্গে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। কাল্পনিক জীবের ন্যায় তিনি রাতারাতি একবারে সিদ্ধ পুরুষ হইতে পারেন নাই। সীমাবিশিষ্ট মানবীয় শক্তির উপর অসীম অনন্ত দৈবশক্তির পরাক্রম কেমন দুর্জ্জয় তাহারই তিনি এক দৃষ্টান্ত।

আমাদের বন্ধু আধুনিক বিদ্যা উপাধি বিষয়ে বলিয়াছেন, "আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দের বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তার যেরূপ পরিচয় পাইলাম, তাহাতে সুখী হইতে পারিলাম না; কারণ, আমি জানি, মনুষ্য-সন্তান ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ তত্ত্বের অধিকারী। বাস্তবিকই তাহার ভিতর অনন্ত উন্নতির বীজ লুক্কায়িত আছে। বর্ত্তমান কৃতবিদ্যদিগের বিদ্যা যথেষ্ট, কিন্তু বুদ্ধি বড় কম; চিন্তাশীলতা আরো কম; আধ্যাত্মিকতা একবারে নাই বলিলেই হয়। যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ বুদ্ধি কিম্বা চিন্তাশীলতা আছে তাঁহারা জড়জগৎ এবং মনোজগতের কোন কোন তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া তাহাতেই মোহিত হন এবং তদ্বিষয়ে উপাধি ধারণ উন্নতির পরাকাষ্ঠা মনে করেন; কিন্তু চিন্তামণি পরমতত্ত্বের মহালীলার আস্বাদ পান না, এবং জ্ঞানের আদি প্রস্রবণ এবং অনন্ত বিকাশও দেখিতে পান না। ইহা-দের বিদ্যোপার্জ্জনের চরম ফল কতকগুলি রৌপ্য মুদ্রা সংগ্রহ, আর খ্যাতি লাভ। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমি আর পরীক্ষাও দিলাম না, উপাধিও লইলাম না; নিরুপাধি হইয়া তৎসংক্রান্ত উচ্চ পাঠ্য যাহা কিছু তাহা পড়িয়াছিলাম। পড়িয়া দেখিলাম, তাহাতে অভিমান করিবার বিষয় অতি অল্প। যখন আমি বর্ত্তমান মনুষ্যবংশের ভিতরে পৃথিবীর প্রাচীন পুরাবৃত্ত পাঠ করি, আপনার গভীর অভ্যন্তরে নামিয়া আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই এবং প্রকৃতির পটে বিশ্বের ঘটনা সকল দেখি, তখন ঐ সমস্ত উচ্চ পাঠ্য যেন বর্ণ পরিচয়ের মত মনে হয়। ইতিহাসের কতকগুলি ঘটনা, জন কয়েক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের কতিপয় মতামত প্রবচন, এবং বিজ্ঞানের গুটিকতক সূত্র এবং শব্দ সংজ্ঞা মুখস্থ করিয়া, তৎসঙ্গে ইংরাজি সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদ পাইয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন ভিন্ন আধুনিক কৃতবিদ্যদিগের অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা গেল না। পৃথিবীর প্রাচীন তত্ত্ব-

শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক সেই তত্ত্বকে আরো বিকসিত উন্নত করিব, এবং তাহা জীবনের দৈনিক ব্যবহার কার্য্যে পরিণত করিব, এরূপ উচ্চাভিলাষ কাহারো মনে স্থান পায় না। যে শিক্ষায় পূর্ব্বপুরুষদিগের উপার্জ্জিত জ্ঞানধন যথাযথরূপে ব্যবহৃত এবং বর্দ্ধিত হইল না, বরং তাহার সাহায্যে পরবংশীয়দিগের আলস্য স্বেচ্ছাচারিতা, অজ্ঞানতার অভিমান প্রশ্রয় পাইল, তাহা কি সুশিক্ষা? আমার কথায় কেহ যদি রাগ না করিয়া ভাল ভাবে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি বলি, আধুনিক কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই প্রায় মূর্খ। যাহারা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বুঝিল না, তাহারা মূর্খ নয় ত কি? যে আপনাকে চেনে না, অথচ আপনাকে জ্ঞানী পণ্ডিত মনে করে, তাহার অপেক্ষা মূর্খ কে আছে আমি জানি না। যে গ্রন্থ পড়িয়া ছাত্র বিদ্বান্ নাম ধারণ করিল, সেই গ্রন্থের রচয়িতাকে সে যদি না মানে তাহাকে মহামূর্খ ভিন্ন আর আমি কি উপাধি দিব? তাঁহারা দলে পুরু, আমি একা, তাই বলিয়া কি ভয় করিব?"

এ সকল সভ্যতাবিরোধী অপ্রিয় সত্য কথা মুখ দিয়া বাহির করা উচিত কি না আমরা জানি না। তবে আত্মারাম না কি যথার্থ সত্যপরায়ণ এবং জনসুহৃদ্, এই জন্য তাঁহাকে আমরা কোন দোষ দিতে পারি না। কিন্তু তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি এরূপ স্পষ্ট কটু কথা বলিতে পারে না; পারিলেও তাহাতে আমাদের শ্রদ্ধা হয় না। ইহার কথা শুনিতে আপাততঃ যদিও কঠোর শ্রুতিকটু বটে, কিন্তু পাঠক মহাশয়েরা যদি আত্মদৃষ্টির আলোকে ইহা পাঠ করেন, তাহা হইলে অনেক সার শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন। তিনি হৃদয়হীন, আত্মগৌরবে স্ফীত পরের মত নির্দ্দয় ভাবে কোন কথা বলেন না, এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আত্মারাম সার্ব্বভৌমিক, তিনি সমগ্র মানব সমাজের প্রতিনিধি, প্রতি জনের ব্যক্তিত্ব তাঁহার সহিত একীভূত। সুতরাং আমরা প্রতি জনে নিজেকে নিজে যেমন কোন দোষের জন্য ভৎর্সনা নিন্দা করিতে পারি, তাঁহার বিচার সমালোচনা ঠিক তেমনি জানিতে হইবে। তিনি সকলেরই আপনার।

অতঃপর বিষয়কার্য্য, বাণিজ্য ব্যবসায় এবং জীবিকানির্ব্বাহ সম্বন্ধে যে সকল সার চিন্তা, নিরপেক্ষ উদার অভিপ্রায় তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু আভাস নিয়ে প্রকাশ করা যাইতেছে।

"পৃথিবীর কার্য্যক্ষেত্রে, ব্যবসায় এবং ক্রয় বিক্রয়ের স্থানের মহা ব্যস্ততা

এবং উদ্যমশীলতার মধ্যে কতিপয় মানসিক বৃত্তির বিশেষ ক্রিয়া দৃষ্ট হইল। ইহা কার্য্যশিক্ষার বিদ্যালয় বিশেষ। পুরুষানুক্রমে মানুষ্যবংশ এখানে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য নিজ নিজ পৈতৃক ব্যবসায়, অথবা ক্ষমতা উপ-যোগী নূতন বিধ কাজ শিক্ষা করে। মুদি দোকানদার মাড়োয়ারির ছোট ছেলেটা নিরক্ষর হইয়াও কাজে কর্ম্মে নিজ ব্যবসায়ে অতিশয় সুপটু। অর্থোপার্জ্জন কিম্বা স্থূলোদর যদি বিদ্যা সভ্যতার নিদর্শন হয়, মাড়োয়ারি কেঁয়ে বণিকদিগের বিদ্যা খুব অগাধ। বিষয়ক্ষেত্রে বিষয়ী জীবেরা বিষয়চক্রে পড়িয়া বংশের পর বংশ নিজ নিজ আদর্শানুযায়ী জীবন গঠন করিয়া লইতেছে।"

"এই ব্যবসায়ী বণিক এবং সাধারণ বিক্রেতাগণকে আমি জনসমাজের সেবক মনে করি। মাচের ঝাঁকা মাথায় লইয়া ধীবরপত্নী প্রত্যহ প্রাতে কি মহা বেগেই ছুটিয়া যায়! প্রতি দিন নবোৎসাহে, নবানুরাগে কেহ বিবিধ মিষ্টান্ন পকান্ন, কেহ উপাদেয় ফল শস্য, কেহ অন্ন ব্যঞ্জন, কেহবা বস্ত্রালঙ্কার যোগাইতেছে। কত লোক স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে দুর্গম স্থানে লোকের দ্বারে দ্বারে ঐ সকল বস্তু বণ্টন করিয়া দিতেছে। নানা কষ্ট সহিয়া বিনা আহ্বানে তাহারা লোকের সেবা করে। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী সাধু ফকীরদের অপেক্ষা ইহাঁদের ত্যাগস্বীকার অনেক বেশী। এক জন চাস করে, অন্যে তাহার ফলভোগী হয়। যে রাঁধে সে খাইতে পায় না। ময়রা অন্যের জন্য উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া আপনি খায় পোড়া মুড়ি। রাজমিস্ত্রী সুতার কামার কুলি মজুরগণ অতি সুরম্য অট্টা-লিকা অন্যের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া আপনারা থাকে পর্ণকুটীরে খোলার ঘরে। তন্তুবায় শিল্পী মণিকার আপনারা ছিন্ন মলিন বেশে থাকিয়া অন্যকে ভাল ভাল কাপড় গহনা পরায়। কৃষক রাশি রাশি ফল শস্য উৎপাদন করে, বণিক ব্যবসায়ী গ্রামে নগরে পথে প্রতি গৃহে তাহা বহিয়া লইয়া যায়, কিন্তু এক মুষ্টি শাকান্ন কেবল ইহাদের পুরস্কার। কোচমান সহিস বেহারা দাঁড়ি মাঝি রৌদ্র বৃষ্টিতে কষ্ট পাইয়া ক্ষুধা নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে সুখশয্যায় শোয়াইয়া রাখে। ঝি চাকর দরোয়ান পরের সেবায় জীবন ঢালিয়া দিয়াছে। যাত্রা নাট্যকার রাত্রি জাগে পরের আমোদের জন্য। মেথর মেথরাণী উদরান্নে বঞ্চিত হইয়া অপরের বিষ্ঠাভার বহিয়া বেড়াইতেছে। মুচি খালি পায়ে, ধোপা কাল কাপড়ে থাকিয়া

অপরকে ভাল ভাল জুতা, ধোপ কাপড় যোগায়। পুরোহিত উপবাসী থাকিয়া যজমানের জন্য মন্ত্র পড়ে পূজা করে। রাজন্যবর্গের বিলাস ভোগ আরামের জন্য প্রজাকুল দিবা রাত্রি খাটিতেছে। আপনার জন্য এ সকল সেবকবৃন্দ ভাবিতেও সময় পায় না। আহার নিদ্রা সুখবাসনা বিসর্জ্জন দিয়া মানব পরিবারের সেবার জন্য নিরন্তর ইহারা ব্যস্ত। পশুদিগের ত্যাগস্বীকার আরও আশ্চর্য্য। তাহারা খাটিতে খাটিতে মরিয়া যায়, তথাপি মুখে একটু প্রতিবাদ নাই। যদিও ঘোড়াগুল কখন কখন দুষ্টামি করে, কিন্তু তজ্জন্য কঠিন কশাঘাত অশ্রাব্য নিন্দা বাক্য কতই তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয়। বৃষ এবং গাভীগণের মুখশ্রী কেমন নিরীহ প্রশান্ত, দৃষ্টি কেমন নির্দ্দোষ! গৃহপালিত ভারবাহী ঘোটক ঘোটকী প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুরা পারিবারিক এবং দাম্পত্য সুখে চির দিন বঞ্চিত। তাহাদের পরিশ্রমের পুরস্কার কেবল আহার; বৃদ্ধ হইলে তাহাও পায় না। ইহারা মানুষের জন্য গৃহত্যাগী, পরাধীন, ক্রীতদাস; কেহ চিরকুমার, কেহ বিধবা, কেহ নপুংসক, প্রায় সকলেই পরিব্রাজক, পতিপুত্রহীনা সন্ন্যাসিনী। পশু মনুষ্য দেবতা, জড় উদ্ভিদ্ প্রাণী, এক অপরের সহিত বিশ্বপ্রেমে অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্বদ্ধ। স্বাধীন নরজাতি যদিও স্বার্থের বশীভূত হইয়া ক্ষুধা শান্তির জন্য এই সকল কাজ করিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহারা বিধাতার মঙ্গল অভিপ্রায় সাধন করিতেছে।"

"স্বার্থ, ক্ষুধা, বংশরক্ষা এই তিনটী শক্তির ক্রিয়া জনসমাজের মূলে বড় প্রবল। আত্মপোষণী শক্তির কি বিপুল প্রভাব! কার্য্যানুরাগ, বৈষয়িক বুদ্ধি কৌশল সেই শক্তির ফল। মনুষ্য কত বিধ ব্যবসায়ের ফন্দী বাহির করে! পৃথিবী শুদ্ধ লোক গৃহে কার্য্যক্ষেত্রে পথে ঘাটে মাঠে যাহা কিছু ভাবে, কথা কয়, সমস্তই সংসার সম্বন্ধে। ইহাতে এত আসক্তি অনুরাগ মোহ কেমন করিয়া হইল? অবশ্য ইহার মধ্যে বিধাতার কোন গভীর অভিপ্রায় আছে। যে কাজে সমস্ত দেশের সমস্ত লোকের অটল উৎসাহ, দুর্জ্জয় পিপাসা, তাহাকে মায়াবাদীরা ভ্রম বা স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান দিন, কিন্তু আমি ইহাকে সামান্য বলিতে প্রস্তুত নই। সমস্ত বাহ্য জগৎ যে জন্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহা কি স্বপ্নবৎ ভ্রান্তি?"

"ন্যায়বান বিশ্বনিয়ন্তার অখণ্ড নৈতিক শাসনবিধি সংসার কার্য্যক্ষেত্রের মূল ভিত্তি। সেই প্রচ্ছন্ন মূল ভিত্তি যদি অটল অচল সুদৃঢ় না হইত, এত দিনের

দৌরাত্ম্য অত্যাচারে উপরকার গাঁথুনি সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুর মার হইয়া যাইত। রাজশাসন, সামাজিক শাসন, রোগ মৃত্যু বিপদ ভয় দারিদ্র্য ঐ দুর্জ্ঞেয় মূল নীতির রূপান্তরিত প্রতিনিধি হইয়া ন্যায় সত্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দিকে সকলকে টানিয়া রাখিয়াছে। এবং পর্ব্বত সমান স্বার্থ স্বেচ্ছাচার বিদ্রোহিতা দুরাচারে পেষিত হইয়া পুলিস, পল্টন, রাজা, বিচারপতির মূর্ত্তি ধরিয়া উহা স্থানে স্থানে বসিয়া আছে। ব্যবস্থাপক, সচীব, উকিল মোক্তারগণ এই সাকার জীবন্ত দেবমূর্ত্তির পুরোহিত ; পিনালকোড, সিভিল কোড এখানকার শাস্ত্র তন্ত্র, যজমানগণ স্বয়ং বলি উপহার। উপরের বিষম চাপে অমিশ্র নীতি মাথা তুলিতে পারে না, তাই শাসনকর্ত্তাদিগের ভিতরে স্থূল ভাবে, সমাজপতিদিগের ভিতর লোকলজ্জার আকারে,বিবেকের ভিতরে সূক্ষ্মভাবে তাহার কার্য্য সম্পন্ন হয়। দৃশ্যতঃ দৈহিক শক্তি, বুদ্ধি কৌশল, লোভ এবং স্বার্থবল দ্বারা এই বিশাল সংসারচক্র ঘুরিতেছে, কিন্তু ইহার গূঢ় অভ্যন্তরে অদৃশ্য সার সত্যের অপরিবর্ত্তনীয় অটল ভিত্তি অবস্থিতি করিতেছে। তাহার অব্যবহিত অন্তরালে অনন্তের নীরব গম্ভীর মহাসত্তার জ্বলন্ত বাড়বানল। যখন যে দেশে, যে জাতির মধ্যে বৈষয়িক প্রবঞ্চনা, শাসনবিকৃতি, সামাজিক দুর্নীতি, ধর্ম্মহান শেষ সীমায় উপনীত হয়, তখন ঐ জীবন্ত প্রচ্ছন্ন নীরব মহাগ্নি স্তূপাকার বিষয়জঞ্জাল, বিপুল স্বার্থ প্রলোভন আসক্তিকে একবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। তদনন্তর সেই ভস্মাচ্ছন্ন ভীষণ শ্মশানে নূতন সমাজদেহ জন্ম গ্রহণ করে। অপূর্ণ দুর্ব্বল মানবের অপূর্ণ এবং দোষবিমিশ্র সমাজসমষ্টি অপরিবর্ত্তনীয় অনন্ত সত্যের মাতৃকোলে শিশু সন্তানবৎ প্রতিপালিত হইতেছে। সে জননীর বক্ষে বসিয়া কতই অত্যাচার করে! তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে প্রহার প্রাপ্ত হয়; তখন অপেক্ষাকৃত শান্ত শিষ্ট বাধ্য পুত্রের ন্যায় সুপথে চলে।”

“কর্ম্মক্ষেত্রের মায়াশক্তির প্রবল তরঙ্গের প্রতিকূলে আমি অধিক দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি নাই, সে কথা পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। কেই বা পারে? দেখিলাম, অনেকের জীবনতরী, এমন কি বড় বড় ধার্ম্মিকের ধর্ম্মজাহাজ পর্য্যন্ত এই খানে ডুবিয়া যাইতেছে। অল্প দুই এক জন অনেক লাঞ্ছনা বিড়ম্বনার পর পরপারে গিয়া উঠে। অসার ক্ষণভঙ্গুর জড় পদার্থের প্রভূত আকর্ষণ, কর্ম্মফলের অপরিহার্য্য গতি, বিষয় প্রলোভন এবং মোহাসক্তির প্রবল প্রতাপ দর্শন করিয়া এ দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা তাই বলিয়া-

ছেন, এক জন্মে জীবন্মুক্তি লাভ হয় না, ইহার জন্য জন্ম-জন্মান্তর আবশ্যক। এমনি আসক্তি, যে স্বর্গ পর্য্যন্ত তাহা অধিকার করিয়াছে। বাসনা লোভ ক্ষোভ যত দিন থাকিবে তাহার নিবৃত্তিজন্য তত দিন পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। কর্ম্মফলের কি দুরতিক্রমণীয় প্রভাব!"

"আমার মনে হয়, ছাত্র জীবন ঠিক যেন কাঁচা মাটি, সংসাররূপ কুলালচক্র তাহাকে নানারূপে নিজ উপযোগী করিয়া গঠন করে। ইহার ভিতরেও বিধাতার অনেক লীলা খেলা এবং আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। কামিনী কাঞ্চন দুইটী প্রধান কারীগর উন্নতিশীল যুবাদিগকে দুই দিক হইতে সবলে চপেটাঘাত করিতেছে, ঘসিতেছে, মাজিতেছে; শেষ অল্প দিনের মধ্যে তাহাদের প্রহারে তাঁহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। প্রত্যেকের ললাটে সংসার কারীগরের নাম অঙ্কিত! এই কি অদৃষ্টচক্রের শেষ ফল? না এ ব্যূহ ভেদ করিয়া উর্দ্ধদিকে আরও গতি আছে?"

"বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় যে সকল সমপাঠীকে সত্যপরায়ণ, দয়ালু, ন্যায়বান্ সরলহৃদয় বলিয়া জানিতাম, দেখি যে তাহারা এখানে আসিয়া ফলবাদী স্বার্থপর কুটিল হৃদয় ক্ষীণমতি হইয়া গিয়াছে। তখন আহা কি সুন্দর মূর্ত্তিই ছিল! ঠিক যেন নির্দ্দোষ মেষশাবকগুলি। বালকের ন্যায় সরল মধুর বাক্য, অহঙ্কার অভিমান নাই, কাপট্য কি তা জানে না, যাকে তাকে ভাল বাসে, পরোপকার দীনসেবার জন্য যেন সর্ব্বদা ব্যস্ত। আহার পরিচ্ছদ নিতান্ত আড়ম্বরবিহীন সামান্য। মুখে বেশী কথা নাই। ভাব ভঙ্গী চাল চলন অতিশয় নম্র। ষোল আনা সত্য, ষোল আনা নীতির পক্ষপাতী। তাহার একটু ত্রুটি দেখিলে নৈতিক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া কামিনী কাঞ্চনের অনুরোধে ইহারা অল্প দিনের মধ্যে আর এক নবীন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে মূর্ত্তি আর বদলায় না। বরং দিন দিন পাকিয়া দাঁড়ায়। কোথায় বা এখন সে সব সদ্গ্রন্থ সদালাপ সদনুষ্ঠান! এক দিকে আলবোলা, আর এক দিকে হুঁকা, সাম্‌নে বাক্স, পশ্চাতে তাকিয়া।" চক্ষের জ্যোতিতে, কপাল এবং গণ্ডের শিরায় শিরায়, হাতের আঙ্গুলে আঙ্গুলে, পায়ের গাঁটে গাঁটে, মুখের এবং বুকের প্রতি লোমকূপে বিষয় চিন্তার ছবি যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কথার পেঁচাও ছন্দে, ভাষার দুর্ব্বোধ্য দ্ব্যর্থে, ব্যবহারের কৌটিল্যে সংসারাসক্তি যেন মূর্ত্তিমতী। কার সাধ্য যে তাহার ভিতরের ভাব বুঝে?"

"গৃহস্থ চাকুরে, স্বাধীন ব্যবসায়ী উকীল মহাশয়দের জীবনগতি অবলোকন করিয়া আমার হাসি পাইত, আবার কান্নাও আসিত। বড় বড় রাজা মহারাজা জমিদার সওদাগরদিগেরও বিড়ম্বনা এখানে ভয়ানক। চাকুরে বাবু যখন চোগা চাপকান ইজের পরিয়া সাঁম্‌লা মাথায় দিয়া সেজে গুজে পথে বাহির হন, তখন মনে হয় ইহাঁরাই স্বর্গের দেবতা। গরিব দুঃখী পথ ছাড়িয়া দূরে গিয়া তাঁদের মুখপানে চাহিয়া দেখে। পরিচ্ছদের কি অতুল মহিমা। পরে যখন আফিসে আসিয়া রাঙ্গা মুখের সম্মুখে তিনি দাঁড়াইলেন, তখন দেখি চোখে আর সে তেজ নাই। রাঙ্গা মুখের কুটিল কটাক্ষে, কটু বচনে বাবুর প্রাণের মধ্যে আগুন জ্বলিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখেন কোন গরিব কেরাণী চাপরাশি দপ্তরী আছে কি না। পরে ঘৃণা অবমাননা ক্রমে উদরস্থ করিয়া কপালের লজ্জার ঘাম মুছিয়া চুরুটের ধোঁয়ায় প্রাণ শীতল করিলেন এবং অধস্থ ভৃত্য বা প্রতিপাল্যদিগের উপর সে ঝাল টুকু মিটাইলেন। রাজা মহারাজাগণ বিলাসবশে এবং মানের দায়ে বিপুল ঋণভারগ্রস্ত এবং রোগে ভগ্ন বিষণ্ণ। আজ গাড়ী ঘুড়ি বালাখানা, কাল ইন্‌সালভেণ্ট, আত্মহত্যা। মুদি দোকানদার খাতা লইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া কাঁদে, বকে, শেষ গালাগালি দিতে দিতে ফিরিয়া যায়, কিন্তু কর্ত্তার দেখা পায় না; খাতাঞ্চি বলে আমি কিছু জানি না, দরোয়ান্ বলে নিকাল যাঁও!"

"ইহা অপেক্ষা শ্রমজীবি কুলি মজুরদের দেখিলাম মনে সুখ আছে। তুমি যদি তাহাকে মার, তোমারই হাতে ব্যথা হবে; গালাগালি দেও, তুমিই তজ্জন্য অনুতাপ করিবে; কিন্তু সে গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া নির্ব্বিকার চিত্তে ছাঁচিখিলি এবং তামাকু খাইতে খাইতে, সহচরগণের সঙ্গে গলা ধরাধরি করিয়া গীত গাইতে গাইতে হাস্যমুখে বাসায় ফিরিবে। তুমি বাবু লোক, প্রচুর জ্ঞানে তোমার সুখ নাই, একটু মানহানি হইলে রাত্রে তুমি ঘুমাইতে পারিবে না; কিন্তু কুলি গাড়োয়ান মুটে মজুর সুখে খায়, সুখে ঘুমায়। বড় বাবুদের মার্জ্জিত রুচি, ধন মান বিদ্যাই সকল অশান্তির কারণ।"

"সংসারের সাধারণ প্রচলিত প্রথাই যাঁহাদের নীতির চরমাদর্শ, ধন মানের হানিতে যদিও তাঁদের অন্তরাত্মা সময়ে ব্যথিত হয়, কিন্তু বিবেকী ধার্ম্মিক লোকাপেক্ষা তাঁহারা সুখী। অর্থাৎ যে আপনাকে আপনি প্রতারণা করিতে শিখিয়াছে, ধর্ম্মভয়, বিবেকের দংশনে তাহার কি করিবে? দৈনিক জীবনের সাধারণ ব্যবহার ব্যতীত অন্য উচ্চতম আদর্শ তাহার নাই; একটু উচ্চ

পবিত্র লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইবার জন্য তাহাকে সংগ্রাম করিতেও হয় না; সুতরাং সে পান ভোজন আমোদেই পরিতৃপ্ত। অথবা বাসনানলে সর্ব্বদা প্রদীপ্ত, আশার কুহকে আত্মহারা। কিন্তু যাঁহারা উচ্চ নীতির আদর্শানুসারে সত্যাসত্য ন্যায় অন্যায় বাছিয়া সাবধানে চলেন এবং প্রতিদিন পূজা আহ্নিক জপ তপ সাধুসঙ্গ নাম গান প্রার্থনা এবং সৎসঙ্কল্প করেন, কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের বড়ই বিড়ম্বনা। এখানে কার্য্যকোলাহলে অনেকের ধর্ম্মমত বিবেক বুদ্ধি পবিত্র সঙ্কল্প সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, কিছুই ঠিক থাকে না। এক শ্রেণীর ধার্ম্মিক লোক আছেন এবং তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক, তাঁহারা ধর্ম্মমত বিবেক বুদ্ধিকে ঠাকুরঘরে ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া আসেন। হাট বাজারে কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদিগকে সঙ্গে আনেন না। তাঁহাদের ধর্ম্ম এবং সংসার দুই স্বতন্ত্র, এক অন্যের উপর হস্তক্ষেপ করে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঠাকুর যিনি তিনি পবিত্র দেব-মন্দিরে থাকিবেন, বৈষয়িক কোলাহল হট্টগোলে তাঁহার আসিবার প্রয়োজন নাই। মানুষ সংসার করিবে, আর ঠাকুরের উপর ধর্ম্মের ভার। তবে কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার নাম, পূজার চিহ্ন, ধর্ম্মের মিষ্ট কথা বিশেষ উপকারী। ভগবানের নামের বাজার সম্ভ্রম আছে, তদ্দ্বারা অনেক কায সহজে হাসিল হয়; কিছু বেশী লাভও হয়। ইহাদিগকে ধর্ম্মের জন্য কখন কোন ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না। যদি কখন হয়, তাহা লাভে পোষাইয়া যায়। বাণিজ্য ব্যব-সায়ের সৌকার্য্যার্থে যত যত উপায় আছে, ধর্ম্মভাণ তাহার একটী প্রধান। এ সকল লোকের এখানে কোন বিশেষ কষ্ট নাই, সত্য রক্ষার জন্য কোন রূপ সংগ্রাম করিতে হয় না; পিনাল কোড্ সিভিল কোড পুলিস এবং আদা-লৎ বাঁচাইয়া চলিতে পারিলেই হইল। কিন্তু যাঁহারা প্রতিদিন কার্য্যেতে সত্য রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা অনুতাপ করেন, কাঁদেন, তাঁদের পিট্‌পিটিনি খুটিনাটি দেখিয়া অন্য সব লোকেরা হাসে, ঠাট্টা করে; একটু স্খলন এবং পতন দেখিলেই অমনি চারি দিকে ঢাক পেটায়। সংসারের কার্য্যরীতি বুক ফুলাইয়া গর্ব্বিত স্বরে বলিতেছে, "হয় আমার অধীন হইয়া চল, নতুবা বনে চলিয়া যাও! কাজের হানি করিও না।" এই আজ্ঞা শুনিতে শুনিতে ক্রমে অনেক সূক্ষ্ম বিবেকী সাধকও তৎপথানুবর্ত্তী হন। কার্য্যফলের লাভ ক্ষতি তাঁহারা তখন ধর্ম্মবুদ্ধির সঙ্গে মিশাইবার চেষ্টা করেন। তাহাতে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে ধর্ম্মমায়া ধর্ম্মবঞ্চনা আসিয়া তাঁহাদিগকে সন্তোষ

দানে করে। "কার্য্য উদ্ধার করিতেই হইবে" এই যখন হইল সর্ব্বোপরি শাস্ত্র বিধি, তখন অনীতি অসত্যমিশ্র কার্য্যক্ষেত্র বিনা উৎকোচে তাহা করিতে দিবে কেন? এ অবস্থায় গূঢ় আসক্তি, সূক্ষ্ম স্বার্থ অদৃশ্য ভাবে সাধুতার বাহ্য আবরণে লুকাইয়া কার্য্য করে। কাজেই তাহাতে সাধকের বিবেক ক্রমে মলিন, আত্মা বিকৃত, হৃদয় নীরস হয়। তখন তিনিও প্রকৃত সত্য-রাজ্য ছাড়িয়া জনপ্রশংসিত প্রচলিত ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন।"

"বিধাতা পুরুষ এই বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া কার কত দূর সত্যনিষ্ঠা ন্যায়পরতা নিস্বার্থ ভাব তাহার পরীক্ষা লইতেছেন। তিনি দীন প্রজার ভিতরে বসিয়া রাজা জমিদারের, আশ্রিত ভৃত্যের ভিতরে বসিয়া প্রভুর, সহচর মিত্রের মধ্যে থাকিয়া বন্ধুর, শিষ্যের ভিতরে বসিয়া গুরুদেবের পরীক্ষা লইতেছেন। তিনি দোকানদার ব্যবসাদার উকিল মোক্তার দালালের ভিতরে থাকিয়া ম্যানেজার দেওয়ান খাতাঞ্চী, স্বামী স্ত্রীর ভিতরে লুকাইয়া স্বামী স্ত্রীর, পুত্র কন্যার ভিতরে থাকিয়া পিতা মাতার সত্যপ্রিয়তা সাধুতার পরীক্ষা লইতেছেন। মানব জীবনের সত্যজ্ঞান এবং গূঢ় অভিপ্রায়ের সাক্ষী স্বয়ং সর্ব্বসাক্ষী। তিনি নররূপে জ্ঞানী মূর্খ বালক সকলের ভিতর বর্ত্তমান। স্বার্থপর আত্মপ্রবঞ্চক ধার্ম্মিক যাঁহাকে ঠাকুর ঘরে ভোগ নৈবিদ্য ফুল চন্দন স্তব আরাধনা দ্বারা ভোগা দিয়া ঘুম পাড়াইয়া আসিয়াছিল, তিনি অনন্ত চক্ষু খুলিয়া ভবের বাজারে অলি গলিতে ফিরিতেছেন, অন্তরের অন্ধকারময় নিভৃত স্থানেও জাগিয়া চুপ করিয়া একা বসিয়া আছেন। সুতরাং এ বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন। অথচ এই খানেই জীবনের যথার্থ শিক্ষা এবং পরীক্ষা। ভিতরে স্বার্থ, বাহিরে রাশি রাশি প্রলোভন; অন্তরে সাধু কামনা, বাহিরে প্রভূত বাধা বিঘ্ন; বিবেক বলে বৈরাগী হইতে, প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস ইচ্ছাকে টানিয়া লইয়া নরকে যায়। এই উভয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য নরনারীকে নিযুক্ত করিয়া, কে কেমন পালোয়ান বিশ্বকর্ত্তা তাহাই বসিয়া দেখিতেছেন। এবং বার বার, সহস্র বার পতিতদিগের গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া বলিতেছেন, "ভয় নাই! লড়াই কর! আমি শেষে জিতিয়ে দেব।"

"যাহা হউক, সভ্য এবং ভদ্রসমাজের গঠন যাহা দেখিলাম বেশ নয়ন-রঞ্জন। যদিও তাহার মধ্যে অসভ্যতার পশু ব্যবহার অনেক আছে, তথাপি বেশ নিয়ম শৃঙ্খলা। পরস্পরের আদান প্রদান সাহায্য সহানুভূতিতে

মোটের মাথায় ইহা উচ্চ আদর্শের কতকটা কাছাকাছি। ধর্ম্ম নীতির উচ্চ দৃষ্টান্ত না থাকিলেও তাহার অঙ্কুরাবস্থা বটে। কিন্তু কেবল দৈহিক বল, বিষয় বুদ্ধির কৌশল, এবং সামাজিক সভ্যনীতিশক্তির প্রাধান্যই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাইলাম।”

পঞ্চম অধ্যায়।

আত্মারাম কর্ম্মক্ষেত্রের সাধারণ পর্য্যবেক্ষণ, মনুষ্যের দৈনিক জীবনের ব্যবহার প্রণালীর স্থূল স্থূল বিষয় গুলি এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন। অন্যান্য বিভাগের কথা ক্রমে বিবৃত হইবে।

আমাদের প্রিয় বন্ধুর কথিত চিন্তাশীল বৃত্তান্তগুলির মধ্যে বিস্তৃত ইতিহাস, কিম্বা নানা দেশের ভ্রমণবিবরণ নাই; কিন্তু সর্ব্বত্র তাঁহার কুটিল কল্পনা জড়িত বৈজ্ঞানিক গবেষণারই বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়; মধ্যে মধ্যে কেবল অদ্ভুত ঘটনা দুই পাঁচটি দেখিতে পাই। প্রথম যৌবনে তদীয় ঐতিহাসিক দৃষ্টির আলোকে সংসারের জীবনক্ষেত্র বা কার্য্যক্ষেত্র কিরূপ আকারে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহার সাধারণ ছবি পূর্ব্বাধ্যায়ে আমরা ইতঃপূর্ব্বে চিত্রিত করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে উহা তাঁহার নিকট কিরূপে উপলব্ধ হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

“প্রকৃতির জীবন্ত শক্তি, প্রভূত পরাক্রম কার্য্যক্ষেত্রেই অধিক; পাঠ্যগৃহ ধর্ম্মমন্দির, সভা সমিতি কেবল মানসিক ক্রিয়ার লীলা ভূমিমাত্র। বস্তুত এই খানেই মানবের প্রকৃত জীবন। এখানে যাহা কার্য্যে পরিণত না হয়, সর্ব্বাঙ্গীন সফলতা হউক বা না হউক, সাধ্যানুরূপ সফলতা, অন্তত তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন যদি না দেখিতে পাই, ভজনালয়ের সুমধুর প্রার্থনা উপদেশ, প্রকাণ্ড সভার বক্তৃতা, বিদ্যালয় বা ব্যবস্থালয়ের নৈতিক বিধি, শিক্ষা বা শাসনপ্রণালী আকাশকুসুমবৎ প্রতীয়মান হয়। বঞ্চবাত্যা বিঘূর্ণিত মহাবেগশালী কর্ম্মক্ষেত্র দেখিয়া মনে হইল, বিধাতা তাঁহার চরম লক্ষ্য সাধনের জন্য যেন জড় পশু মানবের সমস্ত নৈসর্গিক ক্রিয়াকে ভীম বলে নিষ্পেষণ করত তাহার ভিতর হইতে আপনার আদর্শ স্থাপ প্রদর্শনে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ভৌতিক জগতের এবং জনসমাজের দৈনি

ক্ষয় বৃদ্ধি, জীবন মরণ, উন্নতি অধোগতি, বিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন এক অতি আশ্চর্য্য অদ্ভুত ক্রিয়া। সমস্ত যেন নীরব, সমভাব; অথচ অলক্ষিত গতিতে যুগান্তর এবং রূপান্তর হইতেছে। পুরাতনের ভিতর নিত্য নূতন। প্রতি-ক্ষণে স্থষ্টিকর্ত্তা যেন নব নব সৃষ্টি করিতেছেন। এমন এক শক্তি ইহার ভিতর আছে যাহার কিছুতেই ক্ষয় নাই, লয় নাই; সে মহাবেগে নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতেছে আর অদ্ভুত ভোজবাজী দেখাইতেছে। ভূত সমষ্টির সংযোজন বিশ্লেষণ রূপান্তর অবস্থান্তর অতীব আশ্চর্য্য। জল বায়ু সূর্য্যকিরণ বিদ্যুৎ উত্তাপ শৈত্য শিশির বাষ্প সলিলপ্রবাহ অদৃশ্য ভাবে কোথায় কি ভাঙ্গিতেছে গড়িতেছে, কত প্রকার গতি শক্তিতে উহারা পরিণত হইতেছে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।”

“কর্ম্মক্ষেত্রের কার্য্যসমারোহ, মহাতেজস্বিতা যে দিন আমি মানসনেত্রে এইরূপে অবলোকন করিলাম, সে দিন মনের মধ্যে এক অদ্ভুত চিন্তাতরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল। এখানে বিধাতা স্বয়ং কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া খাটিতেছেন এবং সকলকে খাটাইতেছেন। তিনি দৌড়া দৌড়ি ছুটা ছুটি না করিলে একটী পর-মাণু কণাও নড়িতে পারে না। কেন তবে হাটে বাজারে কার্য্যালয়ে লোকে ভগবানকে না দেখিয়া কেবল ভৌতিক এবং লৌকিক ক্রিয়া দেখে? আর বলে, এ ঘোর সংসারমধ্যে ধর্ম্ম রাখা যায় না? ধর্ম্মশক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রভূত বিক্রমে আস্ফালন করিতেছ, তথাপি হায়! কেহ তাহা দেখিতে পায় না। বিষয়াসক্তির অন্ধ চক্ষে কিরূপে তাহা প্রতিভাত হইবে? লোকের ভয়ানক ভিড়ের মধ্যে, তাহাদের কার্য্যোদ্যমের ব্যস্ততার ভিতরে আমার যেন বোধ হইতে লাগিল, লোকপতি ঈশ্বর আমার গায়ে চাপিয়া পড়িতেছেন। তিনি অসংখ্য অযুত মানবযন্ত্রের যন্ত্রী হইয়া নানা কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত রাখি-য়াছেন। এ সব কি মানুষের কাজ? না সংসারের অসার লীলা খেলা? না ভূতের মেলা? স্বয়ং ভূতভাবন ভগবান্ নানা মূর্ত্তির ভিতর খেলা করিতে-ছেন। মানুষ কেবল দেখিতেছে চারি দিকে মস্তিষ্ক আর উদর, আর হস্ত পদ চক্ষু; সংসারকে সঙের সার অসার জানিয়া সেই ভাবে দেখিয়া যাইতেছে; কিন্তু ইহার ভিতরে বিধাতার নিত্য জীবন্ত লীলা কেহ দেখে না। যেমন তিনি দেবমন্দিরে, তেমনি পরিবারে কার্য্যক্ষেত্রে; যেমন সেকালে ঋষির তপোবনে এবং গিরিগুহায়, তেমনি একালে প্রতি গৃহে গৃহে।”

“দিবাভাগে এই সকল দর্শন করিয়া তাহা ভাবিতে ভাবিতে আমি

মৎস্য মাংস, দুগ্ধ ক্ষীর, তেল লবণ পান গুপারি, কাঠ কয়লা রোজ
আসছে, খরচ হচ্ছে, এরা ফুরায় না কেন? পৃথিবীর দ্রব্যাদির মূল উপা
কি আবার নিত্য নূতন করিয়া বাড়াইতে হইতেছে? মেদিনীর ক
কি তবে ক্রমে ওজনে ভারী, এবং দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাড়িয়া যাইতেছে?
রোজ এত কোথা হইতে কে যোগায়?"

"বিশ্বপোষণের কার্য্য প্রতি মুহূর্ত্তেই হইতেছে, ভঙ্গ এবং গঠন ক্রি
একটুও বিরাম নাই; দিনের বেলায় কাজ কর্ম্মের গণ্ডগোলে এ সব অ
করা যায় না. নির্জ্জনে রাত্রি কালে ইহার প্রচ্ছন্ন প্রক্রিয়া মানসচ
নিকট স্পষ্ট প্রতীত হয়। গোপনে এ সমস্ত নিষ্পন্ন করিবার তাৎপর্য্য অ
বেশ বুঝিতে পারিলাম। তাহা না হইলে শুদ্ধাচারী আহারবিচারী
মহাশয়দের বিশেষতঃ শুচিবায়ুগ্রস্ত বিধবাদিগের অনাহারে পঞ্চগব্য খাই
এবং ক্রমাগত স্নান করিয়া করিয়া মরিতে হইত। তাঁহাদের এ সব
জানাই ভাল। দ্রব্য মূল্যেন শুদ্ধতা।"

"গভীর রাত্রিতে একা ছাদের উপর জাগিয়া বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে
বুঝিতে পারিলাম, প্রতি দিবসের সংগৃহীত পর্ব্বতাকার খাদ্য এবং পানী
এখন জীবদেহের পাকস্থালীতে পরিপাক হইতেছে। চা রুটী আণ্ডা, ছোলা
ভিজা আদা, পেস্তা বাদাম আপেল আঙ্গুর বেদানা. আখ শশা ক
নারিকেল আতা পেয়ারা আনারস আম কাঁটাল, সন্দেশ রসগোল্লা; তা
সঙ্গে শাক ভাত ডাল উচ্চে পটোল আলু বড়ি থোড় বেগুন; তার সঙ্গে
মৎস্য মুর্গি গো শূকর মেষ ও ছাগমাংস; তার সঙ্গে লুচি কচুরি দা
পরমান্ন মুড়ি আম্বল চড়চড়ি শুকতনি; তার উপর পেঁয়াজ রশুন
ঝাল টক, ক্ষীর ছানা দুধ মাখন, সেরী স্যাম্পিন ব্র্যাণ্ডি বিয়ার, পান চু
সোডা লেমোনেড। এইগুলি মনে কর এক জায়গায় একটী প্রকা
উদর মধ্যে রক্ষিত হইল এবং পরিপাকশক্তি তাহাকে এক সঙ্গে মিশাই
গলাইয়া রস রক্ত বিষ্ঠা মূত্র ঘর্ম্ম এবং ক্লেদে বিভক্ত করিবার জন্য আলোড়
করিতে লাগিল; এখন এক বার তাহার মূর্ত্তিটী কিরূপ ভাবিয়া দেখ
আমি সমস্ত নিদ্রিত নর নারীর পাকস্থালীর ভেদ ব্যবধান ভাঙ্গিয়া এ
করিলাম, এবং অবিভক্ত উদরসমুদ্রের মধ্যে ভুক্ত সামগ্রীর পরিপাকক্রি
দেখিতে লাগিলাম। বিধাতার এ কল বড় আশ্চর্য্য কল। রন্ধন ক্রিয়া
সময় যেমন ধূম বাষ্প উত্তাপ আঘ্রাণে আকাশ ভরিয়া যায়, উপরি উ

[illegible] মধ্যে তদ্রূপ হইতেছে। তাহার বাষ্প উত্তাপ আঘ্রাণ অদৃশ্যাকারে [illegible]লে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। ভাই সকল, আহার্য্য বস্তুর পরিণাম, পুন-[illegible], এবং পুনরাবৃত্তি এক বার দর্শন কর। যাবতীয় উৎকৃষ্ট উপাদেয় [illegible] সামগ্রী শেষ পুরীষ রাশিতে পরিণত, অল্পাংশ কেবল শোণিত।"

[illegible]তঃপর আমার মনে এই চিন্তা আসিল, আজ যে সমস্ত ভাত তরকারী, [illegible] মৎস্য মাংস মিষ্টান্ন ঘৃত দুগ্ধ দধি উদরস্থ হইল, কাল তাহার পরি-[illegible] ঐরূপ, অথচ পৃথিবীর আকার যেমন তেমনই থাকে, কিছুতেই কমে [illegible] কেন? পর দিন আবার এ সমস্ত সামগ্রী কি নূতন সৃষ্ট হয়? বসুন্ধরার [illegible] নাই, বৃদ্ধিও নাই, এক রূপই চিরকাল দেখিতেছি, তবে এই সব [illegible]দিনের ক্ষতি পূরণ হয় কিরূপে? মহা ভাবনার মধ্যে পড়িয়া গেলাম। [illegible] স্থির গম্ভীর চিন্তার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মানবসমাজের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা, ঘৃণ্য গলিত পদার্থ এবং পুরীষতত্ত্বের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইলাম। তখন স্পষ্ট বুঝা গেল, আজ যাহা বিষ্ঠা মূত্র ক্লেদ, শবদেহ, গলিত উদ্ভিদ্, ছয় মাস কি বৎসর পরে তাহাই আবার উপাদেয় ফল ফুল শস্য; দুই বৎসর পরে তাহা হইতে তৃণ পত্র মৎস্য মাংস মিষ্টান্ন দুগ্ধ ক্ষীর ঘৃত। আজ যাহা মৃত পশু ও মানবদেহের পূতি গন্ধময় পচা মাংস এবং উদ্ভিদ, কিছু কাল পরে তাহাই আবার তোমার আমার সুখাদ্য সুস্বাদু ভোজ্য কেবল তাহা নহে, দেহের শ্রদ্ধেয় এবং আদৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! কি আশ্চর্য্য ভোজবাজী।"

আত্মারাম প্রমুখাৎ এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত শুনিয়া তদীয় সহচরবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ নাকে কাপড় দিয়া ওয়াক্ ওয়াক্! করিতে লাগিলেন। যাহারা বেশী আচারবিচারী তাঁহারা বলিলেন, "ছি! ছি! ছি! রাধাকৃষ্ণ! রাধাকৃষ্ণ!" এই বলিয়া কেহ গা ধুইবার জন্য, কেহ বা উদ্গীরণের জন্য উঠিয়া বাহিরে গেলেন। জনৈক অর্দ্ধশিক্ষিত সভ্য সহচর ভদ্র ভাষায় একটু দুঃখিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "ভাই আত্মারাম! তোমার অন্যান্য বক্তব্য এবং মতামত সিদ্ধান্ত গুলি বেশ ভাল লাগিল, কিন্তু পুরীষ এবং ঘৃণিত গলিত পচা সামগ্রীতত্ত্বের রসাস্বাদন করিতে পারিতেছি না; এটা ভাই নিতান্ত অসভ্য কথা, মুখে আনা উচিত নয়।"

তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "মুখে না আনিলে জীবন ধারণ করিবে কিরূপে? উদরে স্থান দিতেছ, দেহের সর্ব্বাঙ্গ গঠন করিতেছ, মুখটী

কি শরীর ছাড়া কোন দেবাঙ্গ? এখন ইহার রস না পাও, কিছু দিন পরে ঘুরিয়া ফিরিয়া রূপান্তর হইয়া নবীনবেশে যখন পাতের নিকট কিম্বা টেবিলের উপর আসিবে তখন আবার ঐ মুখে লাল পড়িবে।”

আমরা। তুমি ভাই এরূপ উদ্ভট তত্বজ্ঞান কোথায় শিখিয়াছিলে? ঐ দেখ, আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাকে কাপড় দিয়া বোমি করিতে করিতে নাইতে গেলেন।

আত্মা। তা যান, কিন্তু ঐ উদ্গীর্ণ বস্তু পুনরায় উদরে প্রবিষ্ট হইবে। প্রতি লোমকূপের ভিতর দিয়া অজ্ঞাতে এবং মুখের ভিতর দিয়া স্বইচ্ছায় দিব্যজ্ঞানে উহা উদরে স্থান পাইবে। নাকে কাপড় দিলে কি হইবে? নাকটাই বা কি?

সকলে অবাক্ হইয়া বলিলেন, “তুমি যে নিহাত স্পষ্টবক্তা হইলে দেখি! আহা ব্রাহ্মণের কি কষ্ট! আমাদেরও গা উলি মুলি করে আস্‌ছে।”

আত্মা। তা কি করব, যেটা সত্য চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট দেখ্‌ছি, তাহা লুকাব কিরূপে? ভট্টাচার্য্য মহাশয় গা ধুয়ে কি করবেন? পেটের ভিতরটা কি? গা কি? যাহা দ্বারা ধোবেন তাই বা কি? আপাততঃ যাহা অতি উপাদেয় সুমিষ্ট পবিত্র শুদ্ধ ভদ্র এবং রুচিকর বোধ হইতেছে, তাহাও ঐ সমস্ত পুরীষের শেষ পরিণতি। মোদ্দা কথা এই, তোমাদের ভাল লাগুক আর বোমিই আসুক, বিষ্ঠা হইতে চন্দন, চন্দন হইতে বিষ্ঠা, এই সার কথা। ব্রহ্মজ্ঞানীরা এই জন্য বিষ্ঠা চন্দন সমান জ্ঞান করেন। লোকের দৃষ্টির আড়ালে, প্রকৃতির চক্রে ক্রমে এইরূপে পার্থিব পদার্থ সকল রূপান্তরিত নবীভূত হইতেছে। তোমরা ঘৃণা করিয়া কি করিবে? বিধাতা স্বয়ং এই কাণ্ড কারখানা করিতেছেন। চিন্তহীন লোভী ব্যক্তি কিসে কি হয় তাহা জানে না, তাই আচার আচার করিয়া বেড়ায়।”

কোন নির্ব্বোধ জ্ঞানী সহচর বলিলেন, “ভ্যাজাল নিবারণের আইনের ভিতর এ বিষয় কি আস্‌তে পারে না?”

আত্মারাম হাসিয়া বলিলেন, “ভ্যাজাল কোথা? এ যে নবীকরণ! মন্দ হইতে ভাল, অসার হইতে সার, গোবর হইতে পদ্ম! কারীগরকে তারিপ কর। অবাক্ হয়ে তাঁকে বার বার প্রণাম কর।”

প্রথমে আত্মারামের কথা শুনিয়া আমাদের গা কেমন করিয়া উঠিয়াছিল, শেষে আর তাহা রহিল না; বরং বিস্ময়ের সহিত আনন্দরস

উথলিয়া উঠিল। আমোদ হইল। কথাগুলি যে ঠিক ঠিক, তাহা আমরা মনে মনে বিলক্ষণ মানিয়া লইলাম। কিন্তু তাঁহার মত সাহস করিয়া এ কথা আমরা ভদ্রের সভায়, বিশেষতঃ হিন্দুর বাড়ীতে বলিতে পারি না।

অতঃপর আমাদের সারগ্রাহী বন্ধু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ভাই, গা ধুয়ে কি করিবে? দেহটা যদি একবারে ফেলে দিতে পার, তবেই শুদ্ধ হইতে পারিবে। অথবা শুদ্ধাশুদ্ধ বাহিরে আদবে নাই, আত্মার ভিতরে। বস্তুতঃ সকলই শুদ্ধ। স্বয়ং দেব দেব পরমদেব শক্তিরূপে যেখানে নিরন্তর বর্ত্তমান, সেথানে আবার আচার বিচার কি? জগৎকার্য্য সব ভেস্কী বাজী। স্বভাব আপনি আপনার ক্ষতি পূরণ করে। বিধাতার এমনি সৃষ্টি, ইহা কখন পুরাতন হয় না। এক খণ্ড সেই পুরাতন ভূমি; চিরকালই হরিদ্বর্ণ নব নব শস্য উৎপন্ন করিতেছে। তুমি স্বাধীন বুদ্ধিমান মনুষ্য, ভয়ানক নরহত্যা অত্যাচার বিদ্রোহিতার দ্বারা তাহাকে শ্মশানবৎ করিয়া ফেলিলে, আবার সে অন্তরনিহিত অমরশক্তি প্রভাবে আপনাকে আপনি অমরোদ্যানে পরিণত করিল। তাহার জন্য কত কত রাজা জমিদার উৎসন্ন গিয়াছে, কিন্তু সে নিজে পূর্ব্ববৎ সর্ব্বজীবের মাতা হইয়া শুইয়া আছে। তাহাকে অধিকার করিবার জন্য মানুষ বিবাদ করিয়া মরে, কিন্তু সে চিরকাল নিজেই নিজের অধিকারিণী। পথের ধূলিকণা, নদীর বালুকারাশি সাক্ষীরূপে গর্ব্বিত মানবের অসার কীর্ত্তি দেখিতেছে আর হাসিতেছে। এক অখণ্ড শক্তিতে সমস্ত জল স্থল আকাশ খনিজ উদ্ভিদ, পশু মানব দেবতা গ্রথিত।"

"এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি প্রায় অবসান হইল, তখন আমার চক্ষে একটু তন্দ্রা আসিল। নিদ্রামিশ্র চিন্তার ঘোরে দেখিলাম, পার্থিব জগতের অখণ্ড অবিভক্ত অস্তিত্ব আমাকে যেন তাহার সহিত মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিয়াছে। ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্রতাতেই ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয়, নতুবা বস্তুতঃ ভেদাভেদ কিছু নাই; একের ভিতর বহু, বহুর ভিতর এক, উভয়ের মিলনে সারসিদ্ধান্ত। পরে ভাবিয়া দেখিলাম, পার্থিব পরমাণুপুঞ্জের মধ্যে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের পবিত্র শরীরের অস্থি মাংস শোণিত রূপান্তর ভাবে স্থিতি করিতেছে। কেবল তা কেন? অন্যান্য দেশের এবং স্বদেশের সাধু ভক্ত মহাজনগণের দেহের সহিতও আমরা এক। তাঁহাদের দেহের পরমাণু আমাদের এই ভৌতিক দেহে, এবং পৃথিবীর ধূলিরাশিতে মিশিয়া আছে। এই পুরাতন আকাশে পুরাতন বায়ুমণ্ডলে পূর্ব্বতন ঋষি যোগী

ভক্তবৃন্দের নিশ্বসিত পুণ্যবায়ু, তাঁহাদের মুখবিনিঃসৃত ভগবদ্বন্দনার শব্দতরঙ্গ এখনও হিল্লোলিত হইতেছে; ঋষিতপোবনে সত্য যুগে যে ব্রহ্মস্তোত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা প্রতিধ্বনি সহকারে অদ্যাবধি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোন শক্তিই এককালে নিঃশেষিত হয় না। এই প্রাচীন আকাশে পার্থিব সৃষ্টির সমগ্র ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। যাহা বেদ বাইবেল কোরাণে নাই তাহাও এখানে আছে। অনন্ত আকাশব্যাপী এই সুবিস্তৃত বায়ুসাগরে বহু প্রাচীন কাল হইতে ব্রহ্ম নামের বিশাল তরঙ্গ ক্রমাগত ভাসিয়া আসিতেছে, আমি তাহার মধ্যে নিরন্তর ডুবিয়া রহিয়াছি, এবং আমার এই নশ্বর দেহও সেই দ্বিজাত্মা আর্য্য মহাজনগণের রূপান্তর অঙ্গবিশেষ; যখন এই সকল উদার চিন্তা আমার মনে উদয় হইল, তখন আমি আমাকে আর স্বতন্ত্র মনে করিতে পারিলাম না। সমস্ত সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে এক হইয়া গেলাম। পুরাতন নূতন, স্বদেশ বিদেশ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, ইহলোক পরলোক, স্বর্গ মর্ত্ত্য সমস্তই এক, এবং সেই অনাদি আদি পুরাতন পুরুষোত্তমের বিভূতি বিকাশ।”

[দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।]

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

সংসর্গ, সামাজিক অবস্থা এবং অভ্যাসদোষে মানুষের মতি গতি বিকৃত হয়, কিন্তু তাহার মৌলিক প্রকৃতির দেবগুণ তাহাতে ধ্বংস হয় না। সে কখন মৃদু স্বরে, কখন ভীষণ আর্ত্তনাদে নিজ দুরবস্থা প্রকাশ করে। সংসার আসক্তির শেষ সীমায় বিরক্ত বৈরাগ্য এবং বিরক্ত বৈরাগ্যের চরমাবস্থায় সংসারকামনা, ইহাই স্বভাবের নিয়ম। বিধাতার বিধানে উভয়েরই মধ্যপথ এবং সামঞ্জস্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই স্থানে উপনীত হইবার জন্য সৃষ্টিকাল হইতে মনুষ্যসন্তানগণ অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। এক দিকে সর্ব্বত্যাগ কঠোর ব্রত, অপর দিকে মহাবিলাস, অন্ধাসক্তি, দেহসর্ব্বস্ব, সংসারমোহ; প্রাচীন পৃথিবীর চিরপ্রচলিত এই দুইটী ভীষণ প্রবাহ আত্মারামকে আঘাত প্রতিঘাত দ্বারা গঠন করিয়াছিল। যখন তিনি যৌবনের অর্থাৎ ছাত্রজীবনের সারল্য নিস্পৃহতা এবং আধ্যাত্মিকতার বিপরীত দিকে গিয়া সংসারে ডুবিলেন, তখন কিছু দিনের জন্য বিষয়সুখ, দারা পুত্র কুটম্বগণের লৌকিক মায়া মমতা বেশ ভাল লাগিল বটে, কিন্তু গোলাপে কাঁটা, অমৃতে গরল, প্রণয়ে বিচ্ছেদ, সুখে দুঃখ, আশায় নিরাশা লুকাইয়াছিল, যথাসময়ে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন আর কিছু ভাল লাগে না, সব কেবল পুরাতন, নীরস, চর্ব্বিতচর্ব্বণ, পুনরাবৃত্তি; অথচ ছাড়াও যায় না। কিছুই নূতনত্ব নাই, উচ্চতা বা গভীরতা নাই, আকর্ষণ প্রলোভন নাই, অথচ তাহারই মধ্যে পড়িয়া জীবনটা শেষ করিতে হইবে। এ অবস্থায় ফলাফলবিবেকী অনাত্মবাদী আত্মহত্যা করে। সে বলে, জীবনের জন্য কেন আমি দারিদ্র্য বিচ্ছেদ জরা বার্দ্ধক্য নিরাশার ভগ্ন বিষণ্ণ হইয়া জীবন বহন করিব? যখন এক বিন্দু আর্সিনিক, একটা গুলিতে নিমেষমধ্যে সমস্ত শেষ করিয়া ফেলা যায়, তখন বাঁচিয়া দুঃখ ভোগ কি মূর্খতা নহে? এই বলিয়া সে ইহজীবনের লীলা শেষ করে। আর যিনি অমরত্বে বিশ্বাসী অনন্তের সন্তান, তিনি বলেন,

আমি অনাদি পরব্রহ্মে জীবিত থাকিয়া দুঃখ দরিদ্রতা জরামরণ অতিক্রম করিব। এবং ঈশ্বর যেমন পূর্ণ, আমিও তেমনি পূর্ণ বিকসিত হইব। আত্মারাম যে সময় গৃহ পরিত্যাগ করেন তখন তিনি এই উভয় অবস্থার সন্ধিস্থলে অবস্থিত।

সংসারের বিলাস সুখ, আশা অভিলাষ যখন কতক পরিমাণে তাঁহার পরিতৃপ্ত হইল, অবশিষ্ট দুর্নিবার পিপাসার ভিতর চিরদিনের জন্য দুরাশার মধ্যে রহিয়া গেল; এবং ক্ষোভের তিক্তরস অন্তঃকরণে কিছু কিছু প্রবেশ করিল, তখন আত্মারামের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, স্ত্রী পুত্র কন্যা জামাতা আত্মীয় কুটুম্বগণ কেবল বলে দাও! দাও! দাও! দিলে তাহাদের প্রেম কৃতজ্ঞতা আত্মীয়তা বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু না দিলে মহা বিরক্ত হইয়া নিন্দা করিয়া বেড়ায়। ভোগ সুখ পুরাতন হইল, কোন লোকের আন্তরিক ভালবাসাও পাইলেন না, ইহা ভাবিয়া তাঁহার আত্মা কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এক বার কাঁদে, আবার চক্ষের জল মুছিয়া সংসারকোলাহলে সব ভুলিয়া যায়। সেখানে কাঁদিবার কিম্বা বেশী ভাবিবার অবসর কোথায়? যাই হউক, অনাত্মপরিবার, অসার পার্থিব মায়ার মধ্যে তিনি আর বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না, হঠাৎ এক দিন বন্ধন কাটিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহ পরিত্যাগের পর কোথায় কিরূপে অবস্থিতি করেন তদ্বিবরণ এইরূপ;—

"হঠাৎ এক নিশ্বাসে গৃহ পরিবার ছাড়িয়া একেবারে আমি বাহির হইয়া পড়িলাম, এবং মাঠের মাঝখানে এক বটগাছের তলায় বসিয়া একটু দম লইলাম। ক্ষণ কাল পরে মনে হইল, প্রাণের রজ্জু ধরিয়া বাড়ী পানে কে যেন টানিতেছে। অনেক দিন সকলের সঙ্গে মিশিয়াছিলাম কি না, তাই প্রাণটা কেমন কেমন করিতে লাগিল। ইহাকেই কি বলে কর্ম্মফল? তখন যদি এক ঝোঁকে বাহির হইয়া না পড়িতাম, তাহা হইলে বোধ হয় আর পারিতাম না। মায়ার ছায়াটা ভূতের মত পাছে পাছে আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনটা সে জন্য মাঝে মাঝে বড় উদাস উদাস বোধ হইত। কেমন যেন ফাঁক ফাঁক লাগিত। অহং যদিও বিপাকে পড়িয়া এখন অনেকটা কাহিল, কিন্তু তথাপি সে আপনার স্বভাব ছাড়িতে চায় না। কেরাঞ্চি গাড়ীর অর্দ্ধশিক্ষিত ঘোটক গমনের পূর্ব্বে যেমন অশ্বশালার দিকে পুনঃ পুনঃ মুখ ফিরায়, সে তেমনি বার বার পাছে ফিরিয়া চাহিতে লাগিল। অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে কোন সাধনত হয় নাই

কেবল একটু অনুরাগ পিপাসা আছে এই মাত্র। প্রবৃত্তির সাধনে এবং সিদ্ধিতে বেশী সময় লাগে না, নিবৃত্তি সাধন বহু সময়সাপেক্ষ; সিদ্ধিরত কথাই নাই, অধ্যাত্মতত্ব দর্শন তার পর। সুতরাং স্ত্রী পুত্রের মুখ বারম্বার মনে পড়িতে লাগিল। নেশা কতক ছুটিয়া গিয়াছে বটে, তত্রাপি তাহার ঝোঁক যায় নাই; অন্য একটা নেশা তাহার পরিবর্ত্তে এখন চাই। তাহার অভাবে জীবনটা ভারবহ নীরস হইয়া পড়িল।”

“সে সময় সংসার পরিবারের উপর আমি ভারি চটিয়া গিয়াছিলাম। মনে হইতেছিল, যেন সমস্তই হৃদয়হীন পেসাদারী। অথচ মায়া এবং স্নেহের বন্ধন গুলিকে বলপূর্ব্বক ছিন্ন করাতে প্রাণের ভিতর গভীর বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। এক বার ভাবিলাম, যাই কোথা? আবার মনে হইল, থাকিই বা কোথা? যাহা চাহি না, যে সকল বিষয় ছাড়িয়া আসিলাম তাহার জন্য আবার প্রাণ টানে কেন? তবে কি সংসারে কিছু সার আছে না কি? তাই যদি থাকিবে, তবে আমার ভাল লাগিল না কেন? উভয় শঙ্কটে পড়িয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিলাম। হৃদয় শুষ্ক, প্রাণ শূন্য, এ অবস্থায় কি করি, কোথা যাই স্থিরও হয় না, নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতেও পারি না। একটা কিছু মীমাংসা চাই। নৈরাশ্যের অকূল পাথারে, সংশয় অন্ধকারে পড়িয়া ভাবিতেছি, এমন সময় কে যেন বলিয়া উঠিল, “কর্ম্মফল অপরিহার্য্য।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? তিনি বলিলেন, “আমি বাণী।” তদনন্তর আমি বলিলাম, আমি এখন কি করি, কিছুই যে ভাল লাগে না তাহার উপায় কি? বাণী বলিলেন, “যাহা ভাল লাগিতেছে না, তাহাই আবার ভাল লাগিবে। ভাল মন্দ বলিয়া কোন সামগ্রী জগতে নাই। স্থিতপ্রজ্ঞ নিষ্কামচিত্ত হইলে সকলই ভাল লাগে। অর্থাৎ আপনাকে আপনি যদি ভাল লাগে, তাহা হইলে সকলই আনন্দময় হইয়া উঠে। এ বিষয়ে যদি তোমার অভিজ্ঞতা কম থাকে, বাহ্য জগতের চারি দিক ঘুরিয়া দেখ; কিন্তু শেষে আবার ঐ স্থানেই ফিরিয়া আসিতে হইবে; কারণ, সংসার কর্ম্মভূমি।” তখন আমি কাঁদিয়া বলিলাম, আর আমি সংসারে থাকিতে পারি না, বড় যন্ত্রণা। বাণী মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, “সংসারের সুখে আর মজিবে কি? ঐ যন্ত্রণাই জানিবে এখানকার পুরস্কার। এখন চৈতন্য লাভ হইয়াছে ত?” আমি বিরক্ত এবং দুঃখের সহিত বলিলাম, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, সখ মিটিয়াছে।

এখন আমি কাহারো অধীনে বদ্ধ স্থানে বদ্ধভাবে আর থাকিব না; বাতাসের মত যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে উড়িয়া বেড়াইব।"

"এইরূপ শান্তিহীন উদাসীন অবস্থায় কিছু দিন ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইলাম। সুখ শান্তি তেমন কিছু পাইতাম না বটে, কিন্তু বিশেষ দুঃখ ছিল না। অধিকন্তু ইহা দ্বারা একটা উপকার এই হইল যে, আত্মার বদর এবং বদরক্তগুল ক্রমে শুকাইয়া আসিতে লাগিল। তন্নিমিত্ত আপনাকে আপনি বেশ হাল্কি হাল্কি বোধ করিতে লাগিলাম। মাথার বোঝাট নামিয়া গেলেও যেমন কিয়ৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ভারবোধ কিছু কিছু অনুভূ হয়, সেইরূপ অবস্থা। পরে স্থির করিলাম, অন্তর্জগতে যত দিন কো অভিনব উপভোগ্য বিষয় না পাই, তত দিন বাহ্যাবস্থার পরিবর্ত্তনের জ দেশ ভ্রমণ করিব; তাহাতে নূতন বিধ দৃশ্য, নূতন নূতন লোকসমাজ দেখিয় ভুলিয়া থাকিতে পারিব এবং তদ্দ্বারা আত্মার উৎকর্ষও সাধিত হইবে পাঠ্যাবস্থায় যখন ভূগোল ইতিহাসে প্রাচীন স্মরণীয় ঘটনার প্রসিদ্ধ স্থান এব প্রাকৃতিক অদ্ভুত দৃশ্যের বিবরণ সকল অধ্যয়ন করিতাম, তখন হইতেই সকল স্বচক্ষে দেখিবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হইত। এমন কি, স্ব কল্পনায় আমি যেন স্পষ্ট সে সমস্ত আশ্চর্য্য দৃশ্য মানসনেত্রে দেখিয়া তন্মে বিচরণ করিতাম। এক্ষণে সেই কৌতূহল পূর্ণ মাত্রায় অন্তরে জাগিয়া উঠিল

"এইরূপে সংসার এবং পরিবারের মায়া মমতা যতই পশ্চাতের দি হইতে আকর্ষণ করে, আমিও প্রাণের দায়ে ততই সম্মুখের দিকে দূর হইত দূর দেশে অগ্রসর হই। কোথায় কোন্ দিকে যাইব তাহা ঠিক করি বাহির হই নাই। পা দুইটা দ্রুতবেগে ধাবিত হইল, কিছুতেই আর থা না। ক্রমে পশ্চিম মুখে চলিলাম। প্রথমে বীরভূম অঞ্চলের এক গ্রা কোন ব্রাহ্মণগৃহে অতিথি হই। তাহারা আমার পরিচয় পাইয়া বিব দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কারণ, তাহাদের গৃহে তিন চারিটী প্রাচী কুমারীর তখনও পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। ভাবিলাম, আবার বিবাহ বিবাহের প্রেত যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল। অতঃপর রাত্রি ভো উঠিয়া গোপনে সাঁওতাল পর্ব্বতের অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। পরিশে নানা কারণে আমাকে ভদ্র পরিচ্ছদ, জাতীয় চিহ্ন পরিত্যাগ করি হইল। সেই হইতে নাম ধাম বংশের পরিচয় আর কাহাকেও দিত না। এক ধুতি আর মোটা চাদরের এক থিলকা মাত্র অঙ্গাবরণ রহি

তাহাকে গিরিনির্ঝরের ঈষৎ গৈরিক জলে রঞ্জিত করিয়া লইলাম। লাল নয়, শাদাও নয়, গোলাপিও নয়; খুব ফিকাঁ গোলাপি অথবা বর্ষার গঙ্গাজলের ন্যায় তাহার বর্ণ। স্নান একবারে বন্ধ, আহার দিনান্তে এক সন্ধ্যা। উদাসীন বেশে এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রাচীন রামকেলী অর্থাৎ গৌড়নগরে গিয়া উপস্থিত হইলাম।"

"নিবিড় অরণ্যে পরিবেষ্টিত গৌড়নগর। পূর্ব্বে এক সময় যেখানে রত্নরাজীখচিত বিজয়ী নরপতি এবং দিব্যাঙ্গী রমণীগণের বিহার স্থান ছিল, এখন সেখানে দেখি বিষধর সর্প, ভীষণ শার্দ্দূল, বিকট মূর্ত্তি জল জন্তুর বাস। যেখানে রাজা এবং বাদসাহগণ সভাসদ্ জনে পরিবেষ্টিত হইয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সহিত রাজকার্য্য করিতেন, এখন সেই স্থান ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপ। দরবার ভবন, বেগম মহল, দুর্গ, সোণামসজিদ, সমাধিস্তম্ভ, মন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ চিহ্ন দর্শনে আমার মন নিমেষ মধ্যে সার্দ্ধ সহস্র বৎসর পশ্চাতের দিকে চলিয়া গেল। প্রায় আট কি দশটী মনুষ্যবংশের রাজা প্রজা মন্ত্রী এবং সৈনিক পুরুষগণ সারি সারি কাতার দিয়া শ্রেণীবদ্ধরূপে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সেই হিংস্র জন্তুসঙ্কুল অন্ধকারময় বনভূমিকে আমি এক আশ্চর্য্য গৌরবশালী সমৃদ্ধিসম্পন্ন জনকোলা-হলময় মহানগররূপে দেখিতে লাগিলাম। বর্ত্তমান ভেদ করিয়া ভূত কালের ইতিহাস মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুয়ের মধ্যে বিশেষ ব্যব-ধান কি? দৃশ্য পদার্থের রূপান্তর আর কিঞ্চিৎ সময় মাত্র ব্যবধান। সময় আমার বিশ্বাসচক্ষুর নিকট স্বচ্ছ আকাশের ন্যায়, নির্ম্মল দর্পণের ন্যায়। পুরাতন ইতিহাসের ঘটনা যদি সত্য হয়, এবং তাহা যদি বর্ত্তমান বংশের মানব প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া হয়, তবে সময়ের ব্যবধানে আমার কি করিবে? মানব সমাজের ইতিহাসে যাহা হইয়াছে, তাহাই হইতেছে, এবং ভবিষ্যতে তাহাই হইবে। এই সকল দেখিতে দেখিতে এবং ভাবিতে ভাবিতে আমার যে কিঞ্চিৎ সংসারমায়ার ছায়া ছিল তাহা অন্তর্হিত হইল। তখন আমি সেই অরণ্য মধ্যে এক ভগ্ন প্রাচীরের উপর বসিয়া গভীর চিন্তার্ণবে সন্তরণ করিতে লাগিলাম। বিশ্বের দৃশ্যমান পদার্থ এবং ঘটনা সমূহ যখন দিব্য দৃষ্টিতে পরিবর্ত্তসহ অসার বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন তাহার ইন্দ্রধনুবৎ ক্ষণিক সৌন্দর্য্য চিত্তকে বড় আমোদিত করে; কিন্তু অসারকে সার, অনি-ত্যকে নিত্য রূপে দেখিয়া তাহাতে আসক্ত হইলে আর কিছু মজা নাই।"

"আমি কিয়ৎ ক্ষণ একাগ্রমনা হইয়া হুশেন সাহা, রূপ সনাতন, সুবুদ্ধি খাঁর প্রভুত্ব, ভক্তসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যবিলাস স্মরণ করিয়া বর্ত্তমানের সহিত তৎকালের অবস্থার গভীর পার্থক্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এই সমালোচনায় আমি নিত্য সত্য এবং অসার অনিত্যের দুই বিপরীত চিত্র এক সঙ্গে দেখিতে পাইলাম। তখন অনন্তের গাম্ভীর্য্য এবং অব্যক্তের নিস্তব্ধতা মধ্যে আমার চিত্ত যেন সমাধি প্রাপ্ত হইল। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এব সুদৃঢ় বিশ্বাসের আলোকে যাহা স্পষ্ট অনুভব করিলাম তাহাকে আর কল্পনা কিম্বা ভাবান্ধতা মনে করিতে পারি না। পূর্ব্বকালের বাদসাহ সম্রাটদিগের পরিণাম যদি এই হয়, তবে, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশের ভূপাল এবং সাধারণ মানব সমাজের পরিণাম যে সেইরূপই হইবে ইহাতে আর কি কোন সংশয় আছে? সুখের বর্ত্তমান, দুরাশার ভবিষ্যৎ এক দিন ভূত কালের ইতিহাসে পরিণত হইবে। প্রাচীন পুরাবৃত্তের রঙ্গভূমির দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরালে অন্তর্ভেদী দৃষ্টির আলোকে এখানে আমি পূর্ব্ব কালের বিষয় একে একে সমস্তই দেখিতে পাইলাম। বিশেষ প্রসিদ্ধ ভাল মন্দ ঘটনা সকল স্মৃতিপথে জাগিয়া জীবন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল, তৎসঙ্গে চর্ম্মচক্ষে যাহা প্রতিভাত হইবার তাহাও হইল। ভূতের সঙ্গে বর্ত্তমানের তুলনা কি চমৎকার শিক্ষাপ্রদ! ষড়রিপুর জ্বলন্ত প্রভাবশালী বিকট ভৈরব মূর্ত্তি, এবং তাহার মধুকৈটভবৎ শবদেহ দুইটি যেন পাশাপাশি আমার সম্মুখে এখন দণ্ডায়মান। তৎপার্শ্বে ন্যায় সত্যের আড়ম্বরবিহীন অটল প্রশান্ত গম্ভীর আকৃতি, দয়া প্রেম পবিত্রতার মধুর সৌন্দর্য্য, মানব স্বভাবের অমরকীর্ত্তি এবং অবিনশ্বর দেবগুণের অপরাজিত মহিমা নীরবে ঘোষণা করিতে লাগিল।"

"জাতিবিশেষের উন্নতি এবং অধোগতি, রাজা ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং সমূলে ধ্বংস, ইহার শেষ ফল কি? ধর্ম্মনীতি জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যের উচ্চতর উন্নতির শিখর আবার কি সময়ে একবারে ভূতলসায়ী হয়? মনুষ্যবংশের সহিত তাহার যাবতীয় জ্ঞান সভ্যতাও কি এককালে বিলুপ্ত হইয়া যায়? ভবিষ্যবংশ কি আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া উন্নতির সোপানে উঠিবে? পেরু, মেক্সিকো, ইজিপ্ট, রোম, গ্রীস এবং ভারতের প্রাচীন এবং আধুনিক অবস্থার প্রার্থক্য দেখিলে অন্তঃকরণ বিষাদভরে অবসন্ন হইয়া পড়ে। বৃক্ষ যেমন যৌবনে ফল ফুল সরস পত্রাবলী প্রসব করিয়া বৃদ্ধ কালে

বিশুষ্ক এবং মৃত্তিকায় বিলীন হয় এবং তাহার মূল উপাদানগুলি রূপান্তরে অপর ভৌতিক দেহ পোষণ করে, সেইরূপ কি মানবের জ্ঞান সভ্যতার পরিণাম এবং প্রক্রিয়া? জাতীয় উন্নতিরও একটি সীমা আছে, কতিপয় শতাব্দী তাহার শ্রীবৃদ্ধি, পরে অধঃপতন, পরিশেষে এককালে বিনাশ। প্রাচীন বৃক্ষের ধ্বংসের পর তাহার মূল উপাদান যেমন বিচ্ছিন্ন ভাবে অপর ভৌতিক পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হয়, মানব উন্নতির ধ্বংসাবেশ উপাদান গুলি তেমনি পৃথিবীর অপরাপর জাতির মধ্যে বিস্তার হইয়া পড়ে; তাহার পূর্ব্বকার আদিম মূর্ত্তি তখন আর থাকে না, মিশাইয়া যায়। তদনন্তর দেশান্তরে বংশান্তরে যুগান্তরে অপর জাতির মধ্যে রূপান্তরে উহা নবভাবে প্রকটিত হয়। এই সিদ্ধান্তে আমি শেষ উপনীত হইলাম। এমন কি, অনেক স্থলে পুত্রেতে পিতৃ উন্নতির অধঃপতন, পৌত্র প্রপৌত্রে তাহার একবারে মূলোচ্ছেদ; তদনন্তর অন্য স্থানে ভাবীবংশে তাহার পুনরুত্থান। পরিবার সম্বন্ধে যেমন, জাতি সম্বন্ধে তত শীঘ্র না হউক, এক পুরুষের উন্নতি দ্বিতীয় পুরুষে অবিকল পৌঁছে না। অথবা পাঁচ সাত পুরুষ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বেগে তাহা ধাবিত হয়, তদনন্তর ক্রমে মন্দীভূত, পরিশেষে শুষ্ক হইয়া যায়।"

"কিন্তু প্রাচীন উন্নতির নিদর্শন জাতীয় ইতিহাস এবং কাব্য নাটক জীবনচরিত ইত্যাদি সাহিত্যের মধ্যে চিরকালের জন্য অবস্থিতি করে। পুরাতন গ্রন্থ সকল অমূল্য ধন। গ্রন্থ যদি রচিত না হইত, আমরা চিরদিন অজ্ঞাতকুলশীল, বংশমর্য্যাদাবিহীন আধুনিক অসভ্য বর্ব্বরের ন্যায় থাকিয়া পৈতৃক ধনে বঞ্চিত হইতাম। গ্রন্থের মধ্যে আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মনুষ্যসমাজের জ্ঞানোন্নতি, সামাজিক নীতি, চরিত্রের বিকাশ, বীরত্ব, কবিত্ব, মহত্ত্ব অক্ষয় অক্ষরে পদ্যে গদ্যে বিবিধ ভাষায় লিখিত আছে। গ্রন্থ সকল অমর। কালের বিপ্লাবক গতিতে পূর্ব্বতন মহাজনগণের সাধু চরিত্র, মানসিক বল সুদূর ভবিষ্যদ্বংশের নিকট যদিও অবিকলরূপে পৌঁছিতে পারে না, ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া যায়; কিন্তু গ্রন্থমধ্যে জাতীয় ভাষার ভিতরে তাহার নিদর্শন চিরদিনের জন্য উজ্জ্বলরূপে বিরাজমান থাকে। অতএব প্রতি বংশের মনুষ্যগণ, যে যাহা সত্য তত্ত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছ তাহা লিখিয়া রাখিয়া যাও। ভাবীবংশের জন্য প্রচুর মূল্যবান রত্ন সুবর্ণ, বসন ভূষণ, বিস্তৃত ভূখণ্ড, ধাতব পদার্থরাশি রাখিয়া গেলে থাকে না, পৌঁড়ের

ধ্বংসাবশেষ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মানুষও থাকে না, অর্থ বিত্ত সম্পদও থাকে না; থাকে কেবল সারচিন্তা, সত্য তত্ত্ব, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সাধুচরিত্রপূর্ণ গ্রন্থ। প্রাচীন ইতিহাসদর্পণে মানব জাতির চেষ্টা সংগ্রাম উন্নতির গতি এবং তাহার সাফল্যের বিপুল গৌরব মহত্ত্ব কেমন সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়! যে সকল সম্রাট এবং সম্ভ্রান্ত মনুষ্যগণের কীর্ত্তিকলাপ এবং স্মৃতিচিহ্ন পর্য্যন্ত কালের কবলে কবলিত হইয়াছে, তাহাদের উজ্জ্বল ছবি আমরা গ্রন্থের মধ্যে কেবল দেখিতে পাই। বড় বড় মহাত্মাগণের জীবনলীলার চিহ্ন ঐ গ্রন্থ। সাধু মহাজনগণ অনন্তের বিশাল বক্ষে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় তাঁহার নিত্য সত্তার মধ্যে ফিরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ! সে তাঁহাদের দেবচরিত্রের মর্ত্ত্যলীলা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বহু জাতির, বহু বংশের, সুবহু যত্ন পরিশ্রম দেহপাতে উপার্জ্জিত প্রচুর জ্ঞানরত্নের ভাণ্ডার, ভবিষ্যদ্বংশের অনায়াসলভ্য মানসিক ভোজ্য পৈতৃক সম্পদ্ ঐ গ্রন্থ। এই জন্য বলিতেছি, যাহার যাহা কিছু সৎ আছে তাহা গ্রন্থের মধ্যে জাতীয় বিজাতীয় ভাষায় গদ্য পদ্যে লিখিত থাকুক। অর্থলোভে লুব্ধ হইয়া নহে, লোকরঞ্জন অসার প্রশংসার জন্যও নহে; অব্যক্ত প্রচ্ছন্ন অপরিবর্ত্তনীয় সত্যকে নিজ অবিকৃত স্বভাবের ভিতর দিয়া মূর্ত্তিমান আকারে অভিব্যক্ত করিয়া যাও! অর্থলোভী গ্রন্থকার, জানিও বিয়াল্লিশ বৎসর পরে তোমার গ্রন্থ সাধারণসম্পত্তি হইবে। প্রশংসাপ্রিয় কবি, মৃত্যুর পর তোমার কর্ণে প্রশংসাধ্বনি আর প্রবেশ করিবে না। পূর্ণগর্ভা নারী যেমন প্রসব করিয়া সুখী, সত্যশাস্ত্রপ্রণেতার পুরস্কার সেইরূপ।"

"তদনন্তর আমি সেই ঐতিহাসিক জনশূন্য অরণ্যানীর শান্তিপূর্ণ গাম্ভীর্য্যের মধ্যে বিলুপ্ত সমাধি স্থান, স্নানাগার, জলাশয়, অন্তঃপুর, বিলাসভবন, ভজনালয়, বিচারমন্দিরে পুরাকালের প্রেতাত্মাগণের জীবন্ত প্রতিমা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। সমাধিনিহিত জীর্ণ অস্থিরাশি কি শান্ত বিনম্র! সে দেহ নাই, মহাপ্রতাপশালী সম্রাটের সে ভ্রূকুটি তর্জ্জন গর্জ্জন নাই, সে মদগর্ব্বিত কঠোর কণ্ঠধ্বনি নাই, ধন মান দেহাভিমান নাই, বিনয়ে সে সমস্ত তৃণসম এবং মৃত্তিকাসাৎ। যে স্থানে পুরনারীগণ বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া রূপযৌবনসম্পন্ন স্ফীত বক্ষে সদর্পে পদ সঞ্চালন করিতেন, এবং নৃত্য গীত হাস্য কৌতুক মহোল্লাসে মাতিয়া বেড়াইতেন, তথায় এখন পুরাতন ইষ্টকের স্তূপ বন্যলতা পাদপে আবৃত হইয়া তাঁহাদের মিথ্যা

ছায়া বাজীর লীলার সাক্ষ্য দিতেছে। বামাকণ্ঠবিনিঃসৃত বিলাসরস-উদ্দীপক প্রেম সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে এখন তথায় শোকব্যঞ্জক ঝিল্লীরব, নিস্তব্ধতার গম্ভীর নীরব ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। আমি অপরিচিত পরিব্রাজক, অহো! আমার সমক্ষে অন্তঃপুররক্ষী শস্ত্রপাণি প্রহরিগণ লোহিত লোচনে আর কটাক্ষ পাত করিতেছে না। ষড় রিপুর উত্তেজনায় প্রতপ্ত মূর্ত্তিমান অহঙ্কার স্বরূপ রাজন্য এবং সচীববর্গের সে অহঙ্কার আস্ফালন দর্প নাই; মুখভঙ্গী তীব্র কটাক্ষ নাই; বুদ্ধি নাই বুদ্ধির কুমন্ত্রণাও নাই; লোভ এবং বাসনানলে প্রদীপ্ত সে হৃদয়ও নাই, তাহার কুটিল স্বার্থপরতাও নাই। দেহগুলি মাটিতে, আত্মাগুলি আকাশে মিশিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। এখন হিংস্র বন্য জন্তুগণ এখানকার রাজা, শৃগাল খেঁকশেয়ালীরা মন্ত্রী, পতঙ্গ বিহঙ্গগণ সহচর সহচরী, লতা পাদপ সকল রাজপ্রাসাদ। কালের প্রচণ্ড প্রতাপে, বিশাল যমদণ্ডাঘাতে মানবের সকল গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা নিত্য এবং অমর তাহা ইতিহাসে অঙ্কিত আছে এবং চিরদিন থাকিবে। রাজ্যের ঐশ্বর্য্য সমস্ত কতক রূপান্তর, কতক স্থানান্তর, আর সমুদায় হস্তান্তরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।”

“এই প্রাচীন রাজভবন রত্নগর্ভা। রাশি রাশি স্বর্ণ মুদ্রা ইহার অভ্যন্তরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি যখন গৌড় নগর হইতে অন্যত্র প্রস্থানের জন্য পথে আসিতেছিলাম, এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি কৃষক রাশীকৃত স্বর্ণমুদ্রা খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে, পুলিস তাহার সন্ধান পাইয়া ধরিয়াছে, পরে উভয়ে মিলিয়া সে গুলি ভাগাভাগি করিয়া লইতেছে। তাহারা কুটিল কটাক্ষে আমার পানে চাহিয়া এমনি একটা ভয়ানক ধমক দিল যে, আমি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দূরে প্রস্থান করিলাম। কিন্তু উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ সুবর্ণ মুদ্রাগুলি দেখিয়া তাহার এক অংশ আমারও পাইতে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। এত বৈরাগ্যের শিক্ষা, তথাপি কাঞ্চনের কি মহিয়সী শক্তি এবং আসক্তি!”

“প্রত্যাগমন কালে গভীর জঙ্গলে ঘেরা দুর্গম পথের মাঝে এক প্রকাণ্ড বাঘের সম্মুখে আমি পতিত হই। ভীষণ শার্দ্দূল পিঙ্গল বর্ণ দুইটী জ্বলন্ত চক্ষে আমার মুখপানে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া আস্তে আস্তে লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল। আমি নিতান্ত অজাশাবক নই যে সহজে তিনি আমাকে গিলিয়া ফেলিবেন। চেহারা খানাও জঙ্গুলে ফকীর গোছের, মরিবার কোন ভয়ও

নাই, অধিকন্তু অন্তরে প্রবল ইচ্ছাশক্তিও আছে। বাঘ যতই কেন বী হউন না, পশু বইত নহেন। আমিও তার চক্ষের দিকে স্থির দৃষ্টিতে খুব সাহসের সহিত চাহিয়া রহিলাম, এক বারও অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম না। খানিক পরে দেখি যে ভায়া চক্ষু দুটী সঙ্কুচিত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমে পাছে হাঁটিতেছেন। তখন সুযোগ বুঝিয়া আমি খুব জোরে একটা হুঙ্কার শব্দ করিলাম। সেই শব্দ শুনিয়া বাঘ লেজ তুলিয়া বার হাত উর্দ্ধে লম্ফ দিয়া একবারে বনমধ্যে পলায়ন করিল। তখন আমি নির্ভয়ে গুন্ গুন্ স্বরে, "আল্লা কি নাম সাচ্, আওর ঝুটা রে যতন।" এই গান গাইতে গাইতে আস্তে আস্তে বনপার হইয়া গ্রামান্তরে চলিয়া গেলাম।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে আত্মারামের ভ্রমণ বিবরণের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে ; সমস্ত বিস্তারিতরূপে লিখিতে গেলে গ্রন্থ বাহুল্য হইয়া পড়িবে। ইহার ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে ভৌগোলিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক তত্ত্বের এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার গভীর গবেষণার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এই জন্য পূর্ব্বেই আমরা বলিতেছি, দেশ দেশান্তরের সীমা এবং মানবসমাজ ও দৃশ্য পদার্থের বিস্তৃত বর্ণনা পাঠকগণ ইহাতে দেখিবার জন্য যেন বেশী আশা না করেন। প্রাচীন গৌড় নগর দেখিয়া তাঁহার মন যে সময় উৎসাহে অতিমাত্র প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছিল সেই অবস্থার কথা সকলে এক্ষণে শ্রবণ করুন।

"প্রত্নতত্ত্বের গভীরতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শেষ আমি আর ফিরিয়া আসিতে পারিলাম না। গৌড় নগর পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু মনের গতি অবিশ্রান্ত বেগে মোগল রাজত্বকাল হইতে হিন্দু রাজত্ব, তাহা হইতে বৌদ্ধযুগে, বৌদ্ধযুগ হইতে উপনিষৎ এবং বৈদিক যুগে আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন ক্ষেত্রে ধাবিত হইতে লাগিল। বর্ত্তমান দেখিয়া চিত্তের সন্তোষ জন্মে না, তাহার অভ্যন্তরে নিম্ন দেশে স্তরে স্তরে যুগে যুগে ভূত কালের বিচিত্র লীলা খেলা দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। অতঃপর পুরাকালের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমি বর্ত্তমান এক প্রকার ভুলিয়াই গেলাম। বর্ত্তমানের ভিতর ভূত এবং ভবিষ্যৎ একই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। যখন

পুরাতন রাজধানী দিল্লী নগরের ভগ্নাবশেষ চিহ্ন দেখি, তাহার ভিতর ভূত কালের আশ্চর্য্য শোভা সমৃদ্ধি জাগিয়া উঠে; আবার যখন নূতন দিল্লীর বিচিত্র সৌধমালা, বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশি নয়নপথে পতিত হয়, তখন তাহার পরিণাম রাশীকৃত ভগ্নগৃহ, স্তূপাকার ইষ্টক এবং প্রস্তরময় শ্মশান ভূমি দেখিতে পাই।"

"তদনন্তর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজপুতানা, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে যতই প্রাচীন কীর্ত্তি সকল দেখি, ততই পাগল মন আমার আরো যেন ভূত কালের ইতিহাস পার হইয়া অনৈতিহাসিক আদিম যুগের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দিকে ছুটিতে থাকে। বহু বহু যুগের ঐতিহাসিক চিত্র এক সময়ে চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে আমি কিছু ব্যস্ত এবং বিচঞ্চল হইয়া পড়িলাম; কিন্তু তাহাতে বড় আমোদ বোধ হইতে লাগিল। যত ভাবি ততই ভাবিবার বিষয় পাই। শেষ বিষয় ছাড়িয়া বিষয়ীর, সৃষ্টি ছাড়িয়া স্রষ্টার অসীম রাজ্যে গিয়া আত্মহারা হইলাম। তার পর কোন দিকে কূল কিনারা না পাইয়া, অনন্তের অনন্ত তত্ত্বের মহাসমুদ্রে পড়িয়া ভাবিলাম, কাজ কি আর তত্ত্বানুসন্ধানে? অসীম মহাসত্তার অভ্যন্তরে আপনাকে মিশাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই; আর ভাবিতে পারি না, বুঝিতেও কিছু চাহি না। যে বিষয়টা ধরি, তাহারই অন্তরালে দেখি অনন্ত। ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম পরমাণু কণারও শেষ নাই, আবার স্থূল হইতে স্থূল পদার্থেরও অন্ত পাই না। সর্ব্বত্র এক অনন্ত বর্ত্তমান, তাঁহার বিশাল বক্ষে সমুদ্রগর্ভস্থ কীটাণুর ন্যায় ভৌতিক সৃষ্টি উঠিতেছে, ভাসিতেছে, আবার কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে। যে পথে যে দিক দিয়া যাও, শেষ পড়িতে হয় অনন্তের অনন্ত সত্তার সাগরে। প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থ অনন্তের এক একটী ক্ষুদ্র দ্বার।

"ক্রমে আমি ভারতসীমা আর্য্যাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া সিন্ধুনদের পরপারে কাবুল রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম। ঘরে বসিয়া তোমরা আঙ্গুর পেস্তা বেদানা খাইয়াছ, কিন্তু টাট্‌কা ফল গাছ হইতে পাড়িয়া উহা কখন খাও নাই, এবং স্বচক্ষে ফলের সুন্দর বাগানও কখন দেখ নাই। কি চমৎকার মাটির গুণ! তথায় বসিয়া সুধারসপূর্ণ দ্রাক্ষাফল আমি স্বমুখে ভোজন করিয়াছি। পদ্মরাগ মণিহারের ন্যায় বেদানার কি মনোহর শোভা! দেখিতেও যেমন খাইতেও তেমনি! এই সকল উপাদেয় দেবভোগ্য ফল দর্শনে এবং ভোজনে হরিভক্তির উদয় হয়। আমার নির্ব্বাসিত কঠোর

হৃদয় ইহাতে কিঞ্চিৎ সরস হইয়াছিল। কিন্তু এ দেশের লোকের প্রকৃ
ফলের ঠিক বিপরীত। সেই একই মাটি, হায় কেন তাহারা সরস সুন্দ
মধুর স্বভাব পাইল না! কে বুঝিবে বিধাতার লীলা খেলা!"

"সুদূর পশ্চিমে আসিয়া আমাকে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে হইল। মাথ
বিবারের টুপি, গায়ে উষ্ট্র লোমের খিল্কা, পায়ে কাবুলী জুতা, স্কন্ধে চর্ম্ম
জলপাত্র এবং ঝুলি। সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার যে কত ঐশ্বর্য্য এবং বিচি
রচনা তাহা পুস্তক পড়িয়া জানা যায় না। নানা স্থানে প্রকৃতির শোভ
মানবগণের বিচিত্র মূর্ত্তি এবং আচার ব্যবহার দেখিয়া দেখিয়া আমার চি
যেন বিভ্রান্ত হইতে লাগিল। বিচার করিয়া বুঝিব, কি ভাবিব, তাহা
আর অবসর পাইলাম না। কিন্তু ইহাতে আমার হৃদয় আনন্দ ও বিস্ময়
রসে ক্রমে সরস এবং কোমল হইতে লাগিল। দুঃখ শোক বিচ্ছে
বেদনা সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। যত দেখি ততই উৎসাহ অনুরাগ আরো
যেন জ্বলিয়া উঠে। এইরূপে যাইতে যাইতে আরব দেশে মেক্কা তীর্থে গিয়া
উপস্থিত হইলাম। কাবা মন্দিরের সন্নিকটে যে প্রসিদ্ধ জম্ জম্ কূপ
আছে তাহার জল পান করিয়াছি। কিন্তু সে জলের মাহাত্ম্য যেমন, স্বাদ
সে রূপ নয়।"

"পথিকের জীবনের সঙ্গে গৃহবাসীর কিছুই মিলে না। এক স্থানে,
বিশেষতঃ প্রাচীরবেষ্টিত গৃহমধ্যে থাকিতে আর আমার ভাল লাগিত না।
পথ প্রান্তর, পর্ব্বতোপত্যকা, নদীতট, বৃক্ষতল, অরণ্য এই সব এখন যেন
ঘর বাড়ী। বনফল ভোজ্য, নির্ঝরবারি পানীয়, হস্তাঞ্জলি জলপাত্র, তৃণ
শয়নের শয্যা, পশু পক্ষীরা আত্মীয় সহচর, আকাশ ঘরের ছাদ, চারিটা
দিক্ মশারি, গণ্ড শৈলখণ্ড খাট, চন্দ্র সূর্য্য তারকা সকল দীপমালা, বনের
কুসুমাবলী ভগ্নী এবং পরিচারিকা, প্রমুক্ত সমীরণ ভাই এবং ভৃত্য। ইহা
ব্যতীত পথে পথে গ্রামে নগরে শত শত কুটুম্ব; সেখানে নানা বিধ আহার্য্য
প্রস্তুত। মনটা খুব দরাজ হইয়া গেল। প্রতি দিন প্রতি স্থানে নূতন
নূতন বন্ধু। মানুষে মানুষে যে মধুর সম্বন্ধ তাহা অপরিচিত নবীন বন্ধুর
সহিত ক্ষণিক ব্যবহারে বেশ সম্ভোগ করা যায়। প্রতি দিনই যেন কুটুম্ব
বাড়ীর নবানুরাগের আদর। সমস্ত মনুষ্যপরিবারকে এখন আমি এক বলিয়া
অনুভব করিতে লাগিলাম। কেহ আর পর রহিল না। মনে হইত, কতই
আমার মা বাপ! আর কতই আমার ভাই ভগ্নী!"

"এইরূপে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে এক জন ইংরাজ ভ্রমণকারীর সহিত আমার আলাপ এবং বন্ধুতা হয়; তাঁহার সঙ্গে এবং সাহায্যে আমি প্যালেষ্টাইন দেশে গ্যালিল, নেজারাথ, বেথলহাম প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করি। পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত জেনিসারেৎ হ্রদের নির্ম্মল স্বচ্ছ সলিলের মধ্যে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার ঐতিহাসিক ঘটনাসকল যেন এখনও প্রতিফলিত দেখিলাম। এই অঞ্চলের প্রত্যেক স্থানের মৃত্তিকা প্রস্তর খণ্ড, হ্রদ সমুদ্র নদী গিরিমালা মহামতি ঈশার পদচিহ্নে অলঙ্কৃত এবং পবিত্র হইয়া রহিয়াছে।"

"প্যালেষ্টাইনের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া আমরা জর্দ্দন নদীর ধারে ধারে জেরুশালম তীর্থে উপনীত হই। এ স্থান এক্ষণে মুসলমান সম্রাটের শাসনাধীন। জেরুশালম এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে গ্রীক এবং লাটিন খ্রীষ্টীয়ান সন্ন্যাসীদিগের অনেক গুলি আশ্রম আছে, তথায় আমরা অতিথিরূপে অবস্থান করিয়াছিলাম। আমাদের দেশে বৃন্দাবন কাশী শ্রীক্ষেত্রে যাত্রীরা যে ভাবে গমন করে, এখানে খ্রীষ্টীয়ান নর নারীরা সেই ভাবে আসে। জীবনে এক বার জেরুশালম দর্শন করিতেই হইবে। অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, পৌরহিত্যের প্রাদুর্ভাব এখানে যথেষ্ট প্রচলিত আছে। এইরূপ কিম্বদন্তী যে, যেখানে যিশুর সমাধি হয় তাহার উপরি ভাগে তীর্থের প্রধান ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত। আমরা যে সময় তথায় উপস্থিত হই তখন যিশুর পুনরুত্থানোৎসব। অর্থাৎ গুড্ ফ্রাইডের উৎসবের সময়। এই পর্ব্ব উপলক্ষে অনেক খ্রীষ্টীয়ান নগরমধ্যে সমবেত হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখ ভাগে লোকের মহাজনতা; নানা বিধ পণ্য দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ তামাসা দেখিয়া বেড়াইতেছে, কেহ ভিক্ষা মাগিতেছে। আমরা মন্দিরে পৌঁছিয়া দেখিলাম, গ্রীস রোম এবং আর্মানি চার্চ্চের খ্রীষ্টবাদীরা নানা প্রকার মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পূজানুষ্ঠান করিতেছে। এবং যিশুর লীলাস্থান সকল দেখিয়া কোথাও দারুখণ্ড আলিঙ্গন, কোথায়ও বা মৃত্তিকা প্রস্তর চুম্বন করিতেছে। জনসাধারণের ভক্তি প্রকাশের বাহ্যক্রিয়া সর্ব্ব দেশেই এক রূপ, তাহাতে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না।"

"যিশুর পবিত্র সমাধি এখন আর গলগথার প্রমুক্ত প্রান্তরমধ্যে নগরের বহির্ভাগে নহে; ইহা এক্ষণে প্রাচীরবেষ্টিত ছাদাচ্ছাদিত দিব্য এক ভজনালয়ের মধ্যগত, এবং আধুনিক জেরুশালমের মধ্য ভাগে প্রতিষ্ঠিত তীর্থমন্দির

স্বরূপ। সমাধির অর্দ্ধভাগ মৃত্তিকানিহিত অদৃশ্য, অপরার্দ্ধ উপরি ভা
দৃশ্যমান। সিঁড়ির উপর উঠিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়; তন্ম
পবিত্র বেদিকা, তাহাতে জ্বলন্ত দীপ-মালা। ইহার আরো কিছু উর্দ্ধভা
কাল্‌ভেরী পর্ব্বত, তদুপরি স্বর্ণ পাত্রাধারে বিশু এবং তাঁহার সহমৃত চো
দ্বয়ের ক্রুশ নিবদ্ধ। এ সমস্তই আধুনিক। পুরোহিতগণ এই সকল স্মর
চিহ্ন দেখাইয়া যাত্রীদিগের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে
এবং তজ্জন্য তুরস্কের মুসলমান সম্রাটকে কর দিতে হয়। যিশুর শেষ দশ
যে কয়টী হৃদয়বিদারক ঘটনা বাইবেলে বর্ণিত আছে, সেই ঘটনার স্মর
স্থান গুলি উক্ত মন্দিরমধ্যে একত্র সন্নিবিষ্ট দেখিলাম। তোমার ঠিক দক্ষি
দিকে তিনি বন্দীর ন্যায় দাঁড়াইয়া কাঁদিয়াছিলেন, বাম পার্শ্বের থামে
নিকট তাঁহাকে ঘাতকেরা কোড়া মারিয়াছিল, সম্মুখস্থ স্থানে তাঁহার মাথা
কাঁটার মুকুট পরাইয়া দিয়াছিল, উপরি ভাগে তিনি ক্রুশবিদ্ধ এবং নিম্ন দেশে
সমাধিনিহিত হন। যেখানে পিটারের অস্বীকার করিবার পূর্ব্বে তিন বার
মুর্গি ডাকিয়াছিল তথায় এখন আর্মানি খ্রীষ্টীয়ানদিগের এক মঠ প্রতিষ্ঠিত
আছে। প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ানেরা এ সকলকে ঘৃণা করে। রোমীয় সম্রাট
কনষ্টেণ্টাইনের মাতা রাজ্ঞী হেলেনা ঈশার স্বর্গারোহণের বহু শতাব্দী পরে
বহু চেষ্টায় তৎকালপ্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে ঐ সকল স্মরণীয় স্থান নির্ণয়
করিয়া লইয়াছিলেন। এখন যাহা কিছু এখানে পুরাতন চিহ্ন বলিয়া গৃহীত
হয় সমস্তই কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর। পর্ব্বোপলক্ষে যে সকল যাত্রী এখানে
আসে তাহাদিগকে পুরোহিতেরা একটী আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া
থাকেন। বিশুর সমাধির দুই দিক হইতে দুইটী অগ্নিশিখা বাহির হয়,
তাহাতে মশাল ধরাইবার জন্য লোকেরা মহা ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। শেষ
তাহাদের পেষণে এবং ঘর্ষণে অনেক হত এবং আহত হয়।"

"জুডিয়া দেশ হইতে আমরা আরবের বিস্তীর্ণ মরুভূমি পার হইয়া মিশর
দেশে কায়রো এবং আলেক্‌জেণ্ডারিয়া প্রভৃতি স্থানে গমন করি। এখানে
উষ্ট্রারোহণ ভিন্ন গমনাগমনের আর অন্য উপায় নাই। পানীয় জল এবং
আহার্য্য সঙ্গে লইয়া এই জনশূন্য দিগন্তব্যাপী মহামরুপথে গমন করিতে হয়।
মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে যখন চারি দিকে অগ্নি বায়ু বহিতে থাকে,
প্রত্যেক বালুকণা অগ্নিকণার ন্যায় জ্বলিয়া উঠে, তখন আকাশ, ভূতল সর্ব্বত্র
এক অগাধ অনন্ত অনলসমুদ্রের মূর্ত্তি ধারণ করে। সেখানে তপনের কি জ্বলন্ত

প্রভাব! যেন একটী আগ্নেয় গোলক মেদিনীকে দগ্ধ করিতে করিতে আকাশ পথে চলিয়া যায়। আমি সেই উত্তপ্ত বালুকায় ভুট্টা এবং আলু পোড়াইয়া খাইয়াছি। কেবলই বালুকারাশি। যেন বালুকার মহা সমুদ্র, একটী তৃণ কণাও সেখানে নয়নগোচর হয় না। মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড বালুকার পর্ব্বতমালা। সময় সময় প্রবল বায়ু তাড়নে ঐ সকল বালুকা উড্ডীয়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নি বর্ষণ করিতে থাকে। তখন সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় উহার অবস্থা হয়। কিন্তু বলিহারী উষ্ট্রের সহিষ্ণুতা এবং বুদ্ধিচাতুর্য্য! তথায় নির্দ্দিষ্ট কোন পথের চিহ্ন নাই, স্থানের অন্ত নাই, উষ্ট্র কেবল আপনার জাতীয় অভ্রান্ত সংস্কারানুসারে গম্য স্থানের অভিমুখে গমন করে। মরুভূমির মরিচীকা এক মনোহর দৃশ্য। ভ্রমণকারীদিগকে ইহা মহাভ্রমে পাতিত করে। শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের সম্মুখে হঠাৎ লতা পাদপশোভিত সরোবর, শ্যামল কান্তি তৃণ গুল্মসমাকীর্ণ গ্রাম নগর প্রান্তর এবং রমণীয় জলাশয়ের প্রতিরূপ প্রকাশিত হয়। যতই নিকটে অগ্রসর হইবে, ততই দেখিবে ফক্কিকার। পরিশেষে একবারে অন্তর্দ্ধান। রাত্রিকালে এখানকার আকাশের শোভাও অতিশয় নয়নরঞ্জন। বিন্দুমাত্র ছায়া কুয়াশা কিম্বা মেঘাবরণ তথায় তিষ্ঠিতে পারে না। ইহা বিধাতার কি এক আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। শত শত যোজন পথ অতিক্রম না করিলে আর লোকালয় জলাশয় উদ্ভিদ্ দৃষ্টিগোচর হয় না। কায়রো নগরে পৌছিয়া আমাদের দগ্ধ চক্ষু উদ্ভিদ্ এবং নীলনদের শীতল জল দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইল। এই সুবিখ্যাত নীলনদের পরপারে ইজিপ্টের প্রসিদ্ধ গগনস্পর্শী পিরামিড দেখিয়াছিলাম। ইহা তদ্দেশীয় প্রাচীন রাজন্যবর্গের সমাধিস্তম্ভ ভিন্ন আর কিছুই নহে; নিম্ন ভাগে শবদেহ প্রোথিত, উপরে মহোচ্চ স্তম্ভ।”

“এই সকল স্থানের লোকচরিত্রের কথা আর কি বলিব। আরবদিগের আতিথেয়তা পুরাণপ্রসিদ্ধ কথা, আবার ইহারা সহজে পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বধ করে। কিন্তু ব্রিটিশ জাতির কি বিপুল প্রভাব! ইংরাজের নামে ভয়ে সকলে তটস্থ। আমি ইংরাজ ভ্রমণকারীর সঙ্গ না ধরিলে এ দেশে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতাম না। এক দিনের একটী বিপদের কথা বলি তবে শুন।”

“মরুপথে দেশের ব্যবধান বুঝা যায় না। দিবসের পর দিবস একই অবস্থা। আমার ইংরাজ বন্ধু এক দিন আমাকে বলিলেন, রোজ রোজ আর

উটের উপর নাচিতে পারি না, আজ পদব্রজে খানিক গমন করিব।” এই বলিয়া আমার হস্তে কুলি মজুরদিগের ভার দিয়া কতিপয় অনুচরসঙ্গে তিনি অগ্রগামী হইলেন। মরুরাজ্যে উষ্ট্রেরাই পথ চিনিতে পারে। সাহেব পথ হারাইয়া কোন্ দিকে গেলেন আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। বেলাও প্রায় ক্রমে শেষ হইয়া আসিল। আমার সঙ্গে কতকগুলি আরব কুলি। সাহেবের অনুপস্থিতিতে প্রশ্রয় পাইয়া তাহারা কি সব কাণাকাণি করিতে লাগিল। কটা কটা চোখ, তাম্রবর্ণ শরীর, কাঠ পাথরের মত শক্ত শক্ত চেহারা; তাহাদের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া আমার কিছু সন্দেহ হইল। কিন্তু কি করি, তাহাদের হাতেই এখন আমার প্রাণ। সাহেবের অদর্শনে আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। ওদিকে আরবেরা আমার মুখপানে কট মট করিয়া চাহিয়া কি সব কথা কয়, বুঝিতে পারি না। একে কাঠ খোট্টার জাত, তাহাতে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, বড়ই বিপদ উপস্থিত হইল। কেহ আর যাইতে চাহে না। শেষ এক জায়গায় বসিয়া আমার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। ভাব গতি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম, ইহারা আমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতেছে। সাহেবের অন্যান্য লোক জন সমস্ত অগ্রে গিয়াছে। আমি তাহাদিগকে লইয়া মাঠের মাঝে পড়িয়া রহিলাম। জীবনের প্রতি যদি পূর্ব্বের মত তেমন মায়া মমতা থাকিত, তাহা হইলে হয়ত কাঁদিয়া তাহাদের পায়ে ধরিতাম। ভাবিলাম, মারে মারুক, তবে দেশ ভ্রমণটা হইল না, এই যা দুঃখ। আমাকে ঠাণ্ডা মেজাজে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা ক্রমে আমাকে দড়ি দিয়া বাঁধিতে লাগিল। আমি তাহাদের জোরেও পারিব না, কথা বলিলেও কেহ বুঝিবে না; কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম। আমার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিল। তার পর সকলে মিলিয়া বালি খুঁড়িয়া প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত করিল। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, ‘কর ব্যাটারা, তোদের মনে যা আছে তাই কর; এখানে আর আমার মা বল্‌তেও নাই, বাপ বল্‌তেও নাই।’ শুয়ে পড়ে চেয়ে চেয়ে সব দেখছি, আর ভাবছি, সাহেব কোথায় গেল। অন্তিম কাল নিকটস্থ জেনে ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া ভগবানের উদ্দেশে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলাম। তার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম। তখন আরবেরা আমাকে ধরা ধরি করিয়া সেই বালির গর্ত্তে ফেলিয়া বালি চাপা দিতে লাগিল। প্রায় দফা শেষ করিয়া

আনিয়াছে, এমন সময় অনতি দূরে সঙ্গিগণসহ সাহেব হঠাৎ দেখা দিলেন। আর মিনিট দুই বিলম্ব হইলে আমার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইত। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তাহারা পলাইয়া গেল। সাহেব তাড়া তাড়ি দৌড়িয়া নিকটে আসিয়া বালি খুড়িয়া আমাকে তুলিলেন, হস্ত পদের বাঁধন খুলিয়া চোখে মুখে জল দিলেন। প্রায় মরিয়া গিয়াছিলাম, বুকের ভিতর প্রাণটা কেবল ধুক ধুক করিতেছিল। শেষ ব্র্যাণ্ডি পানি, দুধ খাওয়াইয়া সাহেব আমাকে বাঁচাইয়া তুলিলেন। যেখানে অন্য কোন প্রকার শাসন কার্য্যকারী হয় না, সেখানে ভয় দ্বারা শান্তি রক্ষা হয়। নির্দ্দয় হিংস্র আরবদিগকে শাসনে রাখিবার জন্যই যেন বিধাতা ব্রিটিশভয় সৃষ্টি করিয়াছেন।"

"অতঃপর মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচিয়া ইংরাজ বন্ধুর সহিত আমি ইংলণ্ডে গমন করি। সাহেব আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, তিনি তথাকার অনেক বড় লোকের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দেন। কয়েক মাস ইংলণ্ডে থাকিয়া তার পরে আমি একাকী জর্ম্মণি ইটালী ফ্রান্স রোম প্রভৃতি স্থানে যাই। কয়েকটী স্থানে বড় লোকদিগের বাড়ীতে ভাণ্ডারী অর্থাৎ ষ্টুয়াটের কাজ করিয়াছিলাম। ইহাতে ঐ অঞ্চলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের চরিত্রের গুণাগুণ অনেক টের পাইয়াছি। তদনন্তর যখন আমি পুনর্ব্বার লণ্ডন নগরে আসিয়া উপনীত হই, সেই সময় এক দল সমুদ্রযাত্রী উত্তর-কেন্দ্রাভিমুখে অনন্ত তুষার রাজ্যের শেষ সীমা আবিষ্কারের জন্য বহির্গত হইতেছিলেন। কাপ্তেন রস্ এবং প্যারী দুই জাহাজের দুই প্রধান নাবিক। দুই বৎসরের আহার্য্য সামগ্রী এবং শীতোপযোগী বস্ত্রাদি উহাতে সংগৃহীত ছিল। আমার সঙ্গী ভ্রমণকারী বন্ধু কাপ্তেন রসের সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দেন। আমার সাহস অনুরাগ দেখিয়া কাপ্তেন সাহেব বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং জল মাপের কাজে আমাকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এ কার্য্যটী আমার পক্ষে বেশ উপযোগী হইয়াছিল। জল মাপিতাম আর নানা স্থানের বিচিত্র অভূতপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতাম। সমুদ্র এক প্রকাণ্ড রাজ্য; বাস্তবিক ইহা রত্নাকর। তোমরা গৃহবাসী বাঙ্গালী, কল্পনাতেও ইহার ভাব মনে ধারণ করিতে পারিবে না। স্কটল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে অতিক্রম করিয়া গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের উপকূলে যে সময় আমরা পৌছিলাম, তখন গ্রীষ্মকাল, তথাপি প্রচুর বরফ রাশিতে চারিদিক আচ্ছন্ন। দেখিতে দেখিতে অনন্ত ঘননীল জলরাশি ক্রমে

শুভ্র সুন্দর তুষার খণ্ডে খচিত এবং আবৃত হইল। সেই শ্বেতকান্তি হিমানি রাশির উপর সূর্য্যকিরণ নিপতিত হইয়া এমনি শুভ্র উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করে যে সে দিকে চাওয়া যায় না। চক্ষু যেন অন্ধ হইয়া আইসে। বরফাবৃত সমুদ্রবক্ষে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাস আরো চমৎকার দৃশ্য। নিম্নভাগে তুষাররাশি, উপরে অগ্ন্যুদ্গমে।"

"গ্রীষ্মপ্রধান মণ্ডলে তোমাদের বাস, বরফের বিচিত্র রচনা তোমরা কিছুই জান না; ইহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রকার নাম রূপ আছে। দিগন্তপরিব্যাপ্ত প্রশান্ত অনন্ত জলধিবক্ষ, তাহার যে দিকে দৃষ্টি প্রসারিত হয়, কেবলই তুষাররাশি; মনে কর কি আশ্চর্য্য রমণীয় সে দৃশ্য। কোথায় জল, কোথায় স্থল তাহার প্রভেদ বুঝা যায় না। কোথায় প্রকৃত শৈলমালা কোথায় বা তুষারগিরিশৃঙ্গ তাহাও বুঝা যায় না। ঐ সকল দৃশ্য বিচিত্র রবিকিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া নয়নের সম্মুখে এক অপূর্ব্ব দিব্যধামের মনোহর ছবি প্রকাশ করে। এমন সকল বিস্তীর্ণ তুষার ক্ষেত্র আছে যেখানে একটী তৃণকণাও নাই, উদ্ভিদের কোন চিহ্ন সেখানে দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবলই বরফ, বরফ, বরফ; বরফ ছাড়া কিছু নাই। যাহা কিছু পশু পক্ষী দেখা যায়, তাহাও শ্বেত তুষার বর্ণ; শাদা ভিন্ন অন্য বর্ণ নাই।"

"গ্রীষ্মের প্রারম্ভে সূর্য্যতাপে যখন ঐ সকল হিমগিরি মালা গলিতে থাকে, তখন ভয়ঙ্কর শব্দে দিঙ্মণ্ডল আন্দোলিত হয়। হুড় হুড় দুড় দুড় শব্দে বরফের চাঁই ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কতকাংশ ভীষণ জলস্রোতে পরিণত হইয়া অবশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফ খণ্ডকে ভীমবেগে দিগ্দিগন্তে ভাসাইয়া লইয়া যায়। তাহার দুর্জ্জয় পেষণে বড় বড় জাহাজও জীর্ণ ভগ্ন অবশেষে জলমগ্ন হয়। আকাশে বরফ বৃষ্টি, জলে স্থলে গণ্ডশৈল সদৃশ বরফ খণ্ডের উত্থান পতন ভগ্ন বিচরণ অতীব ভয়ঙ্কর দৃশ্য। তৎকালে প্রত্যেক বায়ুকণা হিমানিসিক্ত বোধ হয়। সমস্ত আকাশ, ধরণী, জলধিবক্ষ যেন অনন্ত হিমানিতে আবৃত। কোথাও কঠিন শিলা সদৃশ, কোথাও উচ্চ পর্ব্বতমালার ন্যায়; আবার কোথাও অগণ্য অযুত সূচিশলাকার ন্যায় দিক ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। কখন উহা নীল বর্ণে রঞ্জিত হইয়া নীলকান্ত মণির ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে।"

"এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে অদৃষ্টপূর্ব্ব বহু বিধ পশু পক্ষী উদ্ভিদও দৃষ্ট

হয়। দলে দলে তিমি, সিন্ধুঘোটক, তৈলাক্ত মৎস্য বরফাবৃত জলতলে খেলিয়া বেড়ায়। উপকূলে মধ্যে মধ্যে ইকুইমো নামে এক প্রকার অসভ্য জাতির বাসস্থান আছে। ইহারা বরফের প্রস্তর খণ্ড কাটিয়া তদ্দ্বারা সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করে। তাহার নিম্নে বল্‌গা হরিণের চর্ম্মাবৃত বরফের বেঞ্চের উপর উহারা উপবেশন করিয়া থাকে। ভিতরে মাচের তেলের দীপ জ্বালিয়া রাখে, তাহার আলোক এবং উত্তাপে রন্ধন কার্য্য সমাধা হয়। মৃগয়া দ্বারা আহার সংগ্রহ আর নিদ্রা ভিন্ন উহাদের অন্য কোন কাজ নাই। তেল, চর্ব্বি প্রচুর পরিমাণে খাইয়া ইহারা জীর্ণ করিতে পারে। সকলে মিলিয়া মৎস্য এবং পশু পক্ষী বধ করত এক সঙ্গে সমানাংশে তাহা বিভাগ করিয়া খায়। আতিথেয়তা, সত্যপ্রিয়তা এবং সরলতা ইহাদের স্বাভাবিক গুণ। ধর্ম্মভাব, সাধারণ নীতিও আছে। স্ত্রীলোকের বহুস্বামী গ্রহণ প্রথাকে ইহারা দোষ মনে করে না।”

“পৃথিবীর এই অংশে নয় মাস রাত্রি আর অবশিষ্ট সময় দিন। ভূতলে যেমন বরফের আশ্চর্য্য বিচিত্র দৃশ্য, গগনে তেমনি ঐ দীর্ঘকালব্যাপী শীতকালে উল্কাপিণ্ডের আলোকমালা। মুহুর্মুহু উল্কা পতিত হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম আকাশ মণ্ডলকে সমুজ্জ্বলিত করিয়া রাখে। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। সময়ে সময়ে আকাশ এমনি স্বচ্ছভাব ধারণ করে, যে তাহাতে দুই তিনটি সূর্য্য এক সঙ্গে নয়নগোচর হয়। সমুদ্রস্থ পোতগুলি তদুপরি প্রতিবিম্বিত হইয়া বিপরীত ভাবে তাহার ছবি অঙ্কিত করে। সূর্য্যের আলোক চন্দ্রের ন্যায় উত্তাপবিহীন। আহা! স্বভাবের কারুকার্য্য কি অপূর্ব্ব মনোহর! রবিকিরণরঞ্জিত হিমানিরাশি দ্বারা অতি আশ্চর্য্য রাজপ্রাসাদ, নগর, দুর্গ বিনির্ম্মিত হয়। বিধাতার কত কীর্ত্তি কত স্থানে যে দেখিলাম তাহা আর কি বলিব। এই উপলক্ষে আমার রুশিয়া রাজ্যও দেখা হইয়াছে। রুশিয়া জাতি খুব বলবান বটে, কিন্তু এখনও অধিক সভ্য হইতে পারে নাই। আমার নূতন রকম বেশ ভূষা, অদ্ভুত চেহারা দেখিয়া রাজধানীর কোন এক পুলিস কর্ম্মচারী আমাকে ধরিয়া লইয়া হাজতে দেয়; তদনন্তর স্পাই মনে করিয়া মারিয়া ফেলিবার যোগাড় করিয়াছিল; শেষ জনৈক পাদ্রির সাহায্যে সে যাত্রা আমি রক্ষা পাই।”

“আমাদের জাহাজের কাপ্তেন দ্বয় যখন স্বদেশপ্রত্যাগমনোন্মুখ হইলেন, তখন আমি তাঁদের সঙ্গে না ফিরিয়া উত্তর আমেরিকার উত্তর সমুদ্রের উপ-

কূলে নামিয়া পড়িলাম। তথা হইতে নূতন পৃথিবীর নানা স্থান ভ্রমণপূর্ব্বক প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া স্যাঙ্ক্রান্সিস্কো ইকোহামা জেপান চায়না সিঙ্গা-পুর হইয়া দ্বাদশ বৎসর পরে পুনরায় দেশে ফিরিয়া আসি। নবযৌবন-পূর্ণ নূতন মহাদেশ আমেরিকার প্রাকৃতিক অদ্ভুত দৃশ্য এবং মানবোন্নতির অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন সকল দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। চারি শত বৎসরের মধ্যে এই অজ্ঞাত অপরিচিত অরণ্যময় মহাদেশকে ইহারা স্বর্ণ ভূমি করিয়া তুলিয়াছে। নায়গেরার জলপ্রপাত যেমন অনন্ত দেবের এক মহাশক্তির খেলা, আমেরিকান মিশ্র জাতির অদ্ভুত উন্নতি সভ্যতা তেমনি তাঁহারই মহাশক্তির এক প্রভূত উচ্ছ্বাস। ইয়োরোপ আফ্রিকার বিভিন্ন শ্বেত কৃষ্ণ লোহিত জাতি এক জাতিতে পরিণত হইয়া স্বাধীনভাবে ঐক্য বন্ধনে ইহারা সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। স্বাধীনতা স্বতন্ত্রতার সহিত একতার এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। এই উন্নতিশীল নব্য জাতির ভিতর যে এক জ্বলন্ত দৈবশক্তি মহাবেগে বিঘূর্ণিত হইতেছে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। হাজার হাজার ক্রোশ রেলের পথ চলিয়াছে তাহার আর যেন শেষ নাই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্ণবপোত দ্বারা বিশাল সমুদ্রবক্ষ আচ্ছন্ন, গণিয়া তাহার সংখ্যা করা যায় না। শত শত যোজন বিস্তীর্ণ পতিত অরণ্য ভূমি, বহুদূরব্যাপিনী বেগবতী নদী, সুদূর প্রসারিত গভীর হ্রদ, অত্যুচ্চ হিমাদ্রি শিখর, সকলই মহাকাণ্ড। এ সকল দেখিলে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মন উদার হয়।”

“ইহারা বিষয় বাণিজ্য, রাজশাসন, সামাজিক উন্নতি পারিবারিক শৃঙ্খলা এবং জ্ঞানোৎকর্ষ সাধনে দিবা নিশি যেন উন্মত্ত। ধর্ম্ম ইহার আনু-ষঙ্গিক ফল। বিষয় বিত্ত, অর্থ সামর্থ্য, সুখ স্বাস্থ্য, ভোগ বিলাস ইত্যাদি পার্থিব সৌভাগ্যের উন্নতি অবনতির পরিমাণ ধরিয়া এখানে ধর্ম্মের উন্নতি অবনতি পরিগণিত হয়। সুখ দুঃখ, হীনতা মহত্ব, আত্মগ্লানি আত্মপ্রসাদ, ধার্ম্মিকতা অসাধুতা বৈষয়িক সম্পদের হ্রাস বৃদ্ধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কি ইয়োরোপ কি আমেরিকা, সর্ব্বত্রই দেখিলাম, পাপ অধর্ম্মের জন্য যে একটা অনুতাপ, কিম্বা প্রেম ভক্তি বিনয় বিশ্বাস শান্তি পুণ্যের অভাবে আক্ষেপ অনুশোচনা তাহা নাই। সংসার অসার, দেহ অনিত্য, বিষয় বিভব মায়ামরীচি সদৃশ ক্ষণস্থায়ী, এই ভাবিয়া নিত্য বস্তু অমরত্ব লাভের জন্য কেহ যে ব্যাকুল কিম্বা অনুতপ্ত তাহাও নহে। ইহাদের আর এক

প্রকারের নূতন বিধ বৈরাগ্য, অনুতাপ আছে। হায়! আমি বড় বাড়ী গাড়ী যুড়ি করিতে পারিলাম না, আমার যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হইল না, এ অবস্থায় আমার না জন্মানই ভাল ছিল। হায়! আমি আমার স্ত্রীকে হীরার গহনা দিতে পারি নাই, ছেলেরা আমার এখনো সামান্য জুতা পোষাক পরিয়া রহিয়াছে, বড় বড় উপাধি সম্মানের মধ্যে একটাও আমার ভাগ্যে ঘটিল না। হায়! আমার ড্রইং রুমে ভাল কার্পেট নাই, স্ত্রীকে আমি সোণার খাটে, পালঙ্কের গদিতে শোয়াইতে পারিলাম না, আমি কি দুর্ভাগ্য মন্দমতি নরাধম! এত দিনে একটা ভাল বৈঠকখানা আমার হইল না! এইরূপে তাহারা অনুতাপ করে এবং এই জন্যই তাহাদের মহা বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। কেহ কেহ এ জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনাও করে।"

"বহু বিবাহকারী মর্ম্মণ কুলীনদিগের স°টলেকসিটি এক বড় তামাসার জায়গা। তাহারা মরু ভূমিকে সুন্দর কাম্যবনে পরিণত করিয়া স্বাধীনভাবে তাহাতে রাজত্ব করিতেছে। মর্ম্মণদিগের এক এক জনের পাঁচ সাত দশটা স্ত্রী। যিনি প্রথমা তিনি স্বামীর স্বর্গভাগিনী এবং গৃহের কর্ত্রী। অবশিষ্ট যাহারা তাহারাও ক্রমে স্বর্গভাগিনী হইবে এই বিশ্বাস করে। আমি অল্প কাল মাত্র তথায় ছিলাম, তাহারই মধ্যে চারি পাঁচটি পাত্রী আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহারা বলিল, তোমাকে কোন ভার বহন করিতে হইবে না, আমরাই তোমাকে প্রতিপালন করিব; তুমি আমাদিগের সহিত উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ হও, নতুবা আমাদের স্বর্গপ্রাপ্তির আর কোন আশা নাই। মহা বিপদ দেখিয়া আমি বলিলাম, "না বাছা, আমার দ্বারা সে কাজ হবে না; বরং উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব, কিন্তু উদ্বাহশৃঙ্খল আর গলায় পরিব না। একটার জ্বালায় প্রাণ অস্থির, আবার পাঁচটা সাতটা!" এই বলিয়া ষ্টেসেনের দিকে দ্রুতপদে চলিয়া আসিলাম; তথাপি দুই পাঁচটা পাত্রী আমার পাছে পাছে সে পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছিল। তদনন্তর ভদ্র বেশ ছাড়িয়া আমি পুনর্ব্বার মোসাফের ফকিরী বেশ ধরি; কেন না, ভদ্র সমাজে সভ্যজাতির যাহা কিছু দেখিবার তাহা ইতঃপূর্ব্বেই দেখা শেষ হইয়া গিয়াছিল। যাহাতে কেহ আর আমায় বিবাহ করিতে না চায় তাহাই করিতে হইল।"

তৃতীয় অধ্যায়

আত্মারামের ভ্রমণবৃত্তান্ত অতীব মনোহর, সমস্ত বিস্তারিত করিয়া তাহা আমরা লিখিতে পারিলাম না। ফলতঃ পৃথিবীর যত কিছু আশ্চর্য্য দৃশ্য তাহা তিনি দেখিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, যে জাতিকে আমরা দেবতা স্বরূপ, এবং যে সকল দেশকে স্বর্গলোক মনে করি, তাহা দেখিয়াও তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বরং তাহাদিগকে অসার ক্ষণভঙ্গুর বাহ্যদর্শী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার মত যদি সাহস পরাক্রম থাকিত, এবং যেরূপ সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল, তুমি আমি হইলে দুই একটা পাস করিয়া খেতাব লইয়াও আসিতে পারিতাম, একটা মেম বিবাহ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া দেশে আনিতেও পারিতাম। ভায়া আমাদের এ সব কিছুই করেন নাই, যে উদ্ভট সেই উদ্ভট; কতকগুল কাঁথা কম্বল গায়, আর চুল দাড়ি মুখে, অদ্ভুত মূর্ত্তি সাজিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এক্ষণে ইয়োরোপ ও আমেরিকার আদর্শ সুসভ্য জাতির বিষয়ে তাঁহার অভিনব মন্তব্য সকলে শ্রবণ করুন।

"আমি এই সমস্ত দেশ মহাদেশে যাহা কিছু উন্নতির চিহ্ন দেখিলাম, তাহাতে ব্রহ্মশক্তিরই বিকাশ দেখিলাম, কিন্তু ইহাও বাহ্য; আরো অনেক আগে যাইতে হইবে। অধ্যবসায়শক্তি, দৈহিক স্বাবলম্বনশক্তি, পার্থিবভোগাসক্তি, বাহ্যৈশ্বর্য্যআবিষ্কার প্রবৃত্তি এবং অধিকারশক্তি ইহাদের মধ্যে অতিশয় প্রবল। যে জন্য তোমরা এ দেশে সচরাচর লালায়িত হইয়া কুক্কুরের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, সে বিষয়ে এখানে চূড়ান্ত দেখিতে পাইবে। অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে সভ্যজাতি চরমসীমায় উঠিয়াছে বলিলেও বলা যায়। পার্থিব জীবনচক্র যে বৃত্তরেখায় চিরদিন ঘুরিবে তাহা প্রায় এক প্রকার এখানে নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রিয়সুখরাজ্যের চরমসীমা আবিষ্কৃত এবং নিরূপিত হইয়াছে। মনুষ্যের মনুষ্যত্বের শেষ পুরস্কার কি, যদি দেখিতে চাও, তবে ঐ সকল দেশে গিয়া দেখ'। সভ্যতার বিচিত্র লীলাবিলাস আমি দেখিলাম; কিন্তু তাহা দেখিয়া আমি এই জন্য সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না যে, সে সমস্ত কেবল দৈহিকশক্তি এবং দেহপোষণোপযোগী বুদ্ধিশক্তি ও শিল্পশক্তির নিদর্শন; অমর মানবাত্মার অপর অঙ্গের বিকাশ তাহাতে অতি অল্প।

উদর পূরিয়া খাইতেছে, ভূতের মত খাটিতেছে, আর পূর্ণমাত্রায় ইন্দ্রিয়সুখ বিলাস চরিতার্থ করিতেছে; তাহার আনুষঙ্গিক ফল বস্তুতত্ত্বের ভূরি আবিষ্কার, বাহুবল, রাজশাসনকৌশল, আর যন্ত্রবৎ কার্য্যশৃঙ্খলা।"

"কিন্তু ইহার শেষ ফল কি? ইহা দ্বারা জীবনের মূল প্রশ্নের কি কিছু মীমাংসা হইল? আত্মার গভীর স্থান হইতে উত্তর আসিতেছে, 'না! প্রকৃতির সামঞ্জস্য হয় নাই।' অধিকার অনুসারে স্ব স্ব অবস্থায় নিবদ্ধ থাকিয়া জীব সকল শান্তি সন্তোষ এখনও ভোগ করিতে পারিতেছে না। ঠেলা ঠেলি, হুটো পুটি, কাড়াকাড়ি, টানাটানি, মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা নিন্দা, ক্রোধ লোভ ইত্যাদি পাশব কার্য্য এবং কুপ্রবৃত্তির বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা গেল। স্বাধীন জাতির যথার্থ স্বাধীনতা কোথায়? ভগবানের ভৌতিক ঐশ্বর্য্যের শ্রী সৌন্দর্য্যের উন্নতি, কার্য্যকৌশল অতীব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ মাঠের স্থলপদ্ম, এবং আকাশের পক্ষীগুলির তুলনায় তাহা কি অধিক রমণীয়? সভ্যজাতির চরম উদ্দেশ্যের ভিতর প্রবেশ করিয়া যাহা বুঝিলাম, বলিতেছি শ্রবণ কর।"

"সভ্য সমাজের গতি স্বভাবকে কর্ষণ করিয়া শেষ তাহাকে অতিক্রম করিতে চায়। রত্নগর্ভা প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধনই প্রকৃত সভ্যতার লক্ষ্য, কিন্তু ইহারা তাহা না করিয়া নূতনরূপে এক কৃত্রিম জগৎ সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং ঠাকুর গড়িতে গিয়া হনুমান গড়িয়া ফেলিয়াছে। ইয়োরোপের, বিশেষরূপে আমেরিকার নারীগণের ইচ্ছা, তাঁহারা আর নারী থাকিবেন না, পুরুষ হইবেন। এই জন্য তাঁহারা পুরুষোচিত বিদ্যা উপার্জ্জন দ্বারা কেহ ডাক্তার বারিষ্টার, কেহ পাদ্রি এডিটর কেরাণী গ্রন্থকার বক্তা ইত্যাদির কার্য্য করেন। বুদ্ধিশক্তিতে প্রায় পুরুষের সমান হইয়াছেন। খুব বাহাদুরী বটে! বিষয়কার্য্যে সমান হইয়া এক্ষণে পরিচ্ছদ এবং রূপ সম্বন্ধেও সমান হইবার চেষ্টা হইতেছে। অনেকে মাথায় আর লম্বা চুল রাখেন না, পরিচ্ছদও প্রায় পুরুষের মত। হায় কোথায় আগুল্ফলম্বিত কুটিল কুন্তল, আর কোথায় চসমানাকে, কোটগায়ে নেড়ী পাগলী! স্বাধীনতা যথেষ্ট। বিবাহ করিবে না, পুরুষের অধীনা হইবে না, আপনারা টাকা রোজগার করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে এই ইচ্ছা। কিন্তু তাহাতে সুখ তেমন কৈ? স্বাধীনতাই আরত সুখের পরাকাষ্ঠা নয়। অধীনতা যে সুখের অর্দ্ধাংশ। সভ্যজাতির মহিলাসমাজ যেন চিত্রশালিকার এক একটী রমণীয় মূর্ত্তি

বিশেষ; সেই খানেই তাহাদিগকে দেখিতে ভাল, বাড়ীতে আনিলে বিশ্রী হইয়া যায়। তাহাদের সুন্দর স্বচ্ছ গৌর বর্ণের অভ্যন্তর ভাগ আমি বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু হাড় মাংস চামড়া ভিন্ন আত্মা কোথাও দেখিতে পাই নাই। পার্থিব রাজ্য সীমাবিশিষ্ট; যতই সভ্য জ্ঞানী হও না কেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই তৈলকারের বলীবর্দ্দের ন্যায় এক স্থানে গতি। সেই খোড় বড়ি খাড়া, আর খাড়া বড়ি খোড়। সভ্য নারীর না স্বামী, না সন্তান, কিম্ভূত কিমাকার এক মূর্ত্তি। যেমন বাহ্য তেমনি অভ্যন্তর। স্ত্রীর যদি স্ত্রীত্ব গেল, তবে আর রৈল কি? পরিণামে স্বেচ্ছাচার, দুরাচার, নাস্তিকতা এবং আত্মহত্যা; না হয় অনাথাশ্রমে, হাসপাতালে প্রাণ ত্যাগ।"

"পুরুষসমাজও খুব উন্নতির অভিলাষী। রাজনীতি, সমাজনীতি, বাণিজ্য-নীতি, যুদ্ধরীতি, বিজ্ঞানচর্চ্চা বিষয়ে সকলেই উর্দ্ধে আরোহণ জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। যত দিন দুঃখের অবস্থা হীন দশা, তত দিন সাম্যবাদ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কৃষী শিল্পী দাস ও শ্রমজীবিদিগকে উচ্চ অধিকার দিবার জন্য মহা আন্দোলন করে; কিন্তু যাই একটু বড় দলে স্থান পাইল, অমনি সহযোগী সমশ্রেণীর লোকদিগকে বলে, "যাও! নীচু যাও! দরোয়াজা বন্দ!" একটু ক্ষমতা প্রভুত্ব এক বার হাতে পাইলে হয়, তখন আর যেন সে মানুষই নয়। তখন পিতা ভ্রাতা খুড়া জ্যাঠাকে বলে বাড়ীর সরকার। এই সব দেখে শুনে মনে মনে ভাবলাম, দূর হতভাগ্য সভ্যতা! এই বুঝি তোমার দয়া ন্যায় নিরপেক্ষতা! ইহাতে কি আর কখন হিংসা বিদ্বেষ অশান্তি রক্তপাত থামে? সমাজপরিচালক পণ্ডিতেরা কিছুতেই ওজন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। সাম্যবাদ স্থাপন করিতে গিয়া হয় লম্বা মানুষের হাত পা ছাঁটিয়া বেঁটে মানুষের সহিত এক সমান করিবে; না হয়, বেঁটে মানুষকে পিটাইয়া লম্বা করিয়া তুলিবে। পক্ষান্তরে যাহার বুদ্ধি-প্রতিভা, দৈহিক শৌর্য্যবীর্য্য অধিক, সে অন্য সকলকে পদতলে ফেলিয়া রাখিবে; না হয়, জনসাধারণ দলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে দাবাইয়া নীচে নামাইবে। অধিকার অনুসারে যথাস্থানে সকলকে সংস্থাপনপূর্ব্বক একের সহিত অপরের সম্বন্ধ নিবদ্ধ করত শক্তি প্রবৃত্তি ক্ষমতার সামঞ্জস্য কেহই করিতে পারিতেছেন না। দলপতিরা ভারী এক কঠিন সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছেন। জাতীয় স্বভাবের ভিতরে সমতালাভস্পৃহা ভয়ানকরূপে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে; এক দিকে বাঁধ দিয়া আটকাও, অন্য দিক ভাঙ্গিয়া বাহির

হইবে। সাধারণ স্বার্থের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত কি বন্য প্রকৃতি দ্বিপদ জীবের জঠোরজ্বালার অদম্য গতি অবরোধ করিতে পারে? পুলিস পল্টন গুলি গোলার ভয়ও এখানে কার্য্যকারী নয়। না খাইয়া শীতে হিমে রোগে মরিবে, না হয় গুলির আঘাতে মরিল; ইহাতে আর লোকসান কি? পঙ্গপালের মত প্রজা বৃদ্ধি; দুই হাজার দশ হাজারকে মারিতে না মারিতে দশ বিশ লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণ দেশ ছাইয়া ফেলিবে। দশ বিশ হাজার বন্দুকধারী সৈন্যের উপর পাঁচ লক্ষ মানুষ যদি কেবল চাপিয়া পড়ে, বারুদের আগুন নিবিয়া যায়। সাধারণের চোখ ফুটিয়াছে, অভাব বাড়িয়াছে, আর রক্ষা নাই। মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট সৌরজগতের ন্যায় কেবল বিধাতা প্রজাপতির পালনী-শক্তি প্রভাবে এই অনন্ত বিশৃঙ্খলাময় সভ্যজগৎ বিধৃত রহিয়াছে।”

“প্রজাস্বত্ব রাজার অধিকার, সওদাগর বণিকের লাভ এবং শ্রমজীবির জীবিকা, সবলের প্রাধান্য, দুর্ব্বলের উচ্চাভিলাষ, ধনীর বিলাসবাসনা, দরিদ্রের গ্রাসাচ্ছাদন, এই সকল পরস্পর বিপরীত উপাদানের ভীষণ সংগ্রাম, প্রভৃত সংঘর্ষণ পৃথিবীতে কত দিনে কিরূপে যে সমতা প্রাপ্ত হইবে, তাহা সভ্যজাতির রাজনীতিজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্কে অদ্যাপি প্রবেশ করে নাই। উভয় পক্ষই এ জন্য ভূতের মত দিবা নিশি বংশের পর বংশ খুব খাটিতেছে, কিন্তু মূলমন্ত্র এখনো ধরিতে পারে নাই। সাম্যবাদ, স্বাধীনতার অংশ হনুমানের ক্ষীর ভাগ করার ন্যায় সমস্তই শেষ কর্ত্তৃপক্ষের উদরস্থ হইতেছে। বিজ্ঞানী পণ্ডিত বুদ্ধির মোহে হতবুদ্ধি হইয়া শেষ বলিতেছেন, ‘সর্ব্বাগ্রে বংশবৃদ্ধি হ্রাস কর, জীবপ্রবাহমুখে শক্ত বাঁধ দাও; নতুবা লোকের রোগ দারিদ্র্যকষ্ট অজ্ঞানতা কিছুতেই ঘুচিবে না।’ জ্ঞান সভ্যতার উন্নতি, সাধারণতন্ত্র, প্রধান-তন্ত্র, রাজতন্ত্র, সাম্যবাদ প্রভৃতি বহুবিধ শাসন, ধর্ম্মসমাজের কর্ত্তৃত্ব, নীতি শিক্ষা, সভা সমিতি যাবতীয় চেষ্টা সেই চিরপুরাতন ছয়টী রিপু এবং জঠোর-জ্বালার নিকট পরাভূত হইতেছে। বাসনানিবৃত্তি, চিত্তসংযম নাই, সুতরাং শান্তি এবং সমতাও নাই। বস্তুতঃ ইয়োরোপ আমেরিকার আধুনিক জ্ঞান সভ্যতা অবিদ্যাচ্ছন্ন বদ্ধ জীবের বাসনানলের আহুতি স্বরূপ বলিয়া আমার ধারণা হয়। যে সকল অর্দ্ধ সভ্য জাতি ইহাকে আদর্শ করিয়া লইয়াছে, তাহাদের অধোগতি নিশ্চয়। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল, বড় বড় কল কারখানার চাপে পড়িয়া আত্মারাম যেন চিঁ চিঁ করিতেছে। রাজ্যশাসন এবং ধর্ম্মশাসনের ভিতর একতা শৃঙ্খলা নিয়ম বিধি যেন

ঠিক কলের মত। কিন্তু কেবল মাংস আর অস্থি, স্তূপাকার বসন ভূষণ, আর রাশীকৃত ভক্ষ্য ভোজ্য বিলাস বস্তু; বুদ্ধির সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা চপলার ন্যায় তাহার ভিতর ক্রীড়া করিতেছে। উন্নতির গতি শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পশু পক্ষী নর নারী কীটাণু পরমাণু, ধাতু উদ্ভিদ্ জল স্থল এবং সমস্ত আশা ভরসা তালিকাবদ্ধ। স্থাবর জঙ্গম চরাচর বিশ্ব, দ্যুলোক ভূলোক সকলই মানচিত্রে অঙ্কিত। সুতরাং জীবনগতি চক্রাকারে একই পথে ঘূর্ণায়মান। ইহকাল সর্ব্বস্ব, পরকাল বিলুপ্ত।"

"ইহাদের জীবনের চরম সীমা দেখিয়া আমি ভাবিলাম, এই কি মানব জীবনের শেষ লক্ষ্য? যদি তাহাই হয়, তবে আমি আর দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই কেন? এক জায়গায় কিছু দিন বসিয়া ভাবি। ইংলণ্ড আমেরিকার এই অসার সভ্যতা দেখিয়া এক এক বার মনে হইত, পৃথিবী কি সয়তানের লীলাভূমি? এখানে কি একটুও সারল্য বিশ্বস্ততা নাই? কেবল ফাঁকি দিয়া আপনাপন কাজ উদ্ধার করা? দূর হউক! আমি আর মনুষ্যের মুখ দেখিব না; যেখানে জনমানব নাই, সেই খানে গিয়া বাস করিব; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

চতুর্থ অধ্যায়।

আত্মারামের চিত্তের গতি স্রোতঃস্বতীর ন্যায় সর্ব্বদাই বেগবতী, কোন রূপ বদ্ধভাবের মধ্যে তিনি বেশী দিন থাকিতে পারেন না। অতি সভ্য, কি অর্দ্ধসভ্য, অথবা অসভ্য কোন প্রকার লোকসমাজ যখন তাঁহাকে সীমা-বিশিষ্ট অবস্থার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, তখন তিনি বাহিরের প্রমুক্ত ক্ষেত্রে যাইবার জন্য পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শ্বেত কান্তি সভ্যতম মানবসমাজ দেখিবার জন্য আমাদের মনে কতই অভিলাষ হয়! পাপীর পক্ষে স্বর্গগমন যেমন দুরাকাঙ্খা, ইয়োরোপ আমেরিকা দর্শন বর্ত্তমান বঙ্গীয় যুবকদিগের পক্ষে তদ্রূপ অতিশয় সুদুর্লভ। এক বার যিনি তাহা দেখেন, জনমে আর তাহা ভুলিতে পারেন না। কিন্তু আত্মারামের পক্ষে তাহাও কষ্টকর হইয়াছিল। অতিসভাদিগের বদ্ধ ভাবের মধ্যে পড়িয়া তিনি যেন ছট্ ফট্ করিতেছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত কৌতূহল

ফুরাইয়া গেল, আশা পিপাসা নিবৃত্ত হইল। ঠিক যদি রীতিপূর্ব্বক শাস্ত্র-সম্মত সাহেব সাজিয়া একটী মেম বিবাহ করিতেন, এবং তৎসঙ্গে যদি প্রচুর সম্পৎ থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, আরো কিছু দিন ঐ সকল দেশ তাঁহার ভাল লাগিত। অথবা তাহারও সম্ভাবনা অতি কম ছিল। কারণ, অল্‌রাইট্ থ্যাঙ্কিউ, কৃত্রিম হাসি, কোর্টশিপের ভালবাসা, আর সেকহ্যাণ্ডের হৃদয়হীন ভাবে প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছিল। সে সময়কার মনের অবস্থা তিনি এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

"তদনন্তর আমি কিছু দিনের জন্য সর্ব্বসংশয়ী হৃদয়হীন নাস্তিকের মত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিছুই ভাল লাগিত না। ইহার পরিণাম ফল হয় আত্মহত্যা, না হয় পাগলা গারদে অবস্থান। দিন যেন আর কাটে না। সমস্ত কাজ ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন মরিলেই হয়; এইরূপ মনে হইত। ভ্রমণও শেষ হইল, আমার জীবনও একবারে খালি হইয়া গেল। যদি চন্দ্রলোক কি স্বর্গলোকভ্রমণের কোন উপায় থাকিত, কিম্বা নূতন কোন একটা পৃথিবীতে যদি যাইবার সঙ্গী পাইতাম, তাহা হইলে আরো কিছু দিন ভুলিয়া থাকিতে পারিতাম। শেষ ভাবিলাম, তাহাতেই বা কি হবে? যখন আমার মূল প্রস্রবণ শুষ্ক, তখন বৃষ্টির জলে আর কত দিন চলিবে?"

"অনন্তর ক্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ঘোর নিরাশার মধ্যে ডুবিতে লাগিলাম। হায় কিছুই করিতে পারিলাম না! কেবল চিন্তা আর ভ্রমণ আর সংসারে দিন কতক ভূতের বেগার খাটাই সার হইল! হিংস্র জন্তুপরিপূর্ণ অন্ধকার-ময় গিরিগুহার ন্যায় আমার জীবন এক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। কাহারো সঙ্গে একটা কথাও কহিতে আর ইচ্ছা হইত না। পরিচিত হৃদয়বন্ধুই বা কৈ? আর কি কথাই বা কহিব? কেবল তুমি ভাল আছ, আমি ভাল আছি; আজ বড় গরম, কাল বেশ ঠাণ্ডা ছিল; না হয়, সংবাদপত্রের লিখিত বিষয়ের আলোচনা, আর অনুপস্থিত তৃতীয় পুরুষের নিন্দা; ইহা আর কি চিরকাল ভাল লাগে? বন্ধুতাও এমনি যে, বন্ধু পেছু ফিরিলে আর কিছু মনে থাকে না। মহা বিরক্ত হইয়া শেষ কথা কওয়া বন্ধ করিলাম। পৃথিবী যেন আত্মাশূন্য শবদেহপূর্ণ এক মহাশ্মশানের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাজনতার ভিতরেও নির্জ্জনবাস। একটা ভূত প্রেতের সঙ্গে দেখা হয় না যে কথা কই। লোকগুল কেবল যেন মনে হয়, এক একটা পুতুলের মত ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে। আত্মম্ভরিতার প্রকাণ্ড কল দিন রাত্রি চলিতেছে, আত্মা পরমাত্মা

কর্ত্তব্যজ্ঞান সরলতা প্রেম তাহাতে চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সকলের উপরেই বিরক্তি অবিশ্বাস জন্মিয়া গেল। শেষ নিজের ভিতরেও আর কোন সাড়া শব্দ পাই না। কাজেই তখন আপনার উপরেও অবিশ্বাস হইল। অতঃপর ক্রোধ বিরক্তির সহিত বলিলাম, তবে কি এই সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বর নাই? যদি তিনি থাকেন, তিনি কি ঘুমাইয়া আছেন? গোটা কতক বিদ্যুতের তার আর বাষ্পীয় কল কারখানার হাতে জীবের জীবিকা এবং শিক্ষা শাসনের ভার দিয়া ভগবান্ কি বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করিতেছেন? মানবসমাজের যদি এই পরিণাম হয়, তবে ইহা সৃষ্টি না করিলেই ভাল হইত। আমার সামান্য ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেই যে ইহার কত গভীর অভাব প্রকাশ পাইতেছে! এরূপ কখন ভগবানের রাজ্য হইতে পারে না। এখানেত দেখিতেছি, মনুষ্যেরা নিরঙ্কুশভাবে প্রভুত্ব করিতেছে এবং কুকুর শেয়ালের মত শেষ পঞ্চত্ব পাইতেছে। মনুষ্যসমাজকে এবং ভগবানকে এমনি নিন্দা করিতে লাগিলাম, যেন ইহা অপেক্ষা আমি উৎকৃষ্ট জগৎ সৃজন করিতে পারিতাম। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি সত্য থাকে তাহা প্রতিষ্ঠিত হউক! না হয়তো পৃথিবী ধ্বংস হইয়া একবারে উৎসন্ন যাউক!"

"এইরূপে ঈশ্বরনিন্দা এবং লোকনিন্দা করিয়া আমি আরো কাহিল হইয়া পড়িলাম। পরে ভাবিলাম, যদি খানিক ঘুম হয়, তাহা হইলে সময় কাটে। তাই কি পোড়া চক্ষে ঘুম আছে? কোন কাজও নাই, কর্ত্তব্যও নাই, ঘুমও নাই। ক্রমে হাল ছাড়িয়া দিয়া একবারে হয়রাণ হইয়া পড়িলাম। খানিক পরে দেখি যে, সাগরগর্ভস্থ জলবুদ্বুদের ন্যায় আমার ভিতর হইতে অস্পষ্ট ভাষায় কে যেন কথা কহিতেছে। চিন্তা কার্য্যে পরিণত না হইলে তাহার অর্থ পরিস্ফুট হয় না; আমি কর্ত্তব্যহীন নিষ্ক্রিয় পরিব্রাজক, তাহার মর্ম্ম কি বুঝিব? ক্রোধ বিরক্তি সংশয় অবিশ্বাস যখন শেষ সীমায় উপনীত হইল, তখনই ঐরূপ অস্পষ্ট বাণী শুনিতে পাইলাম। শেষ দেখি, কোথা হইতে হঠাৎ এক পুরুষকার শক্তি অন্তরে প্রকাশ পাইল। তাহার সার মর্ম্ম এই যে, 'কি! আমি জীবদ্দশায় মরিয়া থাকিব! আমি কি মাংসপিণ্ড, না অবস্তু? অনন্ত অজেয় অমর ব্রহ্মশক্তি কি আমার মূলাধারে নাই?' এই ভাবের উদয় হইবামাত্র, অমনি নিমেষের মধ্যে দেখি যে জীবনের সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুতের ন্যায় দেবশক্তির তেজ প্রবাহিত হইতেছে। তখন সহসা আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং বক্ষবিস্তার করিয়া বাহুদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক

মহা বিক্রমের সহিত চীৎকার স্বরে বলিতে লাগিলাম, 'কিসের জন্ত আমার ভয়? অনন্তের অমর সন্তান হইয়া আমি এই অসত্য মায়ার সাংসারিক অবস্থাকে ভয় করিব? কখন না! কখন না! রে সয়তান, তুই দূরে পলায়ন কর! আমি আর তোর প্রবঞ্চনায় ভুলিব না! এই দেখ, জলন্ত ব্রহ্মশক্তি নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিল! আর আমি ভীরু কাপুরুষের মত বসিয়া থাকিব না, লক্ষশূন্ত মনে দেশে দেশে ঘুরিয়াও বেড়াইব না, কিন্তু ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করিব।' যখন প্রভূত সাহস এবং পরাক্রমের সহিত সয়তানকে এইরূপে ধমক দিলাম, তখন অন্তরস্থ ব্রহ্মবাণী স্পষ্ট স্বরে মৃদু মধুর তানে গাহিতে লাগিল;—'হে অনন্তের সন্তান, অগ্রসর হও! অগ্রসর হও! অনন্ত উন্নতির পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হও! কোন ভয় নাই, আমি তোমার সঙ্গে আছি!' আমি তখন মায়ের কোলে শিশু ছেলের মত গত জীবনের সুদীর্ঘ দুঃখকাহিনী বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মা আমাকে আশা বাক্যে মধুর সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। যদিও সে কথার প্রকৃত মর্ম্ম কিছুই তখন বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু মনে খুব আশা এবং সাহস বাড়িল, প্রাণ জুড়াইল, হৃদয়ের ভার কমিয়া গেল। ঠিক যেন মৃতদেহে পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইল।"

"তার পর আধ্যাত্মিক পবিত্র অনলে অভিষিক্ত হইয়া নবজীবন এবং নূতন বল লাভ করিয়া আমি স্বকার্য্য সাধনে কৃতসঙ্কল্প হই। তখন আর এক মুহূর্ত্ত কালও জনকোলাহলের মধ্যে থাকিতে পারিলাম না, প্রাণ হাঁপ হাঁপ করিতে লাগিল। দেবদূতগণ যেন বলপূর্ব্বক আমাকে ধরিয়া এক মহাবনের ভিতরে লইয়া গেলেন। আহা! কি রমণীয় সে বনভূমি। কোথাও সুরভীষিক্ত কুসুমিত বনলতিকা সকল বৃক্ষশাখায় লম্বিত হইয়া হাস্ত করিতেছে, এবং তাহার অদূরে ঘন মেঘাবৃত অভ্রভেদী প্রকাণ্ড ভীম গণ্ড শৈলশৃঙ্গ সকল গর্ব্বিত স্কন্ধে দাঁড়াইয়া আছে; কোথাও বা বন্ত পাদপরাজীর পদধৌত করিয়া শ্বেত শুভ্র ফেনপুঞ্জ উদ্গীরণ করিতে করিতে কলনাদিনী নির্ঝরিণী বঙ্কিম গতিতে বহিয়া যাইতেছে, এবং তাহার শীতল জল পান করিয়া বনবিহঙ্গ এবং মৃগবধূগণ আনন্দে নাচিয়া গাইয়া ইতঃস্তত বিচরণ করিতেছে। একটী জনমানব সেখানে নাই, অথচ অনন্ত চৈতন্তের অনন্ত জলন্ত চক্ষু চারিদিকে যেন জাজ্বল্যমান। বৃক্ষ লতা তটিনীপ্রবাহ গিরিচূড়া মৃগ পক্ষী কুসুমাবলী সকলে যেন কথা কহিতেছিল। সকলেই সজীব সচেতন সুন্দর সরস। পতঙ্গকুলের ঝিল্লীরব, বিহঙ্গের সঙ্গীত, নির্ঝরের কলনাদ,

পবনের স্বন্ স্বন্ শব্দ একত্র মিলিয়া এক অপূর্ব্ব মধুর ঝঙ্কারে বনদেবতার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিল।"

"বনমধ্যে প্রকৃতির নির্জ্জন শান্তিকোলে বসিয়া জীবনের অভ্যন্তরে কি একটা মহাবিপ্লবের আন্দোলন আমি শুনিতে লাগিলাম। এক দিকে অনন্ত ব্রহ্মের আদেশ অমরাত্মার মধ্যে এই কথা অলৌকিক গম্ভীর নাদে বলিতেছে যে, 'স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর।' অর্থাৎ দৈবাদেশের জলন্ত দেবাক্ষর কর্ত্তব্য জ্ঞানের ভিতর দিয়া চরিত্রাকারে ফুটিয়া বাহির হইবার জন্য ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিল, কিছুতেই তাহা নির্ব্বাণ হইবার নয়। অন্য দিকে মরণধর্ম্মশীল রক্ত মাংস অস্থিনির্ম্মিত দেহদুর্গমধ্যে বসিয়া ষড়রিপু—'ক্ষুধায় প্রাণ গেল, অন্ন দাও, সুখ দাও, ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রী দাও' বলিয়া মহা চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। কি ভয়ানক সে হুঙ্কার গর্জ্জন কোলাহল! মহানগরের জনকোলাহল বা কোথায় লাগে। সৃষ্টি আরম্ভের পূর্ব্বে পৃথিবীকে নির্দ্দিষ্ট আকারে পরিণত করিবার জন্য প্রকৃতির ভিতর অনন্ত সধূম তরল উত্তপ্ত বাষ্পরাশি যেমন আলোড়িত হইয়াছিল, আমার ভিতরে তেমনি এক অভূতপূর্ব্ব সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইল। এই অসার অনিত্য ভূমণ্ডলে সুখী হইবার জন্য আমরা আসি নাই, অনন্তের লীলা বিকাশজন্যই জীবের সৃষ্টি; সেই জন্য চির অশান্তিতে কে যেন আমাকে দেশ দেশান্তরে এত কাল ঘুরাইয়াছিল! বাহিরের অস্থিরতার পরিবর্ত্তে এখন অন্তরে মহা অশান্তি ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল।"

"যাই হউক, বনে প্রবেশ করিয়া বাঁচিলাম, বড় আরাম পাইলাম। আমি এখন চিরযৌবনা, অনন্ত নবীনা প্রকৃতি দেবীর অনন্ত ভাণ্ডারের অতিথি। কন্দ মূল, ফল, নির্ঝরের জল, বনের মধুতে জীবন ধারণ করি। গিরিকন্দরে বৃক্ষতলে পর্ণশয্যায় শয়ন। বনচর মৃগ পক্ষিদিগের সহিত আলাপ। আমিই যেন সে রাজ্যের রাজা। হিংস্র জন্তরা কেহ আমার হিংসা করিত না, তাহাদের সঙ্গে আমি ভ্রাতৃভাব করিলাম। সবৎসা হরিণীরা নির্ভয়ে আসিয়া আমার গাত্র লেহন করিত। সর্পেরা মাথা নামাইয়া সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত। মরুভূমি ভ্রমণের পর নীলনদের শীতল জল দেখিয়া যেমন পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম, কৃত্রিম সভ্যতার উষ্ম বায়ুমণ্ডলের পরপারে এই নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন বিজন বনভূমি তেমনি আমার পক্ষে এখন শান্তিপ্রদ বোধ হইতে লাগিল। এক্ষণে একাকী আত্মচিন্তার অবসর পাইলাম। নির্জ্জনে বসিয়া আপনার নিকট আপনি বিশেষরূপে পরিচিত হইতে লাগিলাম।"

"লোকসমাজে থাকিতে গেলে সর্ব্বদাই কেবল লোকভয়। লোকের দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ যেন জালের মত চারি দিক্ ঘেরিয়া রাখে। কে কি ভাবিতেছে, আমার অসাক্ষাতে কে কি কথা কহিতেছে, এই ভাবনাতেই প্রাণ অস্থির। ভগবান সর্ব্বসাক্ষী যে মুখপানে নিরন্তর চাহিয়া রহিয়াছেন, সে জ্ঞান নাই। লোকানুরাগ, লোকভয়ের প্রেত স্কন্ধে চাপিয়া মানুষকে আত্মবিস্মৃত করিয়া ফেলে। বনে আসিয়া সে ভয়টা একবারেই আমার চলিয়া গেল, আপনাকে আপনার খুব নিকটে পাইলাম। গ্রীষ্মের সময় ঘামেভেজা জামাটা ছাড়িয়া ফেলিলে যেমন আরাম বোধ হয়, লৌকিকতার উত্তাপে গলদঘর্ম্ম বাহ্য সংস্কারটা ফেলিয়া দিয়া উন্মুক্তাত্মা হইয়া তেমনি যেন এখন বাঁচিলাম। পরে দিন দিন আপনার সহিত আপনার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাহ্য জ্ঞানও আমার এখন প্রচুর পরিমাণে হস্তগত ছিল; সুতরাং একা থাকায় কোনই কষ্ট নাই। বাহিরের অনেক বিষয় দেখিয়া শুনিয়া তাহার সার সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি, সে জন্য বহির্ম্মুখে যাইবার আর প্রবৃত্তিও নাই। এ অবস্থা আত্মচিন্তা আত্মানুসন্ধানের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অনুকূল।"

"ভাবিয়া দেখিলাম, আত্মতত্ত্বই সার। দৃশ্য অপেক্ষা অদৃশ্য যাহা তাহাই পরম বস্তু। ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ অতীন্দ্রিয়ের ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই জন্য সুচতুর সারদর্শী ঋষি যোগীরা বাহ্য জগৎকে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা মনে করিয়া অধ্যাত্ম তত্ত্বের নিগূঢ় প্রদেশে অবতরণ করিতেন এবং সেই জন্য পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ স্বভাব প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং মিলন হইয়াছিল। পিতৃদত্ত শিক্ষাপ্রভাবে আমিও এ পথের পথিক ছিলাম। আমার স্বভাব আমাকে সহজেই এই দিকে বার বার আকর্ষণ করিত। কর্ম্মফলে এত দিন কেবল বৃথা ঘুরিয়া মরিয়াছি। অন্তর রাজ্য ভ্রমণে নিযুক্ত হইলে আমি এত কাল কত দেশই না দেখিতাম!"

"চিন্ময় আত্মা পদার্থ কিরূপ, দুই কি এক, তাহা পরিষ্কাররূপে একাল পর্য্যন্ত বুঝিবার চেষ্টাও করি নাই, সুতরাং বুঝিও নাই। আমি এবং আমিত্বের মূল স্থান আবিষ্কার করিতে অনেক কাল গত হইল। "আপনাকে জান" কথাটী বড়ই সারগর্ভ। আপনাকে ধরিতে পারিলে সমস্ত ধরা পড়ে। কিন্তু তাহাকে ধরিতে না পারিলে কেবল অরণ্যে ক্রন্দন সার হয়।"

"বহুকাল ধরিয়া আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিলাম। রে মন কর আত্মানুসন্ধান, এই গান তখন গাইতাম। অতঃপর খুব একাগ্র চিত্ত এবং সংযতমনা

হইয়া দেহের সহিত সমস্ত বহির্জ্জগৎ ছাড়িয়া একাকী উদাসীনের ন্যায় অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। এ পথের সাথী আর কেহ নাই; নিজ অভিজ্ঞতাই পথপ্রদর্শক। বহির্জগতের পর দেহ, দেহ ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়গ্রাম, তার পর মনরাজ্য, তার পর বুদ্ধি, তাহার অতীত স্থানে আত্মার রাজ্য। অতিশয় সূক্ষ্ম বিষয়, বুদ্ধি বিদ্যার অগম্য। প্রথমে যখন অন্তরমুখে অবতরণ আরম্ভ করিলাম, তখন দেখি আমিত্ব জ্ঞান বিলক্ষণ স্থূল এবং প্রশস্ত। সেখানে অনুক্ষণ কেবল "আমি" "আমি" "আমি" শব্দ উঠিতেছে। পরে যতই অগ্রসর হই, ততই দেখি পথ অতি সঙ্কীর্ণ, ক্রমে চুলের মত সরু হইয়া আসিল। পরিশেষ দেখি আমির আর কোন চিহ্নই নাই, চারি দিকে কেবল এক সর্ব্বব্যাপী অনন্ত। তখন "আমি" শব্দের পরিবর্ত্তে "তুমি আছ" "তুমি আছ" বলিতে বাধ্য হইলাম। তাহার প্রত্যুত্তরে "আমি আছি" "আমি আছি" এই ধ্বনি অনন্ত চিদাকাশে ক্রমাগত ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন বুঝিলাম, আমি আমার অত্যন্ত নিকটস্থ সামগ্রী হইলেও আমি তাহা হইতে এত কাল বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। সেই জন্য বাড়ী পৌঁছিতে অনেক পরিশ্রম করিতে হইল। কিন্তু যখন পৌঁছিলাম, তখন বড় আরাম; পথশ্রান্তি শীঘ্রই দূর হইয়া গেল। দূরদেশবাসী শ্রান্ত পথিক যেমন গৃহে আসিয়া শান্তি সম্ভোগ করে তেমনি শান্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। আর তখন সে স্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইল না। স্বরূপে স্থিতি বড়ই শান্তিপ্রদ অবস্থা। অনন্ত পুরুষের আশ্রিত জীব, ঠিক যেন পিতার কাছে পুত্র।"

"এই জায়গাটায় আসিবামাত্র এত শান্তি কেন হয়? যেখানে আমি সেই খানেই তিনি, অনন্তের কোলে সান্ত; দুইটীতে মেশামিশি মাখা মাখি; তাই এত শান্তি। ব্রহ্ম বস্তু যেন দুগ্ধের ভিতর ঘৃত, তিলের মধ্যে তৈল, সরবতের সঙ্গে চিনি। আসল দিব্যধাম, স্বর্গলোক এই খানে; সেই জন্য এত শান্তি আরাম। বাসনার নিবৃত্তিজন্য এমন এক প্রকার নির্ব্বিকার বিশ্রান্তি এখানে পাওয়া যায়, যে জন্য কোন অভাব বোধ থাকে না। আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত। 'কোথায় বা পার্থিব অতুল ঐশ্বর্য্য, সুখপিপাসা, আর কোথায় এখন আমি। যেন মাতৃকোলে শিশু সুখে স্তন্য পান করিতেছে। এইরূপে আপনাকে অন্বেষণ করিতে গিয়া এক অনন্ত রত্নের খনি পাইলাম। তখন আর চক্ষু খুলিয়া বাহিরে কিছু দেখিতেও

ইচ্ছা হয় না; কোথাও যাইতে কিম্বা কাহারো কথা শুনিতে, কোন বিষয়ই আর ভাল লাগে না। মানুষের যে কত উচ্চতর অধিকার, কত যে গৌরবান্বিত সে, এখন তাহা বুঝিতে পারিলাম। এই আধ্যাত্মিক যোগানন্দের সঙ্গে, চিদৈশ্বর্য্যের সঙ্গে কি ইয়োরোপ আমেরিকার উন্নতি সভ্যতার তুলনা হয়? তখন মনে হইল, ঘরের ভিতর রত্ন মাণিকের খনি, আর আমি বনে বনে দেশে দেশে সমুদ্র মরুভূমিতে শান্তি অন্বেষণ করিতেছিলাম! বাহিরের সুখ শান্তি কত ক্ষণ থাকে? যখন নিজে সুখ শান্তি হওয়া যায়, তখন সকলই শান্তিময়। এখন আর আমি অজ্ঞান দীন দরিদ্র সম্বলবিহীন একা নহি, অনন্তগুণাকর আশ্রয়দেবতাকে পাইয়াছি, কল্পবৃক্ষের মূলে বসিয়াছি। অনন্ত জীবনের ভোগ্য বিষয় লাভ করিয়াছি। পিতা পুত্রের মিলন হইয়া গিয়াছে। একে আমি প্রপঞ্চাতীত অমর, তার উপর অনন্ত দেবের স্নেহভাজন প্রতিপাল্য।"

"এইরূপে যখন দেহভার, বিষয়বিকার চলিয়া গেল, ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া মাতৃসন্নিধানে পৌছিলাম, অনন্তের অনন্ত রাজ্য দেখিলাম, তখন অন্তর জগতের মধুর সৌন্দর্য্যছায়া বাহিরেও প্রসারিত হইল। যেন আধ্যাত্মিক যোগানন্দ জীবনকে পরিপ্লাবিত করিয়া বাহ্য জগতে তাহা বিস্তার হইয়া পড়িল। অন্তর বাহির অবিভাজ্য, সাকারে নিরাকার, নিরাকারে সাকার, উভয়ে একাকার। বিশ্বের দৃশ্যাবরণ ভেদ করিয়া তখন অনন্ত পরমাত্মা আমার নিকট অনন্ত কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ করিলেন, তাহার মধুর প্রেমরাগে সমস্ত বহির্জগৎ অনুরঞ্জিত হইয়া গেল।"

আত্মারামের উদ্ভট জীবনকাহিনীর এই অংশের ঘটনাগুলি অতিশয় মনোহর এবং সারগর্ভ; শুনিতে শুনিতে অন্তরাত্মা যেন অনন্ত রসহপূর্ণ অনন্তের অদ্ভুত মহিমার ভিতর কোথায় মিলাইয়া যায়। বন্ধনবিমুক্ত আত্মারাম না জানি সে অবস্থায় কতই আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলেন! ইহাই বাস্তবিক প্রকৃত স্বাধীনতা, এবং ইহাতেই পরম শান্তি। দেহকারাগারে প্রবৃত্তিশৃঙ্খলে বদ্ধ জীবনে স্বাধীনতাও নাই; শান্তিও নাই; এখানে যাঁহার যত প্রভুত্ব, তাঁহার তত দাসত্ব বিড়ম্বনা। হায় কবে আমরা নিঃসঙ্গ আত্মারাম হইয়া অনন্ত চিদাকাশে বিচরণ করিব! বড় দুঃখের বিষয় যে, গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে আমরা আমাদের বন্ধুর বনবাসের রমণীয় বৃত্তান্ত সকল সবিস্তারে লিখিতে পারিলাম না। কিন্তু উহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া আমাদের

আশা বিশ্বাস বিকসিত হইল। আত্মারাম যেমন আত্মা আত্মা এবং অধ্যাত্ম রাজ্য অধ্যাত্ম রাজ্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন, এবং সীমাবিশিষ্ট পার্থিব জগতের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া কেবলই অদৃশ্য চিন্ময় জগতের প্রশংসা করিতেন, তেমনি এত দিন পরে হাতে হাতে তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন। সংসারে অজ্ঞান দরিদ্র অতৃপ্ত নিরাশ হইলেই যে মনুষ্যের সমস্ত আশা ভরসা ফুরাইয়া যায় তাহা নহে; যে রাজ্যের সে রাজা, সে রাজ্য তাহার অন্তরেই বর্ত্তমান। তাহার পরের কাহিনী এক্ষণে সকলে শ্রবণ করুন।

"অনন্তর যখন আমি চর্ম্মচক্ষুরূপ বাতায়নের ভিতর দিয়া অধ্যাত্মযোগালোকিত অন্তর দৃষ্টিকে অল্পে অল্পে বহির্ম্মুখে ফিরাইলাম, তখন ভিতরের বিজ্ঞানরঞ্জিত সুন্দর ছবি বাহিরেও দেখিতে পাইলাম। বহির্গমন করিলে পাছে আমি আবার যোগভ্রষ্ট অন্তরশূন্য হই, এই একটা বড় ভয় ছিল; কিন্তু বহু দিনের যোগাভ্যাসের ফলে অন্তর বাহ্য এক হইয়া গেল। যাহা দেখি, যাহা শুনি, যাহা করি সমস্ত ভাল লাগে। তখন স্পষ্ট বুঝিলাম, কিছু ভাল লাগে না, ভাল লাগে না যে লোকে সচরাচর বলে, তাহার মানে এই যে তাহারা বাহিরের অবস্থাঘটিত শান্তি খুঁজিয়া বেড়ায়। বাহ্যাবস্থার অতীত অন্তর প্রকৃতির বিকাশ ভিন্ন চিরশান্তি নিত্যানন্দের আশা নাই। অতঃপর যোগাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি বনমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলাম। তরুকুঞ্জ, লতাবিতান, তটিনীপ্রবাহ, বনকুসুমাবলী, মৃগ পক্ষী সকলকে যেন আত্মীয় পরিবার সখা সখীর মত বোধ হইতে লাগিল। সমস্তই চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মাময়। পূর্ণ পরম চৈতন্যে আমার আত্মা সর্ব্বদা নিমগ্ন, সুতরাং অন্য যাহা কিছু সমস্তই তন্ময়। ব্যোমযানে আরোহণপূর্ব্বক আকাশের ঊর্দ্ধদেশে উঠিতে যেমন আমোদ বোধ হয়, আমি এখন তেমনি ভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলাম। ঠিক নলিনীদলগত জলের ন্যায়।"

"যখন অন্তরস্থ দেবাসুরের সংগ্রাম থামিল, সয়তান চলিয়া গেল, যোগানন্দ প্রাপ্তি হইল, তখন পৃথিবী এবং মনুষ্যসন্তানের প্রতি আমার বড় ভালবাসা জন্মিল। হায় রে! মনুষ্য, সুখের অন্বেষণে তুমি কতই না কষ্ট পাইলে! আমার মত তোমরা সকলেই পথে পথে বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছ। দুঃখী ভাই, দুঃখিনী ভগিনী, আর তোমরা প্রতারিত হইও না। মাতঃ বসুন্ধরে! তুমিও অতি প্রাচীনা, তোমার কষ্ট দূর হউক!"

"ভ্রমণ করিতে করিতে একদা এক আশ্রমে উপনীত হইলাম। তথায় কতিপয়

সৎকুলোদ্ভবা সুশিক্ষিতা সন্ন্যাসিনীর সহিত পরিচয় হইল। তাঁহারা বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনা সুসভ্যা চিরকৌমারব্রতধারিণী মহিলা, সংসারের ত্রিতাপ-জ্বালায় সন্তপ্ত হইয়া যোগ তপস্যার জন্য এখানে নির্জ্জন বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে এক জন বৃদ্ধা পক্ককেশী, আর সকলে কেহ প্রৌঢ়া, কেহবা পূর্ণযৌবনা। ইঁহাদের বৈরাগ্যনিষ্ঠা, আত্মত্যাগ প্রশংসনীয়। কিন্তু বনদগ্ধা হরিণীর ন্যায় ইঁহাদের আত্মা বিলাসবাসনানলদগ্ধ, রিপুজর্জ্জরিত, শীর্ণ এবং শুষ্ক; হৃদয় প্রেমপ্রতারণায় ক্ষত বিক্ষত এবং নিরাশভগ্ন। ঠিক আমি যে অবস্থায় বনপ্রবেশ করিয়াছিলাম অবিকল সেই অবস্থা। আমার নিত্যতৃপ্ত সহাস্য আনন এবং আত্মানন্দ রূপ দর্শনে প্রথমে তাঁহারা কিছু উপেক্ষা এবং ঘৃণা প্রদর্শন করেন, পরে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করত' আশাতে উল্লসিত হন। এই সন্ন্যাসিনীগণ অদৃশ্যতত্ত্বানুসন্ধায়ী এবং যোগমার্গবর্ত্তিনী। দেখিয়া বুঝিলাম, ইঁহাদের সম দম সাধন আরম্ভ হইয়াছে। আর কিছু দূরে আসিয়া ঠিক ঐরূপ একটী সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম দেখিতে পাইলাম। এখানে কেবল জ্ঞানবৃদ্ধ শান্তিপিপাসু পুরুষেরা বাস করেন। ইহা দেখিয়া মনে আহ্লাদ হইল। পৃথিবী এবং পার্থিব জীবন ছাড়া যে মনুষ্যের আর একটী উচ্চতর লক্ষ্য আছে, ক্রমে এইরূপে তাহা প্রমাণিত হইবে।”

“বনবাসে থাকিতে থাকিতে এক দিন শুনিলাম, নগরের সভ্য সওদাগর বণিক সম্প্রদায় বনের বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিতেছে। অচিরে তাহা শূন্য প্রান্তর এবং লোকালয়ে পরিণত হইবে ভাবিয়া আমি পুনরায় জন-কোলাহলপূর্ণ নগরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। বহু কাল বনমধ্যে একাকী নিঃসঙ্গাবস্থায় ছিলাম, তথাপি জনসমাজের প্রতি আমার কিছুমাত্র বীতরাগ জন্মে নাই। বরং তাহার পূর্ব্বে কতকটা বিরক্ত বৈরাগ্যের ভাব ছিল। আত্মতত্ত্বানুসন্ধান এবং যোগৈশ্বর্য্য সম্ভোগের পর চৈতন্যময় জীব জগতের মহত্ত্ব এবং তন্মধ্যে পরমাত্মার বিচিত্র লীলাবিহার পুনরায় দেখিবার জন্য আমি অধিকতর অনুরাগী হইলাম। যদিও মানবসমাজে পরিবারমণ্ডলীতে বিরক্তির শত সহস্র কারণ বিদ্যমান, তথাপি ইহার ভিতর পরমাত্মার প্রকাশ যেমন উজ্জ্বল এমন আর কোথায় আছে? জীবচৈতন্য পরমচৈতন্যের এক একটী খণ্ড। তাহার বহুল বিকৃতির অভ্যন্তরেও দেবাংশ জাজ্বল্যমান প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান এবং নীতির বিদ্যালয় স্বরূপ এই মানবসমাজে বিধাতা স্বয়ং শিক্ষক হইয়া প্রতি জীবনে জীবনে নিজ অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন।

"বিশ্বাস" "প্রেম" "পবিত্রতা" এই তিন মহামন্ত্র মানবসমাজকে নিয়মিত করিতে চায়। সে কথা না শুনিয়া, "সাম্য" "মৈত্রী", "স্বাধীনতা" মন্ত্রে দীক্ষিত ভগবদ্ভক্তিবিহীন জ্ঞানীরা ঘোর সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছেন। অন্ধ অন্ধকে পথপ্রদর্শন করিবে ইহা কি সম্ভব? আপনাকে ত্যাগ করিলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যায়।"

"যখন আমার হৃদয়ভার দুঃখ সন্তাপ নিরাশা চলিয়া গেল, অন্তরে প্রেম শান্তির উদয় হইল, তখন স্পষ্ট অনুভব করিলাম, এ সামগ্রী একা ভোগ করিবার জন্য নয়; ভোগ করা অপেক্ষা বিতরণেই পরমানন্দ। দুঃখী দুঃখিনীরা শান্তি লাভ করুক, এই ইচ্ছা বড়ই আমার মনে প্রবল হইল। পৃথিবীর ভাই ভগিনীদিগের দুরবস্থার কথা ভাবিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তখন প্রেমবিগলিত হৃদয়ে, অশ্রুধৌত চক্ষে বলিলাম, "আয় ভাই ভগিনি! রে আমার অখিলমাতার পুত্রকন্যাগণ! আয় তোরা আমার বুকের ভিতর আয়! এক বার বাহুপাশে আলিঙ্গন করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হই। আয়! তোদের পদসেবা করিয়া আমি কৃতার্থ হই। হে দুঃখভারাক্রান্ত জগৎ, তুমিও আর কাঁদিও না। মাতঃ আমি তোমার চক্ষের জল মোচন করিব। যখন আমার দুঃখ দুর্দ্দিন ঘুচিয়াছে, তখন সকলেরই দুঃখ অবসান হইবে।"

[তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।]

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

বনবাসের পর আত্মারামের অন্তরদৃষ্টি যখন সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত হইল, তখন তিনি এক নূতন জীবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অধ্যাত্ম চক্ষের সম্মুখে বিশ্বের বাহ্যাবরণটা তখন একবারে খুলিয়া গেল। নির্গুণ নির্লিপ্ত আত্মারাম এখন নিরপেক্ষ ভাবে প্রকৃতির সত্ব রজ তম গুণের ক্রিয়া দেখেন আর উদাসীনবৎ নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। দেহধারী হইয়াও যেন বিদেহী। স্বদেশপ্রত্যাগমনের পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে।

"ভাই রে, তোমরাই বা কোথায়, আমিই বা কোথায়! দেশে ফিরিয়া আসিয়া যখন তোমাদের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, তখন ভাবিলাম, আমি বুঝি পথ ভুলিয়া কোন এক নূতন দেশে আসিয়াছি। পরে শুনিলাম, অবস্থার স্রোতে পড়িয়া বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে তোমরা দিগ দিগন্তরে চলিয়া গিয়াছ। আমার নূতন বিধ বেশ ভূষা, দেহের পরিবর্ত্তন দেখিয়া কেহ আর আমায় চিনিতে পারিল না; সুতরাং স্বদেশ জন্ম-ভূমির পরিচিত স্থানে আসিয়াও চির অপরিচিত পথিকের ন্যায় আমি বেড়াইতে লাগিলাম। যাহাদিগকে বাল্য কিম্বা যৌবনে হয় তো চিনিতাম, তাহারা এখন বড় হইয়াছে, কাজেই চিনিতে পারিলাম না। আমারও অর্দ্ধপক্ক সুদীর্ঘ কেশ শ্মশ্রু, অসংস্কৃত অসভ্য বার্দ্ধক্য দেহ, বিচিত্র ফকীরি পরিচ্ছদ; সুতরাং তাহারাই বা আমায় কিরূপে চিনিবে? অস্থি মাংস চর্ম্ম, আর জাতীয় বসন ভূষণ লোক চিনিবার নিদর্শন, তাহা যদি পরিবর্ত্তিত হইল, তবে আর কে কাহাকে চিনিবে? আমার পক্ষে বাহ্য চিহ্ন দ্বারা লোক চেনা না চেনা দুই সমান, এই জন্য বিশেষ কোন কষ্ট হইল না; বরং তজ্জন্য এক প্রকার নূতন আমোদ ভোগ করিতে লাগিলাম। চিনি অথচ চিনি না, স্বদেশ মাতৃভূমি জন্মস্থানে আছি, অথচ বোধ হইতেছে যেন আমি বিদেশী অপরিচিত। মাতৃভূমির বাল্য লীলার স্থান গুলি বড়ই

সুমিষ্ট। এখন আর তাহাতে কোন স্বার্থ নাই, অথচ চমৎকার আকর্ষণ। যেখানে যাহা দেখি সমস্তই কেমন এক প্রকার রমণীয় বোধ হয়। কালের পরিবর্ত্তনে সমস্তই রূপান্তর হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহা ভাল লাগিল। পুরাতন পরিচিত বিষয় চিনিতে না পারিলে অন্তরে যে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, আমার তাই হইয়াছিল। ওহে বিদেশী আত্মারাম, তোমার বাড়ী কোন্ দেশে? তোমার কি কোন নির্দ্দিষ্ট বাস স্থান, পরিবার আত্মীয় নাই? এ প্রশ্নের ভাল উত্তর দিতে পারিলাম না। বিশেষ জ্ঞানটা নির্ব্বিশেষে পরিণত হইয়া 'আমাকে যেন আকাশবৎ করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি যেন এখন দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বকার একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক চিহ্ন।' আত্মপরিচয় প্রমাণ করিবার জন্য আপীল করিবার একটী লোকও নাই।"

"তদনন্তর গ্রাম ছাড়িয়া নগরে আসিলাম, তথায় পূর্ব্বজীবনের স্ত্রী পুত্রদিগকে কিছু দিন অন্বেষণ করিয়া বেড়াইলাম। বহু জনাকীর্ণ নগর, এখানে অপরকে চেনা দূরে থাকুক, আপনাকেই ভুলিয়া যাইতে হয়। লোকগুল ঠিক যেন সংয়ের মত, দেখিয়া আমার বড় হাসি পাইল। চারি দিকে যেখানে সেখানে নানা রঙ্গের সং। তোমরা এ সব মজার মজার সং দেখেছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, তবে বলি শুন।"

"সং সাজিবার প্রধান উপকরণ সামগ্রী পরিচ্ছদ। রাজা রাণী, পণ্ডিত বিদ্বান, সাহেব বিবি, ফকীর সন্ন্যাসী, নর্ত্তক নর্ত্তকী, মন্ত্রী সহচর, ভদ্র সম্ভ্রান্ত, মিস্ত্রী কুলী যে কোন সং দেখিবে, সমস্তই পরিচ্ছদের গুণে। পরিচ্ছদের উপর মান সম্ভ্রম প্রভুত্ব ক্ষমতা সকলই নির্ভর [illegible]। কিন্তু সাজ খুলিয়া যাত্রা ও থিয়েটারওয়ালারা যখন বাসায় বসিয়া নিজমূর্ত্তি দেখায়, তখন আর চেনা যায় না কে রাজা কে রাণী; সব একাকার। সুতরাং পরিচ্ছদই এ সকল উপাধি ভেদের কারণ। আফিসের বাবুরা বাড়ীতে যখন ছোট এক খানি তেলধুতি পরিয়া কাচা খুলিয়া গাত্রে তৈল মর্দ্দন করেন এবং বামহস্তে হুঁকা ধরিয়া ধূম উদ্গীরণ করেন, তৎকালকার সে রূপ যে দেখিয়াছে সে পৃথিবীকে সংয়ের আড্ডা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। পোষাকদের ষড়রিপু নাই, কিন্তু যাই তাহারা অস্থিচর্ম্মময় মানব দেহে সংযুক্ত হয়, অমনি যেন অভিমান অহঙ্কার শতধা হইয়া জ্বলিতে থাকে। ঠিক যেন তাহারা মনুষ্যের পাপরিপুর রিফ্লেক্টার। ভিতরে কোন গুণ জ্ঞান

থাক আর না থাক, সোণার চসমা নাকে, সালের যোড়া গায়, সামলা মাথায় একটা মূর্ত্তি দেখিলেই প্রাণটা চমকিয়া উঠে। পোষাক খুলিলে আসল মানুষ ছোট বড় প্রায় সমান। কাপড়, গহনা, তৈল, রং, গন্ধদ্রব্য চন্দন,. ভস্ম, গঙ্গামৃত্তিকা, রুদ্রাক্ষমালা, গেরুয়া এ সকল সংয়েদের সজ্জা। সুন্দরী যুবতী আয়না ধরিয়া নানা প্রকারে কেশ বিন্যাস, গাত্র সংস্কার করিয়া বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া গালে আল্তা, ঠোঁটে আল্তা মাখিয়া সং সাজিতেছেন। বৈষ্ণব বাবাজী নাকে কানে বক্ষে তিলক ছাপ অঙ্কিত করিয়া নামাবলী দ্বারা অঙ্গ, এবং দীর্ঘ শিখা দ্বারা মুণ্ডিত মস্তক শোভিত করিতেছেন। গাঁজাখোর সাধু সন্ন্যাসী সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপনপূর্ব্বক কুটিল জটাজাল বয়ন করিতেছেন। ভগ্নদন্ত পক্ককেশ বৃদ্ধ কৃত্রিম দাঁত পরিতেছেন। সময়ে ঘরে বসিয়া যখন সে গুলি তিনি খোলেন, তখনকার মূর্ত্তি অতি অপরূপ! তাঁহার পাকা চুলের কলপ যখন পুনরায় শাদা হইয়া আইসে, তখন নিজমূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রৌঢ়া সুন্দরীর মাথায় এক গাছিও চুল নাই, ঠিক যেন বিল্ব ফলটী; অথচ তাহাতে সুন্দর ধর্ম্মিল্ল শোভা পাইতেছে। কেহ পায়ের গোদ ঢাকিবার জন্য মোজা পরিয়াছে, কেহ গলগণ্ডের উপর কম্ফটার বাঁধিয়া তাহাতে দাড়ি ঝুলাইয়া দিয়াছে। কেহ অন্ধচক্ষে কাচ বসাইয়াছে। কেহ চর্ম্মরোগ লুকাইবার জন্য পাউডার মাখিয়াছে। স্ব স্ব অভিনয় সমাপ্তির পর যখন এই সকল আদমসন্তানগণ গৃহে গিয়া নিজমূর্ত্তি ধরেন, তখন ইহারা বাস্তবিক সং কি না ভাবিয়া দেখ। রোগ শোক, দারিদ্র্য এবং বার্দ্ধক্য এই সমস্ত সং দিগকে বর্ষে বর্ষে নানারূপে বহুরূপে সজ্জিত করিতেছে। ভিতরে কারীগর বসিয়া কল টিপিতেছেন, আর সংগুলা নানা রঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক, এক জন বেশ অভিনয় করে। আবার অনেকে আপনাপন অংশ ভুলিয়া গিয়া বড় রস ভঙ্গও করে; প্রকাশ্যে যা দেখায়, গৃহে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; একাকী গোপনে আরো বিশ্রী। কেহ ঠাকুর সাজিয়া ভূতের অভিনয়, কেহবা ভূত সাজিয়া ঠাকুরের লীলা প্রদর্শন করে। এক সময় যিনি দেবতা অন্য সময় তিনিই আবার হনুমান। পাদরী লম্বা কাল পোষাক পরিয়া সভায় বক্তৃতা করিতেছেন, গৈরিক পরিচ্ছদধারী যোগী সন্ন্যাসী চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছেন, সটাকমস্তক আচার্য্য অধ্যাপক চস্‌মা নাকে গম্ভীরভাবে ছাত্র শিক্ষা দিতেছেন, রাজা রাজপুরুষেরা আগে পাছে ঘোড়সওয়ার

লইয়া চারি ঘোড়ার গাড়ী হাঁকাইতেছেন, তাঁহাদের আশে পাশে অমাত্য সহচর। সুন্দর সুন্দরীরা বিচিত্র বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া দিক আলো 'করিয়াছেন, রূপ দেখিয়া দর্শকবৃন্দের চক্ষে চটক লাগিয়া যাইতেছে। সাধু বেশধারী সন্ন্যাসী, গোস্বামী মহান্তগণকে দেখিয়া লোকে কৃতাঞ্জলি করিতেছে, মাথা নোয়াইতেছে। এ সব অতি চমৎকার দৃশ্য। রাজা ঠিক যেন রাজার মত গম্ভীর প্রকৃতি, অল্পভাষী; মন্ত্রী সহচরও তদনুরূপ। বাচাল কেবল মোসাহেবগুলা। ধনী, জ্ঞানী, সাধু, যোদ্ধা, বীর, সুন্দরী নারী সকলেই ঠিক আপনাপন পদকে অকৃত্রিম বলিয়া মনে করিতেছে এবং তদনুরূপ ভাবভঙ্গী রীতি নীতি দেখাইতেছে। কেহ যদি কাহারো পদ-মর্য্যাদা একটু ভঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহারা বড়ই বিরক্ত হয়। যেন ধর্ম্ম নষ্ট হইল মনে করে। স্ব স্ব পদের অভিমানটী ইহারা সুন্দররূপে অভিনয় করিতে পারে। একটু এ দিক ও দিক হইলে, অমনি বলে চোপ্‌রাও! বেয়াদবি মৎ কর! আমি এই সব দেখি শুনি, আর হাসিয়া বলি, বা! বা! অতি উত্তম! অতি উত্তম! ভাল যাত্রা অভিনয় দেখিলে কাহার না আহ্লাদ হয়? আমাকে এইরূপে যেখানে সেখানে যার তার সম্মুখে হাসিতে দেখিয়া লোকে ধমক দিত, কেহ পাগল বলিয়া মারিতে আসিত। তাদের অভিনয় আবার আরো চমৎকার! ধরিতে বলিলে তাহারা বাঁধিয়া আনে।"

"এক দিন একটী দিশি সাহেবকে আমি কালাচাঁদ বাবু বলিয়া ডাকিয়া-ছিলাম, তাহাতে তিনি এবং তাঁহার শ্রীমতী বিবি আমাকে ইম্পার্টিনেণ্ট ফুল বলিয়া এমনি চক্ষু লাল এবং দন্ত কিটিমিটি করিলেন, যে আমি হাসিব না কাঁদিব ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। পরে কালাচাঁদ সাহেব গম্ভীরভাবে তীব্র কটাক্ষে বলিলেন, "আমাকে মিষ্টার বলিও, বাবু আমি নই।" সে কথা শুনিয়া আমি আরো হাসিয়া ফেলিলাম। এইরূপে অনেকানেক দেশীয় স্ত্রী পুরুষ মাতৃভাষা ভুলিয়া সাহেব মেম সাজিয়া ইংরাজিতে কথা কহিতেছে। ইহাদের অভিনয় এখনো তত সুপক্ক হয় নাই।"

"এই থিয়েটারের মধ্যে আবার থিয়েটার আছে; সংয়েরা আবার সংয়ের পোষাক পরিয়া নাটক করিয়া থাকে। তাহারা কাঁদে, চক্ষে জল ফেলে, মূর্চ্ছা যায়, কিন্তু দুঃখ শোক নাই। হাসে আহ্লাদে মত্ত হয়, কিন্তু ভিতরে আনন্দ কিম্বা সুখ নাই। কেহ বা উত্তেজিত হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন আস্ফালন

করিতেছে, কিন্তু রাগ নাই। ভিতরে কোন ভাবই নাই, অথচ বাহিরে বীর করুণ শান্ত প্রেম বীভৎস এবং হাস্য প্রভৃতি সমস্ত রসের ক্রিয়া দেখাইতেছে। বারনারী সাজিয়াছেন সতী। পাষণ্ড সাজিয়াছেন পরম ভক্ত। থিয়েটারের থিয়েটার, সংয়ের সং দেখিয়া আমার বড়ই বৈরাগ্যোদয় হইল। ইহারা অর্থের জন্য রঙ্গভূমি খুলিয়া এই কৃত্রিমতা দেখাইতেছে, অপর সকলে ঘরে ঘরে প্রতি দিনের জীবনে স্বভাবতঃ দেখাইতেছে। হায় সমস্তই যদি নাট্যাভিনয়, তবে সত্য কি? অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য মানবাত্মা আপনার ভিতর হইতে কি এই সকল বিচিত্র বাহ্যাবরণ উৎপাদন করিয়াছে? না ভৌতিক প্রকৃতি ইহার নির্ম্মাতা? দুয়ে এমনি জড়িত, যে কে আগে, কে পরে পৃথক করা কঠিন। আসল মানুষত সেই চিদ্বস্তু, অনন্ত চৈতন্যের অণুকণা; তবে এ সমস্ত আবান্তরিক জঞ্জাল কোথায় হইতে আসিল? চেতন হইতে জড়, না জড় হইতে চেতন? অথবা চেতনই বা কি, জড়ই বা কি? কিছুই বুঝিবার যো নাই, সকলই ঠাকুরের লীলা। তিনিই কেবল ইহার মর্ম্ম জানেন। জড়চৈতন্যের গূঢ় রহস্য ভাবিতে ভাবিতে মাথাটা কেমন করিতে লাগিল। তাই নগরপ্রান্তে নদীতটে গিয়া ক্ষণকাল চক্ষু বুজিয়া বসিয়া রহিলাম। তদনন্তর অনেক ক্ষণ পরে স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া শান্তি লাভ করিলাম।"

"এইরূপে আত্মাকে বার বার জড়পদার্থের সহিত মিশিতে এবং আবদ্ধ হইতে দেখিয়া এবার আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, দুইটাকে দুই জায়গায় একবারে চিরদিনের মত তফাত করিয়া ফেলিতে হইবে। কেন না, ভৌতিক পদার্থের সহিত মেশামিশি মাথামাখিতে আত্মা ক্রমে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। অতঃপর শরীরটাকে খুব নিংড়াইতে আরম্ভ করিলাম। আখের ভিতর হইতে যেমন রস, ফুলের ভিতর হইতে যেমন আতর, দুধের ভিতর হইতে যেমন মাখন বাহির করে, তেমনি দেহের সমস্ত পরমাণুর ভিতর হইতে আত্মাকে নিংড়াইয়া স্বতন্ত্র করিলাম। মাখন তুলিয়া তার পর তাহাকে ঘোলের ভিতর ফেলিয়া রাখিলে দুইয়ে আর মিশ খায় না। দেহের প্রত্যেক জড় পরমাণুর ভিতর হইতে আত্মাকে টানিয়া স্বতন্ত্র করা কি সহজ কথা! টানাটানিতে ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায় তথাপি খসে না। হাড়ে মাসে এক কালে জড়িত। জড়মুক্ত আত্মার শৈশবাবস্থা ইক্ষু রসের মত তরল পদার্থ। ক্রমে তাহাকে পরিপাক করিয়া গুড়, গুড় হইতে খাঁড়, তাহা হইতে চিনি, চিনি হইতে মিছরি। দেহটা ছায়ার মত কাছে কাছে ঘুরিয়া

বেড়ায়, কিছুতেই সঙ্গ ছাড়িতে চাহে না; তাহার পাছে আবার তাহার ছায়া। যাই হউক, আমি আর তাহাকে বড় একটা গ্রাহ্য করিলাম না। এক্ষণে আমি চিন্ময়রূপে সর্ব্বত্র আকাশের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলাম।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

একেত আত্মারাম উদ্ভট জীব, তাহার উপরে এখন আর এক অদ্ভুত আত্মিক প্রকৃতি ধারণ করিলেন। এত দিনে আত্মারাম নামের প্রকৃত অর্থ নিষ্পন্ন হইল। এই অবস্থায় তিনি মনুষ্য স্বভাবের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি এবং তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রিয়া আধ্যাত্মিক দিব্য চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। আবরণোন্মুক্ত মনুষ্য স্বভাবের অভ্যন্তরে অনন্ত চিদানন্দের মহাসমুদ্র, তাহার ভিতর আত্মারামের স্থিতি।

একদা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক পুষ্করিণীর স্থির জলের কূলে গিয়া তিনি উপবিষ্ট হন। তাঁহার অন্তর্ভেদী জ্ঞানদৃষ্টির নিকট এখন আর কোন ব্যবধান তিষ্ঠিতে পারিল না। আধ্যাত্মিকতার আতিশয্য বশতঃ তিনি দৃশ্যমান জড় জগৎকেও চিৎরূপে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। চিদাচিৎ সমস্ত একাকার। সেই অবস্থায় হঠাৎ স্বচ্ছ সলিলদর্পণে দৃষ্টি পড়িবামাত্র নিজ দেহটী নয়নগোচর হইল। অনেক কাল অবধি দেহের সংবাদ লওয়া হয় নাই, সে আপনি আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত এবং বহু প্রকারে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেক দিন পূর্ব্বে যৌবন কালে আরনায় একবার তিনি নিজমুখ দেখিয়াছিলেন, এখন আর তাহার কিছুই মনে নাই। অর্থাৎ আত্মারামের দেহ আত্মারামের নিকট এক প্রকার অপরিচিত ছিল। স্বভাবের নিয়মে এখন সে দেহের নানা স্থানে নানারূপ আকার প্রকার উদ্ভূত হইয়াছে। মস্তকের কেশরাশি সুদীর্ঘ অর্দ্ধপক্ক এবং রুক্ষ জটাজড়িত, ভ্রূযুগলে ঘন নিবিড় রোমাবলী, তন্মধ্যে উজ্জ্বল মণির ন্যায় দুইটী চক্ষু জ্বলিতেছে। মুখমণ্ডল, বাহু, বক্ষস্থল এবং অন্যান্য অঙ্গের সহিত এই বিশাল বপু দর্শন মাত্র তিনি অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যেন অন্য কোন লোকের একটা অপরিচিত মূর্ত্তির সহিত সহসা তাঁহার দেখা হইল। আপনার দেহ আপনি চিনিতে না পারিলে কিরূপ অবস্থা হয় সকলে ভাবিয়া দেখুন। এ সময়কার তাঁহার মনের ভাব নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"যখন আমি প্রথমে আপনার মূর্ত্তি জলদর্পণে দর্শন করিলাম, তখন আপনাকে আপনি চিনিবার জন্য ক্ষণ কাল ভাবিতে হইল। ভাবিলাম, আপনাকে আপনি চেনা যায় কিরূপে? সাধারণতঃ লোকে শরীর দেখিয়া আপনাকে আপনি চিনিয়া লয়। পাছে কোন গোলমাল হয়, এই ভয়ে মরিবার পূর্ব্বে ফটোগ্রাফ চিত্রপট ইত্যাদি অঙ্কিত করিয়া রাখে। কিন্তু বেশী ক্ষণ আমাকে এ জন্য ভাবিতে হইল না। শরীরের সহিত আলাপ পরিচয় থাক না থাক, আমি যে সেই পূর্ব্বকার একই আমি, তাহা বেশ বুঝা গেল। পরিবর্ত্তনশীল দেহের সহিত সে জ্ঞানের সঙ্গে কোন সংস্রব নাই। প্রত্যেক মনুষ্যের একটা স্থায়ী অপরিবর্ত্তিত অস্তিত্ব অবশ্যই শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়, ঘোর পরিবর্ত্তনেও তাহা থাকে।"

"আচ্ছা বল দেখি, তোমরা কি কখন কেউ ভূত দেখেছ? আমি ভূত দেখিছি। কে বলে ভূত দেখা যায় না? পালে পালে ভূত পেত্নী সকল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ভূতভাবন ভগবান্ ভবশ্মশানে ভূত এবং মহাভূতদিগকে লইয়া কতই রঙ্গ করিতেছেন! যে দিন আমি প্রথমে জলের উপর নিজ দেহের ছায়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলাম সেই দিন আমার প্রথম ভূত দেখা হইল। তদনন্তর চারিদিকে গ্রামে নগরে পথে প্রান্তরে জলে জঙ্গলে দেখি যে কেবলই ভূত। ভূত ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কেহ দৌড়িতেছে, কেহ নীরবে বসিয়া ঢুলিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে; কেহ বোঝা মাথায় ছুটিতেছে, কেহ খাইতেছে, কেহ ঘুমাইতেছে; কেহ মাথায় টোপর দিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছে, কেহ রাগিয়া দাঁত খিচাইয়া বকিতেছে, কেহ বা গীত গাইয়া নাচিতেছে; কোথাও ভূতের যজ্ঞ, কোথাও ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ, কোথাও ভূতের মেলা; মহাসমারোহ কাণ্ড কারখানা। নানা প্রকারের ভৌতিক মূর্ত্তি সকল যেখানে সেখানে দেখিতে পাইলাম। কোন বাড়ীতে দেখি, এক দল ভূত পেত্নী জীবনলীলা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর এক দল সম্পূর্ণ নূতন তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে।"

"আমি ভূতের রাজ্যে আসিয়া ভূতের অন্তর্ভূত হইয়া এখন যে ভূতের গল্প বলিতেছি, তাহা শুনিয়া কেহ যেন বিরক্ত না হন। আমার অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে যখন যাহা উদয় হইয়াছে, তখন আমি তাহাকে সেই ভাবেই দেখিয়াছি। আপনাকে যাঁহারা মানব মানবী, কিম্বা দেব দেবী বলিয়া বিশ্বাস

করেন তাঁহাদের কথা আমি পরে বলিব। ভূতের মধ্যে দেবতাও অনেক দেখা যায়। কারণ, ভূতত্বের সঙ্গে দেবত্ব মিশ্রিত। ভগবান যখন সর্ব্বভূতময় তখন এখানে দেবত্বেরই বা অভাব কি?"

"ভৌতিক জগতে ভূতসমাজে ভূতের খেলা অনেক প্রকার। গৃহে গৃহে, পথে আফিসে, হাটে বাজারে, সভায় ভজনালয়ে, রাজদরবারে, পার্লমেণ্টে থিয়েটারে শাদা কাল ভূত পেত্নীদের কত যে রঙ্গ তাহা আর বলিয়া শেষ করিতে পারি না। তাহাদের কত মতামত, কত কীর্ত্তি, কত রকমের খেয়াল! বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক মত, সামাজিক, রাজনৈতিক বিচার, তর্ক শুনিতে শুনিতে মাথা ঘুরিয়া যায়। আমি মধ্যে দিন কয়েকের জন্য এক বার ভূতের হাতে পড়িয়াছিলাম। কাহার কথা শুনিব, কোন্ পথে যাব, কি করিব, এই ভাবনায় অভিভূত হইয়া শেষ পথ ভুলিয়া যাই। এক দিন ঘুমের ঘোরে আন্দাজে আন্দাজে ভূতের দলের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। পরে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি, চারিদিকে অন্ধকার আকাশ ধূ ধূ করিতেছে। অন্ধকার এমনি ঘন গভীর, যেন গায়ে ঠেকে। প্রবল পবনে আঁধার সাগরে যেন ঢেউ খেলিতেছিল। প্রাণ শূন্য, পথ শূন্য, অন্তর বাহির সমস্তই শূন্যময়। এমন সময় প্রাণের সেই শূন্য অন্ধকার মধ্যে পবিত্রাত্মা (হোলিঘোষ্ট) আসিয়া বলিলেন, 'কোথায় যাইতেছ? এ পথে গেলে মারা পড়িবে, বুঝিয়া চল। ভূতে যেন না ধরে, সাবধান!"

"এই কথা শুনিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলাম। খানিক পরে দেখি যে, দলে দলে ভূত পেত্নী হাস্য কোলাহল করিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ কেহ আমার ঘাড়ের উপর দিয়াই চলিয়া গেল। যে আসে সেই দুইটা উপদেশ দিয়া যায়। কিন্তু আজ যার মুখে এক প্রকার কথা শুনি, কাল সে তাহার ঠিক উল্টা কথা বলে; এবং তাহার সঙ্গে একটা যুক্তি, একটা বিশেষণ যুড়িয়া দেয়। তাহাদের মূল কথাও যেমন দুর্ব্বোধ্য, টীকা ব্যাখ্যা তদপেক্ষা আরো জটিল। কাহারো মতে মত না দিয়া আমি এক স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, তদ্দর্শনে সকলেই বলিতে লাগিল, ইহাকে ভূতে পাইয়াছে।"

"খানিক ক্ষণ পরে এক জন খুব বিজ্ঞ রকমের চেহারা ভূতপতি সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি হে চিন্‌তে পার কি?" তাঁহার নাম বুদ্ধিমন্ত। আমি বলিলাম, না চিনিতে পারিলাম না। তিনি অগ্রে কাহিল ছিলেন, ইদানী কিছু মোটা হইয়াছেন, কাজেই আমি চিনিতে পারিলাম

না। যদিও নামটা জানা শুনা বটে, কিন্তু মতগুল সব নূতন, এবং নবীন নবীন যুক্তিতে গাঁথা। যদি মূর্ত্তি এবং মতামত উভয়ই বদল হইয়া যায়, তাহা হইলে এক জন আর এক জনকে কি চিহ্ন ধরিয়া চিনিবে? কিন্তু এ দেশের একটী বড় মজার ব্যাপার দেখা গেল; কেউ কাহাকে চেনে না, অথচ ভূতপরিবারের অন্তর্গত একটী ভূত বলিয়া সকলেই সকলকে বেশ চিন্‌তে পারে। যে চিহ্ন ধরিয়া চিনা পরিচয় হয়, সে সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল; অথচ এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীলতাই ভূত চিনিবার এক মাত্র উপায়। যাহাদের স্থিরতা এবং দৃঢ়তা আছে তাহারা অদ্ভুত বলিয়া পরিগণ্য। আর এক কৌতুকের বিষয় এই, ভূতেদের ভূত কাল নাই। কাল কি করিয়াছে বলিয়াছে, আজ তাহা ভুলিয়া যায়। কোন একটা সত্যের নিত্যত্ব ইহাদের রাজ্যে কেহ মানে না। কেবল অস্থায়ী বর্ত্তমান ইহারা মানে। ভূত কালের উপকার, সাধুতা, সত্য সিদ্ধান্ত, প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকার এবং মতামত সমস্তই ভূতগত ব্যাপার। কি হাত এখন দলিল দস্তাবেজ লইয়া কাঁহাতক ধরা পাকড়া করা যায়। ধরা পড়িলেও তাহারা যুক্তি, কারণ, বিশেষ কারণ দেখাইয়া ভূতকালের জীবন একবারে অস্বীকার করে। আমি ভূতদিগের বর্ত্তমানের সঙ্গে ভূত কালের মতামত অনুষ্ঠান যত মিলাইতে যাই, প্রতি পদে পদে অপদস্থ হই। ইহাদের সত্যত নিত্য নয়, সুতরাং আমি কাহাকেও আর ধরিতে ছুঁইতে পাই না। তাহারা দলে পুরু, হাসিয়া বলে, "তোকে হোলিঘোষ্টে পাইয়াছে, অতএব তোর কিছু মাত্র বুদ্ধি নাই।"

"পৃথিবীতে ভূতের বড়ই উৎপাত! পরস্পরে দিন রাত্রি কেবল কামড়াকামড়ি চুলোচুলি কিলোকিলি খেয়োখেয়ি মারামারি বকাবকি গালাগালি করিতেছে; যত ক্ষণ ইহারা ভূতের বোঝা ঘাড়ে লইয়া ভূতের ব্যাগার খাটে, তত ক্ষণ অপেক্ষাকৃত একটু ঠাণ্ডা; অবশিষ্ট সময় কেবল গণ্ডগোল চীৎকার। বস্তুতঃ মানুষের মনের ভিতরটা যেন শত সহস্র ভূতের আড্ডা। সমস্তগুল যদি বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ইহাদের মনে ভয় বিলক্ষণ আছে। ভূতপতি ভগবানের ইঙ্গিতে ইহারা মস্তক অবনত করে। কিন্তু ভূতেরা খুব কাজের লোক। বড় বড় ট্রেণগুল জড়ভূতে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, দুই একটা চেতন ভূত কেবল তাহার পরিচালক নিয়ামক। কয়লার খনিতে, বড় নর্দ্দামার ভিতরে, নীলের হউজে ভূতগণের অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখা যায়। কাল

ভূত অপেক্ষা শাদা ভূতগুল অনেক খাটিতে পারে। এত সব ভূতের রাজ্যে বাস করিয়া, লোকের ভূতের ভয় কেন যায় না, আমি তাই ভাবি। দেহটা যখন নড়ে ,চড়ে, দৌড়িয়া যায়, কিম্বা ঘুমায় এবং জাগিয়া উঠে, তাহার মধ্যেই ভূত লুকাইয়া থাকে। অর্থাৎ আমরা প্রতি জনেই ভূত, ইচ্ছা করিলেই তাহাকে দেখিতে পাই। পঞ্চভূতের মধ্যে বড় ভূত, তাহার অভ্যন্তরে নিরাকার চৈতন্য ভূত লুকাইয়া কতই মতলব আঁটিতেছে। ভূতের কার্য্য অতিশয় অদ্ভুত, তাই দেখিয়াও কেহ বুঝিতে পারে না। ভূত কি আর গাছে ফলে? যখন ইন্দ্রিয়গণ উত্তেজিত, রিপু সকল প্রকুপিত হয়, তখন ভূতের লড়াই লাগিয়া যায়। স্থূল এবং সূক্ষ্ম ভূত উভয়ে মিলিয়া মানব জীবন। এ সংসারে ভূতের মেলায় কেবল ভূতেরই খেলা।"

"এইরূপে ভূত দেখিতে দেখিতে শেষ নদীতীরে শ্মশান ঘাটে আসিয়া আমি উপস্থিত হইলাম। নগরের ঘরে ঘরে, বাজারে আফিসে যে সকল ভূত দেখিয়াছিলাম, একে একে দেখি যে সকলে এই খানে আসিয়া ভস্মীভূত হইতেছে। রাজা প্রজা, ছোট বড়, কাল শাদা, সুন্দর কুৎসিত, উচ্চ নীচ সব সমান। এখানে কাহারও আর কোন অহঙ্কার দৌরাত্ম্য নাই, সকলেই শান্ত ভাবে মহানিদ্রায় অভিভূত। প্রত্যেকের বিশেষত্ব ভিন্নতা সর্ব্বভুক হুতাশনে জ্বলিয়া পুড়িয়া একাকার হইয়া যাইতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্থূল ভূতগণ অবশেষে সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম ভূতের সহিত আকাশে লয় পাইতেছে। ইহাদের পরিণাম দেখিয়া আমার মনে নানা ভাবের উদয় হইল। সে দিন যাহাদিগকে শবদেহ স্কন্ধে এখানে হরি ধ্বনি করিতে দেখিলাম, তাহারাই আবার শব হইয়া জীবিতদিগের স্কন্ধে চাপিয়া আসিতেছে। বাসনানলে, পাপানলে, পরিশেষে চিতানলে জ্বলিয়া মৃত্যুর মহানির্ব্বাণে সকলে এই খানে হাড় জুড়ায়। মরণটা বড় ভাল জিনিষ। বিচারালয়, পুলিস, পল্টন, শিক্ষকের শিক্ষা, আচার্য্যের উপদেশ, সমাজের শাসন; এমন কি, রোগ শোক বিপদে যাহা না পারে, মৃত্যু মুহূর্ত্তে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া দেয়।"

"শ্মশান দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। ভাবিলাম, হায়! এত আয়োজন পরিশ্রম, এত আশা কল্পনা উৎসাহ, শেষে কি না সব ভস্মসাৎ! কিন্তু শ্মশানের মত এমন শান্তির স্থানও আর কোথাও নাই। জীবিত ভূত অপেক্ষা মৃত ভূতেরা বড় ভদ্র লোক। ক্রোধে যে প্রচণ্ড ভীম মূর্ত্তি ধরিত, এখানে সে ঠাণ্ডা বরফের মত। জ্ঞান ধন পদমর্য্যাদায় যিনি অহঙ্কারে

পৃথিবীকে সরার ন্যায় দেখিতেন, এখন তাঁর মুখে একটা কথাও নাই; ক্রোধকষায়িত কুটিল নয়ন এখন যেন ধ্যানস্তিমিত। লোভ স্বার্থে অন্ধ হইয়া বিলাস ভোগের জন্য যে অসুরের মত বেড়াইত, সে এখন সর্ব্বত্যাগী পরম বৈরাগী। যাঁহারা সৌন্দর্য্য গর্ব্বে স্ফীত হইয়া কদর্য্য মূর্ত্তিকে ঘৃণা করিতেন তাঁহারা এখন কৃষ্ণকান্তি ভূত পেতিনীর মত বিকট বদনে চক্ষু কপালে তুলিয়া শুইয়া আছেন। কুটিলবুদ্ধি ক্রূর চক্রীর কুচক্রে পড়িয়া ভাই তুমি বড় কষ্ট পাইয়াছ? ব্যস্ত হইও না, একটু বসিয়া অপেক্ষা কর, মৃত্যু তাহাকে শীঘ্রই সরল নম্র করিয়া এই খানে আনিবে। অহঙ্কারীর বাক্যবাণে, অপমানে তোমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে? আহা! সে জন্য আর কাঁদিও না, অশ্রুজল মোচন কর; এক দিন তাহার সকল গর্ব্ব এই খানে চূর্ণ হইবে। ভূতের রাজ্যে ভৌতিক দেহ লইয়াই যত কিছু আস্ফালন বই ত নয়। যাই সে রোগে শক্তিহীন দুর্ব্বল হইল, অমনি তাহার মন নরম, কথা মিষ্ট, ভাব নম্র। মরিবার পূর্ব্বে সকলের সঙ্গে সে পুনর্ম্মিলিত হয়, যাহার অনিষ্ট করিয়াছে তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চায়। আহা কি আশ্চর্য্য স্বর্গীয় সময়! এই জন্য বলি, মরণটী বড়ই উপকারী। সে চিররোগী, অন্নচিন্তাকুল, নিরাশভগ্ন শোকার্ত্ত এবং অনুতপ্ত আত্মার পরম বন্ধু। মৃত্যু অহঙ্কারীকে বিনয়ী, দুষ্টকে নিরীহ, নাস্তিককে আস্তিক করে। মৃত্যুর লীলা স্থান এই শ্মশান ঘাটে ঘাড় নোয়াইয়া, দাঁত বাহির করিয়া, চক্ষু বুজিয়া, হাত পা ছড়াইয়া নীরবে ভূত সকল উপনীত হয়, পরে চিতানলে জ্বলিয়া পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। ত্রিভুবন খুঁজিলেও আর তাহার সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে না। পরিশেষে হরিবোল হরি!”

“অনন্তর শ্মশান পরিত্যাগপূর্ব্বক অদূরে এক সমাধিক্ষেত্রে আসিয়া আমি উপস্থিত হইলাম। পথশ্রান্তি বশতঃ চক্ষে বড় ঘুম আসিয়া পড়িল। একটী ক্ষুদ্র মঠের ভিতর তখন শয়ন করিলাম। চিন্তাভারাক্রান্ত ক্লান্তদেহে অগাধ নিদ্রায় নিমগ্ন রহিয়াছি, রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কোথাও কেহ নাই, বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে সমাধিক্ষেত্র, আশে পাশে চারিদিকে সমাধি স্তম্ভ। উন্মাদ পবন আলু থালু বেশে বৃক্ষ-কুঞ্জ, লতামণ্ডপ কাঁপাইয়া হাহাকার রবে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। তৎসঙ্গে দলে দলে মৃতেরা আমার চারিদিক ঘেরিয়া দাঁড়াইল। পরকালটা ইহকালের এত নিকটে আগে তাহা আমি জানিতাম না। শ্মশানের পরেই

যে পরকাল তাহা এখন দেখিতে পাইলাম। এক সময় যাহারা পৃথিবীতে কত আশা উৎসাহে মাতিয়া, অনুরাগ আসক্তিতে অন্ধ হইয়া স্বজনবর্গের সহিত সুখে ঘরকন্না করিত, তাহারাই এই সমাধিক্ষেত্রে নীরবে মাটীর তলে শুইয়া রহিয়াছে। আমাকে নিকটে পাইয়া যেন সকলে তাহারা জাগিয়া উঠিল এবং ইহলোকের অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিল। মৃতদিগের উপদেশ বড়ই হৃদয়গ্রাহী, তাহাতে আমি অনেক সার শিক্ষা লাভ করিলাম। যেখানে জীবিতদিগের কোলাহলপূর্ণ বাস ভবন, তাহার পার্শ্বেই সমাধি ক্ষেত্র, ইহা দেখিয়া আমার ইহপরকালের ভেদ জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। সেই সঙ্গে মৃত্যুভয়টাও একেবারে চলিয়া গেল। মরিব সে জন্য আর এত মায়া মমতা কেন? যাঁহাদের আদর সোহাগ করিবার অনেক লোক, তাঁরা মনে করেন, আমরা মরিলে পৃথিবী বুঝি কেঁদে একবারে পাগল হয়ে যাবে। এত আদর কাড়ানো ভাল নয়। কত সোণার চাঁদ, রূপবান গুণবান্ মরিতেছে, কে কার জন্য কত দিন কাঁদে? সহজে বিনা আড়ম্বরে মরাই ভাল। মৃত্যু সচরাচরই ঘটিতেছে, আপনার লোকেরাও মরিয়া যাইতেছে, তথাপি মৃত্যুভয় যায় না কেন?"

এই শ্মশান এবং সমাধি দর্শনের পর আত্মারাম পরলোকগমনের জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। তদনন্তর ইহজীবনের চরম লক্ষ্য সাধনে অভিলাষী হইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন। পুনর্ব্বার পরিবারবর্গের সহিত মিলন, তৎসঙ্গে শেষ জীবনে কিছু কাল অবস্থান, আত্মীয় স্বজনদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দান, এই কয়টি বিষয় তাঁহার এখন বাকী। তার পর জরা বার্দ্ধক্য মৃত্যু অতিক্রম পূর্ব্বক পরলোকে গমন।

তৃতীয় অধ্যায়।

আমাদের পরিব্রাজক বন্ধুর অদ্ভুত বেশ ভূষা, বেদবিধিবহির্ভূত উদ্ভট আচরণ দেখিয়া নগরবাসীরা কেহ তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিত, কেহ কেহ বা দয়া পরবশ হইয়া ডাকিয়া কাছে বসাইত, এবং যত্নপূর্ব্বক আহার পান করাইত। তজ্জন্য তিনি যে বিশেষ কিছু অনুরাগ উৎসাহ প্রকাশ করিতেন তাহা নয়, কেমন যেন এক প্রকার নিঃসঙ্গ উদাসীন ভাব। কিছু দিলেও যা, না দিলেও তাই। মধ্যে মধ্যে একটী দয়াবতী

মহিলা তাঁহাকে আদর পূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া আহার করাইতেন। উদাসীন পথিক আত্মারাম কোথায় কোন্ দিন থাকেন, তাহার ঠিক নাই। কখন শ্মশানে সমাধিক্ষেত্রে, কখন লোকালয়ে। কিন্তু যখনই ঐ নারীর গৃহদ্বারে তিনি উপস্থিত হইতেন, তখনই অতি যত্নসহকারে তাঁহা কর্ত্তৃক সেবিত হইতেন। দুই পাঁচ দিন এইরূপে তাঁহার সেবা করিতে করিতে স্ত্রীলোকটীর মনে এক প্রকার অননুভবনীয় প্রেমভাব উদয় হইতে লাগিল। তজ্জন্য কখন কখন তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিত, চক্ষে জল পড়িত। এইরূপে দুই পাঁচ দশ দিন যায়, এক দিন আর থাকিতে না পারিয়া স্ত্রীলোকটী সহসা আত্মারামের হাত ধরিয়া ফেলিলেন। তাহাতে উভয়েরই শরীর রোমাঞ্চিত হইল। আত্মারাম যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সচকিত ভাবে বলিলেন, "তুমি কি আমার পরিচিত আত্মীয় কেউ হও?" [স্ত্রী] হাঁ, আমি তোমার সেই হতভাগিনী পরিত্যক্তা স্ত্রী। ইতঃপূর্ব্বে ঐ নারীর বৈরাগ্য বেশ, বিনীত মধুর বচন এবং সুকোমল ব্যবহারে তিনি কথঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে পরিচয় পাইয়া অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহার মুখে এক অপূর্ব্ব হাসির ছটা দীপ্তি পাইল। অনেকে বলে, যে তেমন হাসি আত্মারামের পূর্ব্বে কিম্বা পরে আর কখন দেখা যায় নাই।

আত্মারামের পিতা বহু কাল পূর্ব্বে লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পরিবার সন্তানাদি এক্ষণে নগরমধ্যে অধিবাস করিতেছেন। তাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, ছেলেগুলি উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছে, তাহাদেরও সন্তানাদি জন্মিয়াছে। প্রকাশ্য রাজপথের উপরেই তাহাদের বাড়ী। আত্মারাম তাহার সম্মুখ দিয়া কত শত বার গমনাগমন করিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রী স্বামী, পিতা পুত্রে চেনা পরিচয় হয় নাই। স্বামীর নিরুদ্দেশের সময় হইতে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেন। তাঁহার পরিচ্ছদ মলিন, অতি ক্ষীণ কায়, কেশ রুক্ষ; ধর্ম্মকর্ম্ম জপ তপ এবং অতিথিসেবায় তাঁহার সমস্ত দিন অতিবাহিত হইত। সহধর্ম্মিণীর সহিত পুনর্ম্মিলনের পরবর্ত্তী ঘটনা আত্মারামের মুখে আমরা এইরূপ শুনিয়াছি।—

"অনেক কাল পরে পরিচিত পুরাতন স্ত্রীকে দেখিয়া আমার ভারি আনন্দ হইল। তখন হাসিয়া বলিলাম, "তোমায় বড় সুন্দর দেখিতেছি। পূর্ব্বে আমি তোমায় প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিও নাই চিনিতেও পারি নাই. কেবল অস্থি

চর্ম্ম এবং বস্ত্রালঙ্কারে ঢাকা একটী নারী মূর্ত্তি দেখিতাম। এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যের নির্ম্মল জ্যোতির আলোকে তোমার অন্তরাত্মা দেবীপ্রকৃতি যেন দেহের উপরিভাগে বিজলীর ন্যায় খেলা করিতেছে। বেশ! বেশ! বড় সুখী হইলাম।" এই কথার পর আপনাপনি আমার মস্তক স্ত্রীর চরণে অবনত হইল। আমি ভক্তিসহকারে তাঁহাকে একটী প্রণাম করিলাম। ইত্যবসরে বাড়ীর ছেলে মেয়ে বউ ঝি নাতি নাতিনী ছোট ছোট বালক বালিকার একটি দল আসিয়া আমার চারি দিক একবারে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বশুদ্ধ সংখ্যায় তাহারা প্রায় বিশ পঞ্চাশ জনের কম নয়। তাহারা কেহত আমায় চেনে না, কেবল নাম শুনিয়াছে মাত্র; কাজেই সকলে উৎফুল্ল হইয়া আমার অদ্ভুত মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। কেহ কেহ ভয়ও পাইয়াছিল। তার পর আমি কে তাহা জানিতে আর বড় বিলম্ব হইল না। তখন প্রণাম নমস্কারের ভারি একটা ধুম পড়িয়া গেল। ছেলে মেয়েরা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রী স্মিতমুখে প্রশান্ত দৃষ্টিতে এই সুন্দর শুভসম্মিলন দেখিয়া নীরবে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দৃশ্যটী বাস্তবিকই বড় রমণীয় এবং স্বর্গীয় হইয়াছিল। এক সঙ্গে এতগুলি মানবাত্মার উত্তপ্ত অকৃত্রিম স্নেহ প্রেম শ্রদ্ধা ভক্তি যদি হঠাৎ এক অপরিচিত উদাসীনের উপরে আসিয়া পড়ে, ভাবিয়া দেখ তাহার মনের কি অবস্থা হয়। কেন সকলে না বুঝিয়া সুজিয়া আমায় এত ভালবাসিল, আমি তাহার কারণ অবধারণ করিতে পারিলাম না। শেষ মনে মনে বুঝিতে পারিলাম, অসার সংসারের এই অংশ টুকুই সার এবং অতি উপাদেয়; ইহার ভিতর স্বর্গীয় আধ্যাত্মিক মধুরিমা আছে।"

"তদনন্তর তাড়াতাড়ি সকলে নাপিত ডাকিয়ে এনে, চুল ছেঁটে, দাড়ি গোঁফ কামিয়ে, নখ ফেলে, তেল মাখিয়ে, নাইয়ে ধুইয়ে পরিষ্কার বস্ত্র পরিয়ে দিয়ে আমায় এক অভিনবরূপে সজ্জিত করিল। আয়নায় সে মূর্ত্তি দেখিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম। চুল দাড়ি গোঁফ কামানো পরিষ্কার মুখে বড় বড় দুই পাটি দাঁত, সে এক নূতন বিধ শোভা! কিন্তু বুঝিলাম, এটাও আমি নই, সেটাও আমি নই, মানুষের রূপ বর্ষাকালীয় আকাশের ঘনাবলীর ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল। তবে বাহ্য ব্যাপারের ভিতর অন্তরের ছায়া আছে।"

"আমাকে নব বেশে ভদ্র পরিচ্ছদে সাজাইয়া বাড়ীর সমস্ত ছেলে মেয়েরা মহা উৎসাহের সহিত সেবা পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। তাহাদের অবস্থা

কি না এখন সব খুব ভাল হইয়াছে, আর আমিও কি না প্রায় বৃদ্ধ বয়সে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, অধিকন্তু অনেক দিন দেশ ছাড়া, নানা দেশ ঘুরিয়া বহু ক্লেশ কষ্টে শীতাতপে দেহটী সুপক্ক হইয়াছিল; তাই সকলেরই মনে মনে অভিলাষ যে আমি এখন কিছু কাল বসিয়া থাকি, আর তাহারা আমার সেবা করে। ঝি চাকর সমস্ত তফাত করিয়া দিয়া নিজেরা আপন হাতে সব কার্য্য করিতে লাগিল। কেহ গায়ের ময়লা তোলে, কেহ ঘামাচি মারে, কেহ চুল আঁচড়েয় দেয়, কেহ পাখার বাতাস করে, কেহ পা টেপে, কেহ দুধ জলখাবার আনে। আমি যেন ঠিক শ্বশুরবাড়ী এসেছি। ছেলেরা বলে বাবা, বৈকালে তুমি রোজ ফেটিন গাড়ীতে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেও। ঝি বউরা বলে, বাবা, তুমি পোলাও খাবে, না লুচি ভেজে দেব? না ভুনিখিচুড়ি করিব? ছোট ছোট নাতিনীরা কাছে বসিয়া পায় হাত বুলায় আর মিষ্ট মিষ্ট করিয়া বলে, দাদা মহাশয়, তুমি গল্প কর না শুনি। আমরা তোমার পাকা চুল তুলে দিই। আমি তাদের ফুলের মত নরম নরম গালগুলি টিপিয়া আদর করিয়া বলিলাম, দিদি, পাকা চুল তুললে যে আমার মাথায় আর কিছু থাকবে না, একবারে গড়ের মাঠ হয়ে যাবে। ছোট নাতিরা আসিয়া বলে, "ঠাকুদ্দা, আমরা তোমায় কাঁধে করিয়া তুলিব।" আদরের আর অবধি নাই। ইহাদের আদর যত্ন দেখে বিবাহের সময়কার কথা গুলা সব মনে পড়িয়া গেল। মনে মনে একটু হাসিলাম। ভাবিলাম, মন্দ নয়; পরিবার জনসমাজে শ্রীহরির কতই লীলা খেলা রঙ্গ রস! তার পর সংবাদ পাইয়া বেহাই বেহান, জামাই, ভগ্নীপতি, ইষ্ট কুটুম্ব সম্বন্ধী যে যেখানে ছিল আসিয়া জুটিল। তাহারা আহ্লাদের সহিত কেহ বা ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিল, "যা হউক, এত দিনে যদি ঘরকন্নায় মন হয়েছে, তবু ভাল; এখন আমাদের লইয়া দিন কতক সাধ আহ্লাদ কর, সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। বড় বড় বিজ্ঞ ছেলে, এবং যুবক পৌত্রেরা ভারি উৎসাহ অনুরাগের সহিত বলিতে লাগিল, আপনাকে খড়কেটি ভেঙ্গে দুই খান করিতে দিব না, কেবল বসে থাক্‌বেন আর আমরা আপনার পদসেবা করিব। আমরা এত দিন খাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিলাম, তাহার সার্থকতা করিতে দিন।"

"আত্মীয় পরিজনবর্গের সেবা পরিচর্য্যা, আদর যত্নে আমি অবশ্য প্রসন্ন হইলাম, কিন্তু পূর্ব্বের মত কাহাকেও ধরা দিলাম না; যাহা কিছু

সুখ বিলাস, বাহিরে বাহিরে শরীরের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। এইরূপ আমোদ প্রমোদ আনন্দ কৌতুক হাস্যরস চলিতেছে, অল্প কাল পরে পাশের দিকে হঠাৎ চেয়ে দেখি, একটী দিব্য লাবণ্যময়ী বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারসজ্জিতা প্রৌঢ়া রমণী তথায় আসিয়া বসিলেন। আমি সহসা অন্যমনস্কের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভগ্নি! আপনি কে, আমাকে পরিচয় দান করুন। আপনি কি আমাদের কেউ হন?" যাই এই কথা বলিছি, নাতি নাতিনী ঝি বউ ছেলে মেয়ে সেখানে যতগুলি ছিল, অমনি হা হা শব্দ করিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। মহা হাস্যনাদে বাড়ী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রমণীও তৎসঙ্গে মৃদু মধুর হাস্য করিলেন। নাতি নাতিনীদের হাসি আর থামে না। আমি বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেম। ভাবলাম, এরা এত হাসে কেন? কেহ আর কিছু বলে না, কেবলই হাসে। হেসে গলে একবারে লুটিয়ে পড়তে লাগল। তখন নারী মিষ্ট স্বরে বলিলেন, "তুমি আমায় চিন্‌তে পারলে না? আমি যে তোমার সেই পুরাতন দাসী!" তা শুনে আমিও আর না হেসে থাকৃতে পারলাম না। সকলের সঙ্গে যোগ দিয়া হৃদয় ভরিয়া খুব হাসিলাম। সে এক অপূর্ব্ব শোভা। আহ্লাদের যেন হাট বাজার। জীবনে এমন আমোদ, কখন ভোগ করি নাই।"

"পরে আমি বলিলাম, তিনিই তুমি? এবং তুমিই তিনি? হা অদৃষ্ট! এই দেখলাম দীনা ক্ষীণা মলিনবসনা সন্ন্যাসিনী, এই আবার আনন্দময়ী মূর্ত্তি রাজমহিষী? ঠিক যেন সাজের ঘর থেকে নন্দরাণী যশোদার মত সেজে তুমি আসরে নাম্‌লে! (সকলের হাসি) তা বেশত মানিয়েছে দেখ্‌চি, চেনা যায় না!"

"তখন আবার সেই বসনবিজ্ঞানের কথা আমার মনে পড়িল। ভাবিলাম, হায় রে পোষাক, তুমি প্রাচীনাকেও নবীনা করিতে পার এবং চিরবসনা ব্রহ্মচারিণীকেও ইন্দ্রের অপ্সরা করিয়া তুলিতে পার। এক রাত্রির মধ্যে কেবল তোমারই সংযোগে সালঙ্কারা গৃহলক্ষ্মী সধবা নারী বিধবা তপস্বিনীর বেশে পরিণত হয়, এবং মলিনবসনা দুঃখিনী বিধবাও সধবার বেশে অপস্মি-কের শ্মশান সমান গৃহকে উৎসবময় করিতে পারে। হে পোষাক, তোমার মহিমা আমি আর কত বলিব। তোমার অদ্ভুত মহিমা দেখিয়া এক এক বার মনে হয়, তোমাকে লইয়াই মনুষ্যের অস্তিত্ব ভদ্রতা মান সম্ভ্রম রূপ যৌবন যত কিছু। তুমি না থাকিলে সবই মিথ্যা; মেথরাণীও যা, রাজরাণীও তাই। তুমি

বহুরূপী। তোমার মর্য্যাদায় নেটিভ নিগার ট্যাঁস অনায়াসে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসিয়া যায়, খালাসি চাপরাশি একটি কথাও বলে না; কিন্তু তোমার অভাবে ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিটধারী বাবু তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতে বাধ্য হন। তুমি বারবধূকে উচ্চাসনে বসাইয়া সতী কুলবধূকে কুলিডিপোয় পাঠাইয়া দাও এবং হতভাগ্য ফেরারী খুনী আসামীকে সাধুর দলে মিশাইয়া লও। তুমি অজ্ঞ মূর্খ গর্দ্দভ তুল্য ব্যক্তিকে গুরুর আসনে বসাইয়া, সাধু সুবিজ্ঞ মহাত্মাকে ঘোড়ার সহিসের কাজে নিযুক্ত কর।"

"স্ত্রী এ জন্ত বিশেষ কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইলেন না, বরং জাতীয় স্বভাবের দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া প্রসন্ন মুখে সগৌরবে বলিলেন, "উভয়বিধ বেশ ভূষার মধ্যে আমি তোমার সেই নিত্যস্ত্রীই আছি, স্ত্রীত্বের ইহাতে কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। এই গৃহাশ্রম পবিত্র পরমতীর্থ, এখানে গৃহলক্ষ্মী বিশ্বমাতা স্বয়ং আমাকে আজ এই বেশে সজ্জিত করিয়াছেন, ইহার ভিতর আমার আমিত্ব কিছুই নাই; যিনি ঋষি তপোবনে, বিজন শ্মশানে, তিনিই আবার পরিবারমণ্ডলে, সংসার বিলাস ভবনে।" এই কয়টী কথার পর আর তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি পাইল না, কেবল দরবিগলিত ধারে কপোল যুগলে নয়নাশ্রু বহিতে লাগিল। আমি দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইলাম। সে মূর্ত্তির দিকে অধিক ক্ষণ আর দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিলাম না; যেন কি এক স্বর্গীয় মধুর স্নিগ্ধ জ্যোতি তাহাতে দীপ্তি পাইতেছিল। স্ত্রীর কথা গুলিও অত্যন্ত গুরুভারবিশিষ্ট, তাহা আমার হাড়ের মধ্যে বসিয়া গেল। বৈরাগ্যের যে কিঞ্চিৎ তম আমাতে জন্মিয়াছিল, গৃহাশ্রমজাত প্রকৃত বৈরাগ্যপ্রভায় তাহা অসাররূপে প্রতীয়মান হইল। তখন বুঝিলাম, সে সংসারের সঙ্গে এ সংসারের অনেক প্রভেদ। ইহা সার সংসারই বটে।"

"এইরূপে আনন্দ উল্লাসে, স্বজনসম্মিলনে প্রথম দুই চারি দিন অতিবাহিত করিলাম। নূতন ভাব পুরাতন জীবনে প্রবেশ করিয়া আমাকে কতকটা নবীভূত করিয়া ফেলিল। যেন যৌগ বৈরাগ্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর এত দিনে প্রেমনিকেতনের এক খানি ইট গাঁথা হইল। স্বভাবের গঠন-কার্য্য কুসুম কলিকা বিকাশের স্থায় অতীব রমণীয়।"

চতুর্থ অধ্যায়।

"পারিবারিক আমোদ আহ্লাদ প্রেমবিনিময়ের ঘটায় কয়টা দিন কোথায় দিয়া যে চলিয়া গেল কিছুই টের পাইলাম না। তার পর এক দিন নাতিনী এবং নাতিবধূরা হাসিয়া বলিতেছে, "দাদা মহাশয়! আমাদের বড় সাধ, দিদিমায়ের সঙ্গে আবার তোমার বিবাহ দিই।" প্রস্তাবটি যদিও আপততঃ শুনিতে ছেলে-মানুষী রকমের, কিন্তু আমার নিকট অন্য আলোকে প্রকাশ পাইল। আমার দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অজ্ঞাত বাস কালে আমার স্ত্রী পুত্রেরা দেশীয় প্রথানুসারে আমার শ্রাদ্ধ করিয়াছিল। সুতরাং সে হিসাবে এখন আবার বিবাহের প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়ঃক্রমে আধ্যাত্মিক বিবাহ প্রশস্তও বটে। তাই আমি প্রস্তাবকারিণীদিগকে বলিলাম, এ কথা মন্দ নয়। আমি রাজী আছি। অদ্যই আমি আধ্যাত্মিক উদ্বাহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইব। কিন্তু বিবাহান্তে আমি তোমাদিগকে লইয়া প্রেমপরিবার গঠন করিতে চাই, ইহাতে তোমরা সম্মত আছ কি না বল। সকলেই একবাক্যে সম্মতি প্রদান করিল। আমি দেখিলাম, দিব্য সুযোগটি উপস্থিত; পারিবারিক আত্মীয়তাকে আধ্যাত্মিক নিত্য সম্বন্ধে পরিণত করিবার জন্য যেন ভগবান সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন। এতগুলি পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন যদি হাতে পাইয়াছি, তবে আর ছাড়ি কেন। তোমাদের সেবায় আর আমি বড় ভুলছি না; কতকগুলি টাকা ব্যয় করিয়া মিষ্ট কথায় বাবা দাদা বলিয়া মায়ার আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে, আর দল বাঁধিয়া যাত্রা নাটকের নট নটীর সাজে আমার নয়ন রঞ্জন করিবে, তাহাতে মজা নাই; মানব জীবনের এবং সমাজ পরিবারের যে আদর্শ তাহা যদি গঠন করিতে পার, তবে আমার সঙ্গে যোগ দাও। নবানুরাগে, শ্রদ্ধা প্রীতিরসে সকলেই তখন উৎসাহিত হইয়াছিল, সহজেই আমার কথায় তাহারা সায় দিল।"

"অতঃপর সাত্ত্বিক সমারোহের সহিত বিবাহকার্য্য যথাসময়ে সম্পন্ন হইয়া গেল। সর্ব্ব প্রথমে একটী শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের পারিবারিক দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিলাম। তাহাকে প্রতি দিন সজীব পুষ্প গন্ধে সাজাইতাম এবং ধূপ ধূনার গন্ধে সুবাসিত করিতাম। সেই দেবমন্দিরের শোভা সন্দর্শনে সকলে ভক্তিভাবে মজিয়া গেল। মনে যে যে সাধ ছিল, সমস্ত মিটাইতে

লাগিলাম। গৃহবেদীর চতুপার্শ্বে দৈনিক পূজার সময় যখন সকলের সঙ্গে সমতানে মা আনন্দময়ীর আনন্দসঙ্গীত গাইতাম এবং গৃহকার্য্য, পরহিত-ব্রত, পান ভোজন পারিবারিক উৎসবাদিতে সকলে একত্র মিলিত হইতাম, তখন মনে হইত যেন সশরীরে স্বর্গভোগ করিতেছি। বস্তুতঃ রক্তের সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক আনুরক্তিতে পরিণত হইলে বড়ই সুখের বিষয় হয়। ক্রমে ইহার শীতল ছায়া প্রতিবাসী, স্বদেশবাসী এবং সাধারণ জনসমাজের দগ্ধ মস্তকে বিস্তার হইতে লাগিল। পরের সুখে সুখী হওয়া যে কি, তাহাও এইরূপে অনেকে বুঝিতে পারিলেন। আত্মার ভিতরে ব্রহ্মানন্দ এবং ভ্রাতৃপ্রেমানন্দ দুই এক হইয়া গেল। এই অবস্থায় মানবীয় সমাজবন্ধনের মধ্যে আমি বিধাতার প্রেমলীলা, এবং নানা ঘটনায় তাঁহার নব নব বেশ দেখিয়া এবং নানাবিধ শিক্ষালাভ করিয়া তৃপ্তকাম হইয়াছিলাম। মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ এবং লৌকিক ব্যবহারের মধ্যে অনেক বিষয় শিখিবার আছে। ইহার নিগূঢ় তত্ত্বের অভ্যন্তরে বিধাতার বিচিত্র করুণাকৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও সে সকল ক্ষণস্থায়ী এবং পরমার্থ সিদ্ধির উপায় মাত্র, কিন্তু তাহা দ্বারাই সর্ব্ব প্রথমে বিধাতার দয়া স্নেহ প্রেম পুণ্য মূর্ত্তিমান আকারে প্রকাশিত হয়।"

শেষ জীবনে আত্মারাম যে ভাবে দিন অতিবাহিত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমরা তাঁহার প্রমুখাৎ যাহা কিছু শুনিয়াছি তাহাতে বোধ হয়, তিনি একটি আদর্শ গৃহস্থ। নিষ্কর্ম্মা ধ্যানশীল কিম্বা চিন্তাপরায়ণ অধ্যয়নশীলের ন্যায় তাঁহার সে জীবন নহে; কিন্তু সমস্ত মানসিক প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য তাহাতে লক্ষিত হইয়াছিল। নানা অবস্থায় পড়িয়া, বিবিধ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পরিশেষে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন জীবন বিকসিত হয়। কেবল ইহাই নহে, তাঁহার সকল প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত আধ্যাত্মিক গভীরতা পরিলক্ষিত হইত। আমাদের বন্ধুর এখন সংসারের যেরূপ সুব্যবস্থা, পুত্র পৌত্র কন্যা দৌহিত্র প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ তাঁহার সেবায় যেরূপ অনুরাগী, আমরা হইলে এ বয়সে কেবল খাইয়া, শুইয়া, আর বাজে গল্প করিয়া শেষ জীবনটা কাটাইয়া দিতাম। আত্মারাম ভায়ার সঙ্গে আমাদের এ স্থলে মতের এবং কাজের গভীর প্রভেদ। তিনি বলেন, নিদ্রাও মৃত্যু, বিলাস ভোগও বিকারী রোগীর ক্ষণিক পিপাসানিবৃত্তি বিশেষ, অলস হইয়া বসিয়া সময় কর্ত্তন করাও এক প্রকার কারাবাস। তাঁহার নিরলস কর্ম্মেন্দ্রিয়, চিরজাগ্রত

জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং জ্ঞান ইচ্ছা ভাব চুপ করিয়া কখন বসিয়া থাকিতে জানিত না। ইহার পুরাতন সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতার কথা পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই সমস্ত অবগত হইয়াছেন, এক্ষণে নবজীবনের সার কথা, সংসার ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করুন।

"যখন আমি আত্মীয় স্বজনবর্গকে লইয়া সুখীপরিবার গঠনে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং তাহার উপযুক্ত উপাদান সামগ্রী সকল হস্তে পাইলাম, তখন আমার অপরিস্ফুট এবং নিদ্রিত বিভ্রান্ত চিত্তবৃত্তি গুলি নবোদ্যমে পরিপূর্ণ হইল। এবং এক অপরের সহিত সুরে সুরে মিলিয়া গেল। বয়স অনেক হইলে কি হয়? শরীর বার্দ্ধক্যের সীমায় সমাগত, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? মনে হইতে লাগিল, চব্বিশ ঘণ্টায় দিন, সাত দিনে সপ্তাহ, ত্রিশ দিনে মাস, তিন শত পঁয়ষট্টি দিনে বৎসর, এ বড় কম; আর কিছু বেশী বেশী হইলে ভাল হয়। সেবার নেশা যখন পূজার নেশায় মিশে এক হয় তখন সে জমাট আর কিছুতেই ভাঙ্গে না। তখন সমস্ত কাজই উপাসনা হইয়া দাঁড়ায়। প্রতি নিশ্বাসে যোগ সাধন হয়। আত্মা আমার এই অবস্থায় নবযৌবনে পূর্ণ হইয়া সিংহের ন্যায় যেন নাচিতে লাগিল। এ যাবৎ কাল কর্ম্মযোগ প্রকৃত প্রস্তাবে সাধন এবং সম্ভোগ করা হয় নাই. কেবল ভূত প্রেতের মত খাটিতাম মাত্র। এক্ষণে জলের মাচ যেন জলে সাঁতার দিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেবল পরিবারস্থ সকলের সেবায় মজিলাম না; কারণ দেখিলাম, তাহাতে স্বাভাবিক সম্বন্ধের কিছু স্বার্থগন্ধ থাকে। নিষ্কাম কর্ম্ম যেমন সুখকর তেমন কি আর কিছু আছে! সকাম কার্য্যে নিজের এবং আত্মীয়ের সুখে কিঞ্চিৎ স্বার্থমূলক সুখ, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম জনসমাজকে সুখী করিয়া সকলের সুখে সুখ। সর্ব্ব ঘটে এক পরমব্রহ্ম বিরাজিত; সুতরাং আমিও যা, পরও তাই; সকলেই আমি এবং আমার। যদি সুখ বলিয়া পৃথিবীতে কিছু থাকে, তবে পরকে আত্মীয় করিয়া তাহার সুখে সুখী হওয়াই পরম সুখ।"

"কাহারো কোন কথা না শুনিয়া বাধা না মানিয়া প্রভুর কাজে আত্মোৎসর্গ করিলাম। সেই পুরাতন পৃথিবী, পুরাতন মনুষ্যসমাজ, সমস্তই পুরাতন; কিন্তু আমার নিকট নূতন এবং সুমিষ্ট বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে যে অবস্থায় ভয় ভাবনা ক্ষোভ নিরাশা উপস্থিত হইত, আমার নির্লোভ নিস্বার্থ মন সেখানে এখন নির্ভয়ে প্রসন্ন চিত্তে ফলাফলনিরপেক্ষ হইয়া কাজ করিত।

কাজের সফলতায় আত্মগরিমা অহঙ্কার নাই, নিষ্ফলতাতেও নিরাশা নাই। ভগবানের নামে যে কাজে হাত দিই তাহাতেই আত্মপ্রসাদ পাই এবং অধিকাংশ স্থলে আশাতিরিক্ত কৃতকার্য্যও হই। ছেলেরা বলিল, 'বাবা, সৎকার্য্যের জন্য যাহা কিছু তোমার অর্থের প্রয়োজন হয় তাহাও আমরা দিব।' আমি বলিলাম, 'বেশ কথা। কিন্তু আমি কাজ করিয়া কিছু টাকাও আনিব।' অতঃপর পাবলিক বেনিফিট ফণ্ডের সেক্রেটরির একটা কাজ লইলাম। তদুপলক্ষে লোকের সাংসারিক জীবনের সহিত আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। অর্থব্যবহার এবং বিবিধ বিষয়কার্য্যে কিরূপে সত্য রক্ষা করা যায় তাহা শিখিয়া সকলকে শিখাইতে লাগিলাম। ক্ষতির ভয়ে প্রথম প্রথম ইহাতে অনেকে সায় দিত না, পরে আমার কার্য্যোদ্যমের ভিতর প্রফুল্লচিত্ততা শান্তি আনন্দ দেখিয়া ক্রমে তাহারা এই পথে আসিতে লাগিল। সুখ স্বার্থ ত্যাগেই যে যথার্থ সুখ তাহা আমিও বুঝিলাম, তাহারাও বুঝিল। ভগবানের নামে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে তাহাতেই সিদ্ধকাম হইতে পারিবে। কার্য্যোদ্ধার যদি নাও হয়, পবিত্র অভিপ্রায়ের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়।"

"জনহিতকর কার্য্যে যাঁহারা প্রচুর অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করিতেন, সংবাদপত্র এবং গবর্ণমেণ্ট গেজেটে যাঁহাদের সুখ্যাতি ধরিত না, দেশ বিদেশে যাঁহাদের যশসৌরভ বিস্তার হইয়াছিল, একে একে আমি তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কাহাকেও প্রসন্ন চিত্ত দেখিতে পাইলাম না। লোকের মুখে তাঁহাদের প্রশংসা ধরে না, অথচ তাঁহারা নিজে আপনাকে আপনি নিন্দা করিতেছেন। নিতান্ত মর্ম্মাহত নিরাশভগ্ন মনে বলিতেছেন, "এত করিলাম, তার জন্য একটু কৃতজ্ঞতাও নাই।" তিনি যদি উপকৃতের নিকট এক গুণ কৃতজ্ঞতা দাসত্ব তোষামোদ চান, তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা, পৌত্র দৌহিত্র, প্রপৌত্রেরা পর্য্যন্ত আরও দশগুণ দাবি করে। এক দিকে কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য জুলুম, অপর দিকে কৃতঘ্নতা নেমোখারামি ফাঁকি দিবার চেষ্টা। যখন যখন কাগজে সুখ্যাতি কিম্বা উপকৃতের মুখে প্রশংসা চাটুবাদ বাহির হয়, তখনই যাহা কিছু একটু আত্মগরিমার আনন্দ, তার পর সে টুকু রক্ষা করা বড় কঠিন। দান করিয়া এরূপ অপ্রসন্নতা অতৃপ্তি ক্ষোভের কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় কেহ বলিলেন, "সাধারণ কার্য্যে আর টাকা দিয়া কুলাইতে পারি না, অর্থের স্বচ্ছলতা নাই, অধিকন্তু কর্তৃপক্ষ এবং সমাজপতিদিগের উৎপীড়নে লোকলজ্জা সঙ্কোচ; সুতরাং

মনে সুখ নাই। এখন ভাবিয়া দেখিতেছি, সকলই ভস্মে ঘি ঢালা হইল।" কেহ বা প্রতিযোগীর উচ্চ মান্য, উচ্চ পদবীপ্রাপ্তিতে হিংসা অভিমান দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। যে কিঞ্চিৎ মান সম্ভ্রম তাঁহার পূর্ব্বে লাভ হইয়াছে তাহা রক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয়, অথচ অধিকতর ধনবান প্রতিযোগীকে অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই। কাহারো বা সুখ্যাতির সঙ্গে কিছু অখ্যাতি বাহির হইয়াছে, এই জন্য তিনি বড়ই অসুখী। কেবল কর্ত্তৃপক্ষের মন যোগাইলে হয় না, সংবাদপত্রের এডিটর-দিগকে সন্তুষ্ট রাখা চাই। সব দিক কুলাইয়া উঠে না, কাজেই ইহাতে আর সুখ হবে কি করে? একটা সাহেব কিম্বা এক জন চোঘাপরা চসমা-নাকে বাবু অনায়াসে এক কথায় হাজার টাকা আদায় করিয়া লইয়া গেল, কিন্তু বাড়ীর কাছে এক জন গরিব অন্ন পায় না। এ কি কর্ম্মযোগ, না কর্ম্ম-ভোগ? না একটা উৎকট মহা রোগ? লজ্জা ভয় অনুরোধ কিম্বা সুখ্যাতির আশায় দান করিয়া শেষ গৃহীতাদিগকে তাহারা প্রবঞ্চক, আপনাকে নির্ব্বোধ বলিয়া পর্য্যায়ক্রমে অভিসম্পাৎ এবং অনুতাপ করিতেছে।"

"আমি ইহাদিগকে বলিলাম, ভাই, তোমরা এ কি করিতেছ? মান যশ খ্যাতির আশায় কতই দান করিলে, তাহাতে কেবল ক্ষোভ আর দ্বেষ হিংসা বাড়িল, শান্তি তৃপ্তি পাইলে না। টাকাই বা কার, আর তুমিই বা কার? সৎকার্য্যের ফল লোকপ্রশংসা নয়, তাহাতে নরক ভোগ হয়; ভগবদ্ভক্তি উপার্জ্জন উহার চরম লক্ষ্য। সর্ব্বস্ব দান করিয়া যাহাতে সেই দেবদুর্ল্লভ হরিভক্তি উপার্জ্জন করিতে পার তাহা কর, তাহাতে পরম শান্তি চিরকৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবে। আপনি ষোল আনা আঠার আনা ভোগ করিব, তার পর উদ্বৃত্ত পরিত্যক্ত অব্যবহার্য্য যাহা থাকিবে অন্যকে দিব; যাহা দিব তাহার পরিবর্ত্তে আবার পূরো ষোল আনা প্রশংসা সুখ্যাতি সম্মান কৃতজ্ঞতা আদায় করিয়া লইব; এরূপ চামারে উদ্দেশ্য যেখানে সেখানে কি শান্তি তৃপ্তি আছে? অর্থ বিত্ত উপার্জ্জনেও স্বার্থপরতা নীচতা অধর্ম্ম, তাহার ব্যয়েতেও তাই; সুতরাং পরিণামে অশান্তি নিরাশা ক্ষোভ ভিন্ন আর কি প্রত্যাশা করিতে পার? কাজ সব একই, কেবল লক্ষ্য ভিন্ন। অতএব তোমরা নিষ্কাম অন্তরে কেবল হরিভক্তির প্রার্থী হইয়া কর্ম্ম কর। কৃতজ্ঞতা সম্মান উপাধি প্রাপ্তির যদি ক্রটি হয়, হরিভক্তিতে সে সমস্ত ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইবে। সৎকার্য্যে ভক্তি বাড়ে, ভক্তিতে কর্ম্মযোগানন্দ লাভ হয়,

সঙ্গে সঙ্গেই পুরস্কার। সে জন্য আর লোকমুখাপেক্ষার প্রয়োজন হইবে না। আমার উপদেশ অনুসারে যাহারা চলিতে লাগিল, তাহারা অচিরে শান্তি ও কৃতার্থতা প্রাপ্ত হইল। যাহাদের রজ এবং তমোগুণ বেশী ছিল তাহারা আরো কিছু কাল ঘোল খাইবার প্রত্যাশায় রহিল। যাই হউক, আমি এ বিষয়ে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মযোগের উপদেশ দান করিয়াছিলাম; তাহাতে পরিবার, প্রতিবাসী এবং স্বদেশস্থ লোকেরা যথার্থ জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ শিক্ষা পাইলেন।"

"যে সকল ধর্ম্মপিপাসু উপাসক এবং সাধক যাগ যজ্ঞ জপ তপ পূজা ধ্যান, ব্রত উপবাস, তীর্থভ্রমণ, বিগ্রহসেবা এবং নাম সঙ্কীর্ত্তনে বহু বৎসর যাপন করিয়া চরমাবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও দেখিলাম, কেহ অন্ধ ভক্তি এবং কুসংস্কারমূলক বিশ্বাসের গুণে অপেক্ষাকৃত সুখী অথবা আত্মপ্রবঞ্চিত, কেহ জড়যন্ত্রবৎ নিয়মের অভ্যস্থ দাস, কেহ বা নিরাশ বিরক্ত। পূর্ব্বে এক সময় অর্থের স্বচ্ছলতা বশতঃ যিনি অনেক ক্রিয়া কর্ম্ম করিয়া লোক জনকে খাওয়াইতেন এক্ষণে অর্থের অপ্রতুল ঘটিয়াছে, তাই তিনি কোন সদনুষ্ঠান করিতে পারেন না, তজ্জন্য বড়ই ক্ষুব্ধ; তৎসঙ্গে আধুনিক সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের ক্রিয়া কর্ম্মের নিন্দা করেন, আর গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণদিগকে গালাগালি দেন। এই তাঁহার পরিণাম। যাঁহাদের বল স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে ব্রতসাধন, উপবাস, তীর্থভ্রমণের আর ক্ষমতা নাই, তাঁহারা শুষ্ক হৃদয় নির্জ্জীব অকৃতার্থের ন্যায় স্থিতি করিতেছেন। আর যে সকল ব্যক্তি বহু বিধ নিয়ম পালন করিয়া করিয়া, বহু বহু দেব দেবীর নিকট পূজা উপহার দিয়া দিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের আর এখন কিছুই ভাল লাগিতেছে না। নৈবিদ্য ভোগ বলি উপহার দ্বারা দেবতাকে প্রসন্ন করিয়া সকল প্রকার পাপ দুষ্কার্য্য হইতে মুক্তি লাভের যাঁহাদের আশা ছিল, তাঁহারা শেষ মহা বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, যেমন ব্যয়, তেমন আয় হয় না। রিপুও দমন হইল না, পাপও গেল না, শান্তিও পাইলাম না; কেবল অর্থ আর পরিশ্রমের শ্রাদ্ধ। কি সব সাপের মন্ত্র বলে, মানেও বুঝি না! এত খুটি নাটি নিয়ম বিধি কি চিরকাল রক্ষা করা যায়? একটা রাখিতে গিয়া দশটা ভুলিয়া যাই। নির্ব্বোধ স্ত্রী লোক গুলা ব্রত নিয়ম লইয়া হক না হক কেবল টাকা খরচ করায়। এ সব ধর্ম্মকর্ম্মে যত ফাঁকি দিতে পারা যায় ততই ভাল। আর ঐ সব জড় পাষাণ মাটির অচে-

তন দেবতা গুলার কি কোন ক্ষমতা আছে? মূর্খেরাত বুঝে না; যোগ না দিলে আবার গোল করিয়া মরিবে, দলাদলি বাধাইবে। আপদ গুল শেষ হইলেই বাঁচা যায়। কেহ পাণ্ডা ঠাকুরদিগকে নিন্দা করিতে করিতে তীর্থ হইতে বাড়ী ফিরিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা করিতেছে। কেহ উপবাসাদি কঠোর ব্রতে দুর্ব্বল রুগ্ন এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যাকে তাকে বকিতেছে আর রাগিতেছে। কেহ মন্ত্র পড়িয়া উপদেশ দিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত চিত্তে বলিতেছে, আর বকিতে পারি না, মুখে ব্যথা হইল। যিনি অনেক ব্রাহ্মণ বৈরাগী ভোজন করাইয়া এক্ষণে রিক্ত হস্ত হইয়াছেন, তিনি বলেন, ও ব্যাটাদের খাইয়ে কোন লাভ নাই, খেয়ে শেষ নিন্দা করে; তার চেয়ে গরিবদের খাওয়ান ভাল। এই সকল ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে যাহারা নিতান্ত স্বার্থ সুবিধার দাস ষণ্ডা মার্ক, তাহারা কেবল সুবিধার জন্য যথেচ্ছাচারীদিগের দলে মিশিতে ইচ্ছা করে। যিনি দীর্ঘ প্রার্থনা ত্রিকালীন পূজা আরাধনা দ্বারা নিরাকারোপাসনা করিতেন, তিনি বলেন, কেবল আঁধার আকাশ দেখি, হৃদয় শুকাইয়া গেল, কিছু ভাল লাগে না। ফলতঃ ইহাদের সকলেরই দুর্দ্দশা সমান। প্রত্যেকেই আঁধারে ঢিল ছুড়িতেছে। যাঁহারা সুশিক্ষিত বহুদর্শী এবং উদার চিন্তাশীল তাঁহারা জাতীয় ধর্ম্মের পুরাতন অন্ধ বিশ্বাস, ঐতিহাসিক ভ্রান্তির বিরুদ্ধে সত্য কথা বলিতে সাহস না পাইয়া বিদ্যা বুদ্ধির কৌশলে একটা নূতন অথচ লোকপ্রিয় যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের শেষ বড়ই বিড়ম্বনা ঘটিল। কারণ, তাহা ভক্তিশাস্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি দুয়েরই বাহির হইল। কেবল বিদ্যার কর্ম্ম নয়, নাম সম্ভ্রমেও কুলায় না, বিশ্বাসগত সরল জীবন চাই। দৈববল চাই। তাহার অভাবে ধর্ম্মজ্ঞানীদিগের অপরা বিদ্যার কোন ফল ফলিল না। আমি এই সকল ধর্ম্মার্থীদিগকে বলিলাম, ভাই, ধর্ম্মের জন্য এত পরিশ্রম, শিরশ্চালন, অর্থ ব্যয়, বাগ্মিতা, লোকভয়, শরীর শোষণেরই বা প্রয়োজন কি, এবং শেষে তাহার জন্য এত নিরাশা বিরক্তিই বা কেন? তোমরা মূলমন্ত্র ভুলিয়া কষ্ট পাইতেছ। ঈশ্বরের অভিপ্রায় পালনই সার ধর্ম্ম। আগে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে চেষ্টা কর, তার পর সতী স্ত্রীর ন্যায় বিশ্বস্ততা এবং সারল্য সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। মুখে তাঁহাকে বাড়াইয়া চক্ষের জল ফেলিলে কিছু হয় না; ভগবানের স্বরূপ গুণ লক্ষণ চরিত্রে সংক্রামিত হইতে দাও। তিনি বড়, তাতে তোমার কি? তাঁহার উদ্দেশে, তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার প্রদর্শিত

উপায়ে পালন করিয়া তাঁহাকেই ফলরূপে প্রাপ্ত হইবে; তদ্ভিন্ন শান্তিও নাই, তৃপ্তিও নাই। বৃথা আড়ম্বর করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে কি হইবে? যদি সুখী হইতে চাও, সরল ঐকান্তিক বিশ্বাসে আত্মবিসর্জ্জন কর; অন্যথা সকলই বৃথা পণ্ড শ্রম।"

"আমার পরিবারমধ্যে নিত্য নিত্য যে আধ্যাত্মিক ভগবদর্চ্চনা হইত, তাহার সরস ভক্তির ভাব, এবং যে সকল নিষ্কাম কর্ম্ম আমরা করিতাম, তাহার আত্মপ্রসাদ দর্শনে ক্রমে ঐ পথে সব লোক আসিতে লাগিল। বৃথাড়ম্বর, অর্থশূন্য অনুষ্ঠান, বাহ্য পূজার প্রতি স্বভাবতঃই তাহাদের ইতঃপূর্ব্বে বীতরাগ এবং বিরক্তি জন্মিয়াছিল, এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে সরল বিশ্বাসযোগে আধ্যাত্মিক ভক্তি সাধন এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন অর্থাৎ জগতের সেবাসাধনব্রত তাহারা গ্রহণ করিল। এই সহজ অথচ বিজ্ঞানসম্মত আধ্যাত্মিক ধর্ম্মপথ যখন তাহারা ধরিল, তখন স্বভাবের অনুকূল স্রোতে তাহাদের জীবনতরী ব্রহ্মকৃপা পবনহিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে অনন্ত শান্তিধামের দিকে চলিল। আহা সে কি চমৎকার দৃশ্য! যাহারা বিশ পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বিপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত নিরুদ্যম হইয়াছিল, অল্প কাল মধ্যে তাহারা আনন্দ মনে নিয়তির পথে বিচরণ করিতে লাগিল। আমার ইহাতে বড়ই সুখ হইল। বহু লোকের সুখ শান্তি আমি একাকী ভোগ করিতে লাগিলাম। স্বার্থ নাই, অথচ পরম সুখ; ইহা যে কত আনন্দের ব্যাপার, পূর্ব্বে আমিও তাহা জানিতাম না।"

পঞ্চম অধ্যায়।

আমরা যেরূপ শুনিলাম, এবং স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিয়াছি, তাহাতে বেশ বুঝা গেল, আত্মারামের জীবনাদর্শ বহু পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। কেবল মত ভাব চিন্তা লইয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। মানবজীবনের নিয়তি গৃহধর্ম্ম পালন, যাই এই সত্য তিনি বুঝিতে পারিলেন, তৎক্ষণাৎ অমনি সংসারে প্রবেশপূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তদুপলক্ষে তিনি সমাজদেহের গঠন এবং পোষণপ্রণালী অতি সুন্দর রূপে অধ্যয়ন করেন। ইহার মধ্যে স্বভাবের অদ্ভুত লীলা, সামাজিক

সম্বন্ধ, ভৌতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তির বিচিত্র বিকাশ এবং সম্মিলন দর্শন করিয়া তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

"মানবসমাজের গঠন এবং বন্ধন, তদন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যোগ, পরস্পরের মধ্যে সাহায্যবিনিময়, একের স্বার্থের সঙ্গে সাধারণের মঙ্গল, এ সমস্ত অতীব আশ্চর্য্য। কেবল নিকটবাসী স্বদেশস্থ লোকের সহিত যে ঐ রূপ সম্বন্ধ তাহা নহে, যাহাকে কখন দেখি নাই, দেখিব না, চিনি না, চিনিবার কোন সম্ভাবনা নাই, এমন সকল দূরদেশবাসী ভিন্ন জাতীয় লোকের সহিত যোগবন্ধন স্থিতি করিতেছে। এক দেশের লোক অন্য দেশের ভাই ভগিনীদের জন্য নানা বিধ উপাদেয় খাদ্য, ব্যবহার্য্য গৃহসামগ্রী, শিল্প পদার্থ, বিচিত্র বসন ভূষণ প্রস্তুত করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে পাঠাইতেছে। কেবল কি দেহরক্ষার উপযোগী কৃষী এবং শিল্লোৎপন্ন সামগ্রী? তাহা নয়, আত্মার অন্ন পান স্বরূপ জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি, যোগ ভক্তি প্রেম, এক পরিবারেব অঙ্গীভূত হইয়া সকলে সকলকে দান এবং প্রতিদান করিতেছে। আশ্চর্য্য এই যে, যাহারা সাহায্য করিতেছে তাহারাও জানে না, যাহারা সে সাহায্য ভোগ করিতেছে তাহারাও জানে না কিরূপে তাহা সম্পন্ন হইল। বিধাতার গভীর করুণাকৌশল কে বুঝিতে পারে? আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের জীবন রক্ষার জন্য তিনি অনেক কার্য্য করেন, কখন তাহা কাহাকেও বুঝিতে দেন না। শিশু সন্তান কি জনক জননীর স্নেহ বাৎসল্যের সমস্ত কথা জানিতে পারে? এই মানবীয় সামাজিক বন্ধনের অভ্যন্তরে ভগবানের প্রেম আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হৃদয়ে হৃদয়ে স্নেহ প্রেম দয়ার নদী বহিয়া যাইতেছে। এক অনন্ত [illegible]সিন্ধু যেন বিন্দু বিন্দু হইয়া প্রতি আধারে বিরাজমান। ইহারা যে সেই ভগবান আদি পুরুষেরই অসংখ্যাবতার তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি আপনার আত্মস্বরূপ মানবজগতের ভিতরে যেমন প্রকাশ করিয়াছেন এমন কোথাও নয়। বিশ্বাস, সারল্য, সততা, সত্য, ন্যায়, দয়া সমস্ত বিষয়ক্ষেত্র, বাণিজ্য-কার্য্যালয়, ধর্ম্মাধিকরণ, এবং রাজ্যশাসনের মূল অবলম্বন। তাই লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া লোকে এক খণ্ড কাগজ গ্রহণ করে; ক্ষৌরকারের শাণিত ক্ষুরের অগ্রে নির্ভয়ে গলা বাড়াইয়া দেয়, এক জন ড্রাইভার কিম্বা কাপ্তেনের হস্তে সহস্র সহস্র মানবের জীবন সমর্পিত হয়। প্রত্যেক মানবজীবন শ্রীহরির লীলা বৃন্দাবন। এই বিচিত্র মানবসমাজ তাঁহার অব্যক্ত আনন্দ

এবং গূঢ় মঙ্গল সঙ্কল্পের মূর্ত্তিমান প্রতিচ্ছায়া। এই যে প্রচলিত সামাজিক ভদ্রতা সৌজন্য লৌকিক কুটুম্বিতা; পথে দেখা হইলে নমস্কার, ভাল আছেন বলা, একটু মৃদু হাস্যের সহিত বাড়ীর কুশলবারতা জিজ্ঞাসা; পূর্ব্বে আমি এ সকলের মর্ম্ম বুঝিতাম না। এখন ইহার ভিতর আধ্যাত্মিক বন্ধন অনুভব করি। প্রতি জন যেন এক একটী চলনশীল দেবমন্দির। ফলতঃ কিছুই অর্থ শূন্য নয়, কিন্তু সেই অর্থ গ্রহণ করা চাই।"

"অবশ্য পারমার্থিক সার বস্তু উপরে নাই, অনেক ভিতরে নামিয়া গেলে তবে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে ভূতের খেলা এবং নৈতিক স্বার্থের লীলা। সাংসারিক কার্য্য, বৈষয়িক ব্যবহার আপাততঃ সেই জন্য যেন একটা দ্যূতক্রীড়ার ন্যায় বোধ হয়, কোন রকমে ফাঁকি দিয়া জিঁতিতে পারিলেই হইল। ধর্ম্মে হউক অধর্ম্মে হউক, ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারে লোকে সুখী হইতে চায়। ছদ্মবেশধারী স্বার্থপর ভদ্র সম্ভ্রান্ত জীবনের আন্তরিক অবস্থা আমি এক দিন ধ্যানযোগে অবলোকন করিয়াছিলাম। যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা শুনিলে হয় তো তোমাদের লজ্জা বোধ হইবে। অথবা আমার সিদ্ধান্ত পাগলের কল্পনাও মনে করিতে পার। যাই হউক, অবস্থাটা কি, তাহা বলি, শুনিয়া যাও।"

"বাহিরে চক্ষের সম্মুখে এই যে সব প্রভেদ দেখিতে পাও, ইহা বাস্তবিক প্রভেদ নয়। কেহ ধনী কেহ দরিদ্র, কেহ জ্ঞানী কেহ মূর্খ, কেহ সভ্য কেহ অসভ্য, কেহ পরোপকারী কেহ স্বার্থপর, কেহ সুন্দর কেহ কুৎসিত, কেহ সাধু কেহ অসাধু, কেহ বিকট কর্কশ, কেহ বা মধুর সুললিত; এ সমস্তই অধিকাংশ বাহিরে। কিছু দূর ভিতরে নামিয়া যদি দেখ, এরূপ প্রভেদ প্রায় কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না। আমি এক দিন ইহাদের গায়ের পোষাক সমস্ত খুলিয়া বিবস্ত্র করিয়া ফেলিলাম। তার পর চামড়া এক জায়গায়, হাড় এক জায়গায়, মাস এক জায়গায় করিলাম। শেষে প্রতি জনের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা শুনিলে তোমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না। উপরকার পোষাক ব্যতীত অস্থি চর্ম্ম মেধ মজ্জা রক্তের মধ্যে কে রাজা, কে প্রজা, কে ধনী, কে দরিদ্র, কে জ্ঞানী, কে মূর্খ, কে ধাম্মিক, কে অধার্ম্মিক ছোট বড় সুন্দর কুৎসিত কোন প্রভেদ বুঝিতে পারিলাম না। তদনন্তর আত্মার মধ্যেও উচ্চ নীচ, সার অসার, ভাল মন্দ, পাপ পুণ্যের কোন বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইল না। ভিতরে চিন্তা

অভিলাষ কামনা সঙ্কল্প উদ্দেশ্য এক জন রাজা মহারাজারও যা, একটা মেথ-রেরও তাই। শিক্ষা সংস্কার সংসর্গগুণে যাহা কিছু ইতর বিশেষ, সে কেবল বাহ্য সভ্যতা এবং বাবুগিরি সম্বন্ধে; আহার পরিচ্ছদ, বাস স্থানের রুচি বিষয়ে; কিন্তু অপার্থিব বিষয়ে কোন প্রভেদ লক্ষিত হইল না। চারি ঘোড়ার গাড়ীতে যিনি যাইতেছেন তাঁহার আত্মাও যেমন, আবার তাঁহার যে সহিস কোচমান মোসাহেব তাহাদেরও তেমনি। আফিসের বড় বাবু যে বিষয়ে অনুরক্ত, তাঁহার মনে যে চিন্তা বাসনা, দপ্তরি আরদালি চাপরাশি পাঙ্খাকুলীরও তাই। রাজপ্রাসাদে স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া কিরূপে বিস্তৃত ভূভাগ নিরাপদে সম্ভোগ করিবেন, রাজা তাই কেবল ভাবিতেছেন; প্রজাও তাহার সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ড এবং বসতবাটীও তদন্তর্গত বস্তু ও ব্যক্তিগণের বিষয় ভাবি-তেছে। প্রজারা স্নেহপরবশ হইয়া আত্মত্যাগের সহিত পরিবার পুত্র পালন করে, রাজাদের সে টুকুও নাই। ফলতঃ বাহ্য দর্শনটা যেমন মনোহর, বিসদৃশ ভিতরটা তেমন নয়।"

"ইহাদের পরস্পর ব্যবহার গুলা যেন আমার নিকট কি রকম বোধ হয়! স্থায়ী নিত্য প্রেম প্রায় দেখাই যায় না। আজ দেখলাম এক জন জামাই লইয়া তাহাকে মহা আদর যত্ন করিতেছে, কিছু দিন পরে সে আর তাহার মুখ দেখিতে চায় না। আজ যিনি ভাই বলিয়া অজ্ঞান, কাল তিনি এক বার তাহার নামও করেন না। এমন যে স্বামী স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গ সম্বন্ধ, তাও কথায় কথায় অদল বদল হইয়া যাইতেছে। আমার বোধ হয় লোকে সাধা-রণতঃ ভূত ভবিষ্যৎটা এক জায়গায় দেখিতে চায় না। দুই অবস্থা এক সঙ্গে দেখিলে হয়তো লজ্জা হয় বলিয়া তাহা ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করে। কালের প্রভেদে মানুষ কেমন আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয়! এ বেলা ও বেলা, এখন তখন পরিবর্ত্তন। ঠিক বিপরীত। এত পরিবর্ত্তনের ভিতর আমিত্বের একত্ব স্থির থাকে কেমন করিয়া তাই আমি কেবল ভাবি। দিনের পর দিন কত মত, কত ভাব, কত সম্বন্ধ, কত সঙ্কল্পই বদল হইয়া যাইতেছে! মনের ভাব যাহা চক্ষে মুখে হাতের ভিতর দিয়া বাহির হয়, তাহাতো বাষ্পের মত তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়; কিন্তু সাদায় কালোয় লেখা সুস্পষ্ট ভাষায় অঙ্কিত যে সকল কথা, ভাবান্তর ঘটিলে তাহাও কেহ মানে না। ঠিক যেন মদের নেশা। নেশা ছুটিয়া গেলে হাতী কিনিবে কে? সে ভাব যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন তুমি রেজিষ্টারি করা দলিল দেখাইয়া কি করিবে?

ইচ্ছা প্রবৃত্তি উদ্দেশ্য সমস্ত বদল হইয়া গিয়াছে, কেবল চেহারা খানা ঠিক আছে, তারও অনেক পরিবর্ত্তন। কাঠামো আর আমিত্ব, এই দুইটা শেষ থাকিয়া যায়। ফলতঃ পৃথিবীর সম্বন্ধগুল বড়ই অস্থায়ী। কত লোকের সঙ্গে বন্ধুতা হৃদ্যতা করিলাম, শেষে তাহারা কে কোথায় চলিয়া গেল। চেহারা নাম ধাম কিছুই মনে থাকে না। আশ্চর্য্য এই, কেহ কাহাকে চেনে না, তথাচ মোহে অন্ধ হইয়া বলিতেছে আমি তাকে বিলক্ষণ চিনি। কেহ কারো আপনার নয়, অথচ বলিতেছে সে আমার আপনার লোক। ইহার ভিতর কিঞ্চিৎ সত্যের আভাস থাকে বটে, কিন্তু কালস্রোতে তাহা পরিবর্ত্তিত এবং অদৃশ্য হইয়া যায়। চিরচঞ্চল জীবনের জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী সম্বন্ধে এক অন্যের সহিত কিছু দিনের জন্য মিলিত হয়, তার পর যাই ভবের লীলা সাঙ্গ হইয়া আইসে, সম্বন্ধের বন্ধনও শিথিল হইতে থাকে; প্রেম ঘন হইয়া থাকিতে পায় না। কেবলই অদল বদল। অন্তিমে হরিবোল বলিয়া যে যার আপনাপন স্থানে চলিয়া যায়।"

"মনুষ্য সমাজের ভিতর একটা শক্তির কার্য্যই বড় প্রবল দেখিতে পাই। সেটি জঠর জ্বালা। শিক্ষিত পাসকরা যুবা কলেজ হইতে বাহির হইয়া কিছু দিন নিজের জীবনগতি অবধারণ পূর্ব্বক যে স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ বাছিয়া লইবে তাহারই অবসর পায় না, সর্ব্বাগ্রে যেমন করিয়াই হউক, কিছু অর্থ চাই। মহা জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় এই ক্ষুধাশক্তি, ইহার ইন্ধন বংশবৃদ্ধি। ছিল একটা মুখ, কিছু দিন পরে হইল দুইটা; শেষ সেই দুইটা হইতে দশটা পনরটা আঠারোটা পর্য্যন্ত। যেমন মুখ বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে ক্ষুধা বৃদ্ধি, তাহা নিবারণের জন্য অন্নচিন্তা। এ বিষম কল এক বার চলিলে আর নিস্তার নাই; দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষের জন্য পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া ভাব। ইহারই জন্য সকলে সর্ব্বদা ব্যস্ত। একটু সময় পাই না যে কাহারো সঙ্গে দুইটা জ্ঞানের কথা কই। এই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধানল বাড়াইবার জন্য লোকের অনুরাগই বা কত! নিজেরই উদর পূর্ণ হয় না, তাঁর আবার বিবাহটী শীঘ্র চাই। এক দিকে বংশবৃদ্ধি, অন্য দিকে অর্থচেষ্টার জন্য পরিশ্রম, হাঁপ ছাড়িবার আর সময় রহিল না। এ পথে পা বাড়াইবার পূর্ব্বে একটু ভাবা উচিত।"

"আমি এক দিন কোন অকালবৃদ্ধ যুবাকে বলিলাম, ভাই, মাসে দশটা টাকা সংগ্রহ করিতে পার না, বিবাহের জন্য এত ব্যস্ত কেন? কিছু দিন পরে দেখি সে দুই পাঁচটি সন্তান এবং পরিবার লইয়া ভবসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে।

উপদেশ দিলে বলে, 'কি করি দাদা, অদৃষ্ট।' এক জনের স্ত্রী পাঁচ সাতটি সন্তান রাখিয়া মরিয়া গেল, আবার সে বিবাহ করিয়া আর পাঁচটী মুখ সৃজন করিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'অদৃষ্টের ফের'। এ সকল লোকের এ জীবনে আর জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা হইবে না। অল্প সংখ্যক ব্যক্তির এরূপ উৎকট অন্ন-চিন্তা নাই, কিন্তু তাহারা সুখ বিলাস মান মর্য্যাদার আরো উচ্চ শিখরে উঠিবার জন্য আঁকু বাঁকু করিয়া মরিতেছে। ধর্ম্মের উপদেশ, বৈরাগ্যের কথা তাহারা শুনিতে চায় না। বলে, 'ও সব গরিব কাঙ্গালদের জন্য। আমাদের অনেক টাকা আছে।' টাকা আছে তাই না হয়, দেশের দুঃখ কষ্ট গরিবদিগের অভাব দূর কর। সমাজদেহের শোণিত স্বরূপ অর্থ তাহার সর্ব্বাঙ্গে সমভাবে সঞ্চালিত হইতে না দিয়া কেবল এক জায়গায় বদ্ধ করিয়া রাখিবে কেন? শেষ রক্তবৃদ্ধিজন্য সবংশে পুরুষানুক্রমে পচিয়া মরিবে কি? তার পর আপনিই প্রকৃতির প্রতিশোধ, পরে তাহার সামঞ্জস্য। অর্থ যদি খরচ না কর, সে আপনি আপনাকে খরচ করিবে। এই অর্থব্যবহার সম্বন্ধে জনসমাজে বড়ই অনভিজ্ঞতা দেখিলাম।"

"বংশবিস্তার প্রবৃত্তি হইতে চামড়ার ব্যবসায়ের উৎপত্তি। পৃথিবীতে কশাই বৃত্তির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। মাংসলোভী লোকগুলি কেবল চামড়ার ব্যবসায় করে। কেহ তৈল সাবান মাখাইয়া রৌদ্রের উত্তাপে চামড়া শুকাইতেছে, কেহ ঘসিতেছে, কেহ মাজিতেছে, কেহবা তাহাতে বার্নিস রং ফলাইতেছে; মধ্যে মধ্যে রেশম পশম শাল সাটিন, সোণা পান্না হীরা জহরতে সাজাইয়া বাহিরে দশ জনকে দেখাইয়া বলিতেছে। দেখ! দেখ! কেমন সুন্দর আমি! এই বুঝি তোমার আমি? কি সাংঘাতিক ভুল ভবের বাজারে কশাই ব্যবসায়ের কম্পিটিশন্ ভয়ানক। ভাগ্যে ভগবান পৃথিবীতে কতকগুল ধাতব পদার্থ আর ছাগ মেষ গুটিপোকা চূণ সাজিমাটি তৈল সৃজন করিয়া-ছিলেন; তাহার সাহায্যে চর্ম্মব্যবসায়ীরা বড়ই জাঁক দেখাইয়া বেড়াইতেছেন। কার চামড়া কত ফর্সা, কার কত শাঁসালো মাসালো তাই লইয়া প্রতিযোগীতা। সমস্ত দৃষ্টি পোষাক আর চামড়ার উপর। "ভাল আছ ত? সমস্ত কুশল?" [উ] "চেহারা দেখে বুঝতে পারছ না? প্রাণগতিক সমস্ত মঙ্গল।" চর্ম্মের পারিপাট্যের জন্য সকলে যেন উন্মত্ত! দুধ ক্ষীর মাখন ঘৃত মসলা ভূচর খেচরদ্বারা মসৃণ চর্ম্মাবৃত মাংসময় বড় বড় ভুঁড়ি, মোটা মোটা হাত পা, ফুলো ফুলো গাল সকল প্রস্তুত হইতেছে। ইহারা পৃথিবীর অনেক জায়গা

দখল করিয়াছে, একটু দাঁড়াবার স্থান নাই। এখানে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত উদর পূজার বড়ই ধুম ধাম। এই খাইয়া উঠিল, খানিক পরে আবার জলখাবার। গ্রীষ্মের তাপে, উদরভারে শেষ প্রাণ হাঁস ফাঁস করে, তখন চাকরকে বলে গা টেপ, পেটে তেল মাখা; কখন ডাক্তারকে বলে আমার পেট ফুলিল কেন দেখ, ঔষধ দাও খাই। তিন বার করিয়া খাবার ঘরে, পাঁচ বার করিয়া পায়খানায়; কেবল ছুটাছুটি দৌড়া দৌড়ি করিতেই অমূল্য সময় কাটিয়া গেল। এত বড়.বড় ভুঁড়ির চাপে কি আত্মা মাথা তুলিতে পারে? যখন কোন কাজ নাই, তখন হয় ঘামাচি মারিবে, না হয় গা খুঁটিবে, চুল ফেরাবে, কিম্বা নাকের লোম তুলিবে; দেহরাজ্যের কার্য্য আর ফুরাল না। এই চামড়ার বাজারের গোলমালে গিয়া যদি কেহ বলে, এস ভাই ধ্যান করি, সৎপ্রসঙ্গ করি, হরিগুণ গাই, তার কথা কে শুনিবে? চামড়ার শরীর লইয়াই সকলে দিন রাত্রি ব্যস্ত, আত্মার সঙ্গে কাহারো দেখা শুনা নাই। কেবল নিজের একটা শরীর কি? বংশ, উপবংশ, তিন চারি পুরুষের পর্য্যন্ত ভাবনা ভাবিতে হয়। চর্ম্মময় সংসারে দেহসর্ব্বস্ব জীবনে কেবল চামড়ার কথা। কেহ কিনিতেছে, কেহ বিক্রয় করিতেছে, কেহ আপনার দর এত বাড়াইয়া বলিতেছে যে অন্যের তাহা সহ্য হয় না। ইহার মধ্যে ভাল মন্দ, শাদা কাল, পাতলা পুরু, পাকা কাঁচা, দিশী বিলাতি অনেক প্রকার শ্রেণী বিভাগ আছে। তদনুসারে তাহাদের দর। কে ভাল আছে, কে ভাল নাই, চর্ম্ম দর্শনে তাহা বুঝা যায়। সুখ দুঃখ, মঙ্গলামঙ্গল ইহারই উপর নির্ভর করে। কিন্তু যে পরিমাণে চামড়ার চাকচিক্য সৌন্দর্য্য বেশী, সেই পরিমাণে তাহা আত্মা-বিহীন। যে কিঞ্চিৎ বুদ্ধির আভাস তাহাতে পাওয়া যায় তাহাও চামারে বুদ্ধি। এই চামড়ার আবার ছবি তুলিবার কতই ব্যবস্থা। নানা বেশ ভূষায় ভূষিত, নানা অঙ্গভঙ্গী এবং নানা অবস্থার ছবিতে গৃহ সজ্জিত, কিন্তু একটা ছবিও ঠিক উঠে না। ঠিক ছবি কেহ তুলিতে সাহসও করে না। আসল ছবি ঢাকিয়া রাখিয়া অস্থি মাংস চর্ম্ম এবং বসন ভূষণের ছবি তুলিয়া রাখে; তাই দেখে এবং তাই দেখায়। আমি এক দিন বলিয়াছিলাম, এ ছবি ঠিক হয় নাই, ইহা ছদ্মবেশধারী; তাহাতে অনেকে চটিয়া গেল। হায়! এমন পরশমণি পরমাত্মা, হীরকখণ্ড জীবাত্মা, তাহার ব্যবসার না করিয়া ইহারা কেবল কতকগুল পচনশীল অস্থায়ী অস্থি মাংস মেধ মজ্জার

দোকান লইয়া ভুলিয়া রহিয়াছে। যেথানে অমরাত্মা দ্বিজরাজ মহাজনেরা আধ্যাত্মিক মণি মাণিক্য, আতর গোলাপ এবং পুষ্প চন্দনের আনন্দবাজার খুলিয়াছেন সেথানে না গিয়া কশাইটোলায় দোকান খুলিয়া দিন রাত্রি ইহারা কেবল কাক চিল কুকুর এবং মাছি তাড়াইতেছে।"

"চামড়ার ব্যবসায়ের পরিণাম যে সমস্তই লোক্‌সান, তাহাও দিব্যচক্ষে আমি দেখিতে পাইলাম। অধিক দিন নিরাপদে এ ব্যবসায় কাহারো চলে না। বেশী দিন যাহারা টেনে বুনে চালাতে পারে, বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যুর হাতে তাহাদের নিস্তার নাই। পরিশেষে একবারেই ভরাডুবি। জগদ্ব্যাপী এক রোগেতেই সকলকে মাটী করিয়া রাখিয়াছে। রোগ প্রতি জনের নিত্য-সহচর। সম্রাটের রাজপ্রাসাদ, দরিদ্রের পর্ণকুটীর, ভূতল ভূধরশিখর, জল স্থল, নগর প্রান্তর সর্ব্বত্রই রোগের অধিকার। যুবক যুবতীর হৃষ্ট পুষ্ট দেহে রোগ, চিকিৎসকের নিজদেহেও রোগ। এই বহুরূপী রোগ চামড়ার ব্যবসায়ের উন্নতির মহা প্রতিবন্ধক। কোন যুবক ছাত্র, ভারি বুদ্ধিমান, খুব পরিশ্রমী, পরীক্ষায় প্রথম হইবে, দুই তিনটী বৃত্তি পাইবে; কিন্তু হায়! পরীক্ষার পূর্ব্ব দিন রাত্রে হঠাৎ কম্পজ্বর আসিয়া উপস্থিত। অভিভাবকেরা আশা করিয়াছিল, এবার ভালরূপে চামড়ার ব্যবসায় চালাইবে। শেষ ছেলের প্রাণ লইয়া টানাটানি; পাস করা দূরে গেল, কোনরূপে বেচারি এ যাত্রা বাঁচিয়া উঠিল। সুশিক্ষিত উপাধিধারী যুবা উকিল হইয়া অল্প দিনের মধ্যে খুব পসার করিয়া ফেলিলেন। বাক্সে টাকা আর ধরে না। বাড়ীতে, প্রতিবাসী সহচর, এবং কুটুম্ব মহলে খুব চামড়ার কারবার চলিতেছে, হঠাৎ তাঁর মুখে পক্ষাঘাত হইল, কথা বন্ধ; কারবারও বন্ধ। হাকিম বাবুটী অল্প বয়সেই জজের পদ পাইয়া ভুঁড়িটী বেশ গজাইয়া তুলিতেছিল, কোথা হইতে ডিস্‌পেপ্সিয়া রোগ আসিয়া জুটিল; তার পর ডায়বিটিস্, শেষ কারবাঙ্কল; চামড়ার ব্যবসায় সমস্ত বন্ধ। রাজা জমিদারের নাবালগ ছেলেটী সুগোল নধর হইয়া বেশ বাড়িয়া উঠিল; সে ঘোড়ায় চড়িয়া শিকার করিতে যায়, সাহেব মেমেদের সঙ্গে ইংরাজিতে কথা কয়, পোলো ক্রিকেট্ টেনিস খেলে, ওদিকে টাকাও অনেক জমিয়া গিয়াছে; খুব ভারী রকমে এবার চামড়ার কারবার চলিবে। ক্রমে নাবালগ সাবালগ হইল, দিন রাত্রি এখানে ওখানে চামড়াব্যবসায়ের কল কারখানা আরম্ভ করিল। খুব চামড়ার আমদানি রপ্তানি। অজ্ঞাতসারে তার মাথা

ঘোরায় রোগ দেখা দিল। তদনন্তর চামড়া পাতলা হইল, রক্ত এবং মেধ মজ্জা শুকাইল, ক্ষুধা কমিল, চক্ষে ঘুম নাই; হঠাৎ এক দিন সংবাদপত্রে প্রকাশ যে অমুক রাজার চামড়ার ব্যবসায় ফেইল• হইয়াছে। অনেক দিন ধরিয়া কেহ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, এখন ঘরে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে চামড়ার ব্যবসায় চালাইবে এই ইচ্ছা; সন্নিপাৎ রোগে বেচারির সব দাঁতগুলি পড়িয়া গেল। তখন না পারে চামড়া ছিঁড়িতে, না পারে মাংস চিবাইতে; অম্লরোগের জন্য তাঁহাকে রোজ রাত্রিতে সাগু খাইতে হয়। খাবার সামগ্রী সব মজুদ, লোভও বিলক্ষণ প্রবল, কিন্তু পেটে হজম হয় না। অনেক দামি দামি রকম রকম পোষাক কাপড় গহনা ঘরে বোঝাই, গৃহিণীর পেটে গুল্ম রোগ; কেই বা তখন কাপড় গহনা পরে, কেই বা গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে যায়। বিয়েপাগলা বুড় বামন তিন চারি বার পত্নীশোকে জর জর হইয়াছে। বিষয় যথেষ্ট, ভোগ করিবার কেহ নাই; কি করে, আবার বিবাহ করিল। কিন্তু বিধাতার মর্জ্জি কে বুঝিবে? তিনি তলে তলে তার এক প্রকাণ্ড ব্যারাম সৃষ্টি করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শেষ নড়ে বসতে পারে না। কাজেই চামড়ার দোকান বন্ধ করিতে হইল। নব্য বলিষ্ঠ উপার্জ্জনক্ষম যুবার বড় সাধ যে ভালরূপে সপরিবারে চামড়ার ব্যবসায়টী চালায়; স্ত্রীকে এমনি হিষ্টিরিয়া ফীটে ধরিল যে একবারে অস্থিসার। একটী বাবু বড় সাবধানী ছিলেন। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তার ভিত বিশ হাত গভীর; সেই বাড়ীর তেতালায় বসে তিনি ফিল্টার করা জল খান। গায়ে সর্ব্বদা ফ্লানেল, পায়ে মোজা, গলায় কম্ফটার, কাণের ছিদ্রে তুলা, নাকের কাছে সর্ব্বদা সেণ্টমাখান রুমাল। চাল ডাল একটী একটী করিয়া বাছিয়া তাই রান্না হইত। প্রতি ঘরে কার্ব্বলিক কর্পূর ছড়াছড়ি। বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ হামেহাল হাজির। বিষয়ও অগাধ। কিন্তু নিক্তির ওজনে আহার। দুগ্ধ খান, তার সঙ্গে সোডা। বাড়ীর ছেলে মেয়ে ঝি বউ নাতি সকলের জন্য এই ব্যবস্থা। মাথা ধরিলে ডাক্তার, পেট কিম্বা কাণ কামড়াইলে ডাক্তার; বাড়ীতে রাশীকৃত ঔষধের শিশি। তবু বিধাতার কি খেলা, রোগ এক দিন সে বাড়ী ছাড়িতে চায় না। খাবার লোভ ষোল আনা, জিনিষ পত্রও প্রচুর, কিন্তু কারো ক্ষুধা হয় না। কর্ত্তার মন এ জন্য বড়ই বিরক্ত, সর্ব্বদাই খিট খিট করেন, আর ডাক্তারকে বকেন। কিন্তু রোগগুলি এমনি দুষ্ট অবাধ্য যে কাহারো একটু খাতির করে না, গৃহস্বামীর উপর তাদের যেন বেশী চোটপাট। গ্রীষ্মকালে থসথস্

বরফ, টানাপাখা, তথাপি চক্ষে ঘুম নাই। শীতকালে কম্বল আগুন পর্দ্দা চা কাফি ওভারকোট, তবু সর্দ্দি কাশী। রোগের সেবা আর রোগের ভাবনায় সে পরিবারের জীবন কাটিয়া গেল। আসল কথাটা এই যে, চামড়া লইয়াই পৃথিবীর কারবার, কিন্তু তাহার ভিতরেই আবার রোগের বাসা। একটু বেশী টানা টানি পীড়াপিড়ি করিতে গেলেই সে বাহির হইয়া পড়ে; তখন যৌবন স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য, ধন জ্ঞান, উপাদেয় প্রচুর ভোজ্য, ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখের সামগ্রী আশা ভরসা সব মাটী। কেহ ভারী দুর্দ্দান্ত অসুর, কেবল লোককে মারে আর অপমান করে; হঠাৎ এক দিন শূল বেদনায় তাহাকে বিছানায় শোয়াইল। তখন আর তার মুখে কথা বাহির হয় না। যিনি অহঙ্কারে মাটীতে পা দিতেন না, যৌবন সৌন্দর্য্য জ্ঞান এবং ধনগর্ব্বে স্ফীত, অভিমানে মট মট, এমনি হার্ণিয়া রোগে তাঁকে ধরিল যে কাটা ছাগলের মত শেষ বিছানায় পড়ে লুটোপুটি। বড় বড় বীর পুরুষ, সম্রাট, চতুর রাজমন্ত্রী, বড় বড় যত সব চামড়ার সওদাগর; এক বার একটী দাস্ত, বস্ অমনি কর্ম্ম ফরসা। এক জন ভাবিতেন, আমার কত চাকর নফর লোক জন, কত আত্মীয় কুটুম্ব, এমন চামড়ার ব্যবসায় আর কেউ করিতে পারিবে না; এক দিন হঠাৎ বায়ুরোগে তাঁহার মুখ খানি ঠোট দুটীকে বাঁকাইয়া দিয়া গেল, এক গালে যেন একটী চড় মারিল; তার পর ক্রমে হস্ত অসাড়, পদদ্বয় অচল, নড়িবার শক্তি নাই; কুটুম্ব সহচরেরা উইলে কি লেখা হয় তাহার জন্য এক এক বার কাছে আসে; যাহাদের কিছু পাইবার প্রত্যাশা নাই তাহারা ক্রমে সরিয়া পড়িল; কাজেই শেষ চামড়ার ব্যবসায় উঠিয়া গেল। এক দিকে রোগে শোকে বার্দ্ধক্যে চর্ম্মব্যবসায়ের ক্ষতি, অপর দিকে তাহার চাকচিক্য সৌন্দর্য্য বাজারসম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন; তথাপি কালকীট অজ্ঞাতে ইহার শ্রীভ্রষ্ট করিয়া দেয়, ভিতর হইতে পচা দুর্গন্ধ উৎপাদন করে, সে গন্ধ কিছুতেই চাপিয়া রাখা যায় না। এই একটী মাত্র যাহাদের ব্যবসায়, অন্য কোন রূপ জীবিকা যাহাদের নাই, তাহাদের বড়ই কষ্ট। চামড়ার ব্যবসায়ে লোকসান হইলে চারি দিকে হাহাকার রব উঠে, সমস্ত সংসার যেন একেবারে শ্মশান হইয়া যায়। অনেকেই আবার নূতন নূতন চামড়ার দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ কাজেই লাগিয়া থাকে; কিন্তু বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু আসিয়া সমস্ত শেষ করিয়া দিয়া যায়। তখন কাঁদিবার লোকও কেহ থাকে না।

এই স্থানেই ইহার পরিসমাপ্তি। আমি এ বাজারে পচা দুর্গন্ধে আর তিষ্ঠিতে পারিলাম না; আত্মার বাজার কিরূপ তাহাই দেখিতে গেলাম।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আমাদের বন্ধুর বিচিত্র কাহিনীর বাচনিকাংশ এই অধ্যায়ে প্রায় শেষ হইবে। যাহা কিছু এত ক্ষণ আমরা শুনিলাম, ইহাতে পরিষ্কার বুঝা গেল না, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার মতামত কি। তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাহা আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই। তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি কেবল হাসিতেন। কার্য্য দেখিয়া তাঁহার ধর্ম্ম ঠিক করিয়া লইতে হইবে। উদার বিশ্বব্যাপী অদ্বৈতভাবাপন্ন দ্বৈতভাবের যোগ ভক্তি জ্ঞানের আভাস ইহাতে কিছু কিছু পাওয়া যায় এই মাত্র। পারিবারিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানমধ্যে তিনি ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রকৃত ছবি অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন। পৃথিবীর সাধারণ ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার গম্ভীর দর্শন কিরূপ ছিল তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।"

"মানবসমাজের নিয়ামক শক্তির মধ্যে ধর্ম্ম এক প্রধান এবং মূল শক্তি। কিন্তু ইহা ভিতরে যেমন অবিমিশ্র, বাহিরে তেমন নয়; বাহ্য আড়ম্বর এবং অবান্তর বিষয়ের গভীর তলে প্রকৃত ধর্ম্মশক্তি মৃদু গতিতে বহিয়া যাইতেছে। যদিও লোকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের নামে ধর্ম্ম নাশ করিবার জন্য যুগে যুগে অনেক কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি প্রকৃত সার ধর্ম্মশক্তিকে কেহ নষ্ট করিতে পারে নাই। কাজে কর্ম্মে যে যত মান্য করুক না করুক, ধর্ম্মের নামমাহাত্ম্যটা অত্যন্ত প্রভাবশালী। একটা মন্দির, কি গির্জ্জা, কি মসজিদ্ কিম্বা কোন প্রচলিত মতের উপর যদি বিধর্ম্মীরা আক্রমণ করে, দেখিবে যে ভীমরুলের মত সকলে লাঠি, বন্দুক, তলোয়ার লইয়া দলে দলে আসিয়া জমা হইবে। ভীষণ রক্তপাত, নরহত্যা, নগরদগ্ধ, দেশ উৎসন্ন হইলেও সে উদ্দাম উৎসাহ জাতীয় এবং সাম্প্রদায়িক একতা ভাঙ্গিবে না। কিন্তু লাঠি-বাজী, দাঙ্গা, দলাদলি বিবাদ, জাতিভ্রষ্ট, শাস্ত্রীয় বিচার বিতণ্ডা বক্তৃতা করিবার সময় যেমন উৎসাহ একতা, যোগ ভক্তি সাধনপূর্ব্বক ভগবদাভিমুখ্য

গতির উৎসাহ একতা তেমন নয়। সম্প্রদায়বদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারা এই জন্য বাহিরে অনেক কার্য্যসমারোহ পরব পার্ব্বণ দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা জনসমাজের অনেক বিষয়ে সাহায্যও হইয়া থাকে, কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, ইহা যেমন পূর্ব্বোক্ত চর্ম্মব্যবসায়ীদিগের উপকারে আইসে, আধ্যাত্মিক মহাজনগণের জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে তেমন নহে।"

"ধর্ম্মরাজের সর্ব্বত্রই "একতা" "একতা" এই শব্দ সচরাচর শুনিতে পাই। কিসের একতা? গোটা কতক মত, গোটা কতক বাহ্য ক্রিয়া, আর ভক্তগণের ও ভগবানের গোটা কতক নাম, তাঁহাদের প্রশংসাগান, ইহাতেই যাহা কিছু বাহ্য একতা; ভিতরের ভাবার্থ, আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য সম্বন্ধে প্রতি জনের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা। মুখশ্রী যেমন পৃথক্ পৃথক্, ঠিক তেমনি। গোলে হরিবোল দিয়া সামাজিক সম্ভ্রম রক্ষা এবং পুরাতন সংস্কার এবং অভ্যাস চরিতার্থ করিয়া সকলে নিশ্চিন্ত আছে। আমাকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের চক্রমধ্যে ফেলিবার জন্য অনেক স্থানে অনেকে চেষ্টা করিয়াছিল। আমি এই বলিয়া উড়াইয়া দিতাম, যে তোমাদের পুঁথিগত মতের আমি পক্ষপাতী নই। তোমরা কি ভাবের একতা চাও? না বাহ্য নিয়মের মৌখিক একতা? তাহা শুনিয়া সকলেই হাঁ করিয়া ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া থাকিত, আর বলিত, ভাবের একতা কি? এই এই মত মান, এই এই মত ছাড়; দলভুক্ত হও, আর পাঁচ জনে যা করে তাই কর; ভাব তোমার ভিতর কি আছে না আছে কে দেখতে যায়? এই কথাই সব জায়গায় শুনিলাম। আমি বলি, এক জনের সহিত অন্য এক জনের যে বিশ্বাসগত ভাবের আধ্যাত্মিক একতা তাহাই প্রকৃত মিলন এবং ধর্ম্মবন্ধন। আত্মা, হৃদয়, জ্ঞান, ইচ্ছায় যদি আন্তরিক যোগই না হইল, এক ধর্ম্ম তবে কিরূপে বুঝিব? যদি বল সামাজিক জীব মনুষ্য তাহার জন্য সামাজিক ধর্ম্ম একটা আর কতকগুল কাম্যকর্ম্ম চাই। সে কথা অবশ্য বলিতে পার। কিন্তু ভাই, আমার ছেলের বিবাহ দেওয়া এবং মড়াফেলার ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই। ভোজ ফলার খাওয়া আর পরব দেখা তাও চাহি না। বিশ্বাস ভক্তি প্রেম বৈরাগ্য নীতির আন্তরিক উপলব্ধির মিলনকেই আমি ধর্ম্ম বলি। এই জন্য আমার সঙ্গে ইহাদের কাহারো সহানুভূতি হইল না। আত্মার কারবার এখানেও নাই। কেবল গোলমালে চণ্ডীপাঠ। কে কি বলিতেছে, তাহা সে নিজেই বুঝে না। বলিবার অভ্যাস করিয়াছে, তাই বলিতেছে; শুনিয়াছে তাই

বলিতেছে; 'যেমন বল, তেমনি কর' এই মহাজনবাক্যের প্রায় কেহ অনুসরণ করিতে চাহে না। বাহ্য ধর্ম্মের অবশ্য একটা আকর্ষণ আছে। তাহাতে আমোদ আছে। চামড়ার ব্যবসায়ের পক্ষে তাহা একটী প্রধান সহায়ও বটে।"

"দুইটী মনোবৃত্তির এখানে কিছু প্রাবল্য দেখা যায়। এক বিচার, আর এক অন্ধভক্তিমূলক কল্পনা। এক দিকে জ্ঞানীরা অতি সূক্ষ্ম সুতীক্ষ্ণ বিচার দন্তে আদি পুরুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কাটিয়া কাটিয়া তাঁহাকে নিগুর্ণ কারণে, অনন্ত আকাশে উড়াইয়া দিতেছে; অপর দিকে ভক্তবৃন্দ কল্পনার মুখ ব্যাদান করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তিজন্য সত্য মিথ্যা যাহা সম্মুখে পাইতেছে তাহাই গিলিয়া ফেলিতেছে। প্রভেদ এই, জ্ঞানীরা উপবাসে উপবাসে অস্থিচর্ম্ম সার; ভক্তেরা অতি ভোজনে স্থূলোদর। জ্ঞানী বিচারবলে কেবল শূন্য আকাশ আর অন্ধকার ভক্ষণ করিতেছেন। ভক্তেরা যত রাজ্যের ভূতের গল্প, কবির কল্পনা, নির্ব্বোধের স্বপ্নকাহিনী, ভাবুকের ভাবান্ধতা বক্ষে ধরিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের কল্পিত হৃদয়পুত্তলিকার অঙ্গে জ্ঞানীদের বিচারদন্তের যদি একটু আঘাত লাগে, তাহা হইলে অমনি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। ইহারা উভয়েই সহজজ্ঞানহীন আত্মহারা জীব। জ্ঞানী সম্প্রদায় ইহা নয়, ইহা নয়, এইরূপ বলিতে বলিতে নিজেই শেষ সূক্ষ্ম বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেলেন, নাস্তিকতার মরুভূমিতে তাঁহাদের অস্তিত্ব ক্রমে বিলুপ্ত হইল। ভক্তসম্প্রদায় দেব দেবী, জড় পশু, বৃক্ষ লতা, তীর্থস্থান, নদ নদী সমুদ্র পর্ব্বত, চন্দ্র সূর্য্য ভূত প্রেত এবং শাস্ত্র বিধি নিয়ম, যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাজন, সমস্ত অধিকার করিয়া লইল। এই সকল বিষয়ে যদি এক গুণ সত্য থাকে, তাহা কল্পনা এবং ভাবান্ধতার সাহায্যে ক্রমে সহস্র গুণে বাড়িয়া উঠে।"

"যাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল এবং হইবে তাহাদের কথা আর আমি কিছু বলিব না। ভক্তদের ভক্তিক্ষুধার জন্য যাহাতে হৃদ্য পথ্য সত্যান্ন প্রেমান্ন কিছু সংগ্রহ করিতে পারা যায় সেই বিষয়টা একটু ভাবিয়া দেখি। ইহারা সত্য চায় না, কেবল ভাব চরিতার্থ করিতে চায়। কেহ দূর দেশে তীর্থে তীর্থে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে জঙ্গলে ঘুরিতেছে, কেহ পুথি খুজিতেছে, কেহ ক্রমাগত ব্রত নিয়ম কর্ম্মকাণ্ড বাড়াইতেছে, কেহ বা গুরুদেবের পা ধরিয়া টানাটানি, প্রসাদ লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে। তাঁহাদের

বিশ্বাস ভক্তি জ্ঞান সমস্ত দেশ কাল অবস্থায় বদ্ধ। যাই তীর্থ স্থান ছাড়িল, যাগ যজ্ঞ পূজা পাঠ সাধুসঙ্গ ফুরাইল, ব্রত উদ্‌যাপন হইল, সঙ্গে সঙ্গে অমনি হৃদয়ও শূন্য হইয়া গেল। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার এক স্থানে বাস, উভয়ে অভেদ বিমিশ্র; প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান যাহা কিছু সেই থানেই নিত্য কাল রহিয়াছে; সেখানে অন্বেষণ না করিয়া 'লেড়কা বগলমে, ঢুড়তা জঙ্গলমে।' ফাঁকের ঘর বুঁজাবে কে? বাহ্য ধর্ম্মের এই দুর্দ্দশা। অবিচ্ছেদে নিরন্তর হরি তোমার সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছেন, তুমি হরিদ্বার, ঋষিকেশ তপোবন কাশী বৃন্দাবনে গেলে, সাধুসঙ্গে মিশিলে, দুই পাঁচ দিন তাঁহার আবির্ভাব তথায় দেখিলে, প্রসাদ খাইলে, শেষ যেখানকার ঠাকুর সেই থানে তাঁহাকে রাখিয়া একা শূন্য মনে সংসারশ্মশানে আবার ভূতের দলে প্রবেশ করিলে। কেন ভাই এ বিড়ম্বনা? তোমার হৃদয় যে নিত্য বৃন্দাবন। সে বৃন্দাবন ছাড়িয়া হরি এক পাও কোথাও কখন যান না। হরি তোমার মাথার ছাতা, দেহবেষ্টিত আকাশ, ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, শীতের কাপড়। তাহা অপেক্ষা আরো নিকটে। তিনি তোমার চক্ষের আলোক, কর্ণের শব্দ, রসনার আস্বাদন, নিশ্বাসের বায়ু, পরমায়ু। তদপেক্ষা আরো নিকটে। তিনি তোমার জ্ঞানের জ্ঞান, ভাবের ভাব, বিবেকের বিবেক, ইচ্ছার ইচ্ছা। তার চেয়ে আরো কাছে। তিনি তোমার তুমি তাঁর; মাথামাথি, মেশামিশি অভেদাঙ্গ। ঘরে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেশে দেশে কেন তাঁকে তবে খুঁজিয়া বেড়াও?"

"আকাশে ভূতলে পর্ব্বত সমুদ্রে অন্তর এবং বহির্জগতে ভূলোকে দ্যুলোকে ভগবানের মহিমা এবং মঙ্গল কৌশল গাম্ভীর্য্য সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও নয়ন ভরিয়া দেখ; প্রকৃতির দ্বারে আঘাত করিলে পুরুষের [illegible] অভিপ্রায় গূঢ় উদ্দেশ্য সকল বাহির হইয়া পড়িবে; সর্ব্বত্র সেই ইচ্ছাময় পরম পুরুষের জ্বলন্ত অভ্রান্ত বিধি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে; কিন্তু প্রাণের মানুষকে দর্পণের সাহায্যে দেখিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। হৃদয়ের ধনকে তন্ময় হইয়া হৃদয়-মধ্যে অব্যবধানে দেখ। মানবসমাজে, ভক্তজীবনে তাঁহার দর্শন সাক্ষাৎ দর্শ-নের প্রধান উত্তরসাধক বটে, সে সাহায্য না হইলে চলে না; কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনীতে অনেক কল্পনার রং আছে, বংশের পর মনুষ্য বংশ আপনার মনের ভাব তাহাতে মিশাইয়া দিয়া আদি মূল বৃত্তান্তকে অতিশয় স্থূল এবং অস্বাভাবিক করিয়াছে, সে সমস্ত লইয়া তুমি কি করিবে? অন্তরস্থ

সদ্‌গুরু নিজের দিব্যালোকে যাহা দেখাইয়া দেন তাহাই দেখ, যাহা ধরিতে বলেন তাহাই ধর। পরের মুখে ঝাল খাইয়া, কল্পনার কুহকে পড়িয়া লোকের সঙ্গে বিবাদ বাধাইও না। যাহা জান না, দেখ নাই, তাহা লইয়া এত তর্ক যুক্তি কেন? কেন্দ্র স্বরূপ স্বীয় আত্মাতে দাঁড়াইয়া বাহিরে দূরে ভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শন কর এবং তাহারই ভিতরে পরমাত্মা, এবং তাঁহার ভিতরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখ। নানা স্থানে ভগবান্ নানা ভাবে বিরাজ করিতেছেন, দিব্যজ্ঞানালোকে তাহা খুঁজিয়া বাহির কর। ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময়, বাহিরের আলোকে তাঁহার বাহির মহলের বাহ্য ঐশ্বর্য্যের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়; তার পর অন্দর মহলে অন্তরালোকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই পরম পুরুষকে দেখিতে হয়। তাঁহার গুণের কথা, ব্যবহার আচরণ অন্যে বুঝাইতে পারে না; নিজের ভক্তিপ্রতিভায় তাহা বুঝিয়া, ভক্তগণের অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া লও।"

"এই ধর্ম্মজগতে অসার মিথ্যা প্রাণহীন ভাবহীন বাহ্যাড়ম্বর এত বেশী যে প্রকৃত পদার্থ বাহির করা অতি কঠিন কার্য্য। বরং বিষয়ক্ষেত্রে, হাটে বাজারে মার্কামারা বাটখারা এবং বাঁধা দর আছে, মিথ্যা প্রবঞ্চনার আধিক্য থাকিলেও কেহ সত্য একবারে লোপ করিতে পারে না; অন্ততঃ কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ, কিম্বা বাজারসম্ভ্রমের জন্য লোকে সত্যবাদী হয়। কিন্তু ধর্ম্মের ভিতর সত্য ধরা বড় কঠিন। এখানে এক ভাষার নানা অর্থ এবং টীকা, তাহাতে বেশ ফাঁকি চলে। সাধু অভিপ্রায়, প্রকৃত বিশ্বাস এবং সরল ভক্তির সঙ্গে দুরভিসন্ধি, স্বার্থপরতা, মলিন বাসনা নির্ব্বিঘ্নে লুকাইয়া থাকে। বাগ্মিতা, বেশভূষা, ভাবভঙ্গী, শাস্ত্রবচন, ধর্ম্মকার্য্যপ্রণালী, বাহ্য অনুষ্ঠান সকল পুরুষানু-ক্রমে লোকদিগকে ধার্ম্মিকের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। এ জন্য আন্তরিক বিশ্বাস এবং সদ্‌গুণের আর প্রয়োজন হয় না; ইহাও এক যন্ত্র বিশেষ। কপট ব্যবহার ক্রমে অভ্যাসগুণে সরলতা এবং আত্মপ্রবঞ্চনায় পরিণত হয়। স্বার্থ, কল্পনা, অভ্যাস তিন এক হইয়া শেষ সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য-রূপে প্রতিপন্ন করে। এক বার যদি আত্মপ্রবঞ্চনা ধর্ম্মবিশ্বাসে পরিণত হইল, তখন লোকপ্রবঞ্চনার স্রোত আর কিছুতেই বন্ধ করা যায় না।"

"জড় এবং চৈতন্যের ঘনিষ্ঠ মিলন এবং উভয়ের মৌলিক স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম-জগতের একটী চির অমীমাংসিত জটিল সমস্যা। ইহার প্রকৃত জ্ঞান অভাবে এখানে বড়ই গণ্ডগোল উপস্থিত দেখিলাম। সাকার নিরাকারের মীমাংসা

লইয়া পণ্ডিতদিগের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতেছে। হইবারই কথা। সাকারই বা কি? নিরাকারই বা কি? সহজজ্ঞানে ইহার পার্থক্য বেশ বুঝা যায়, কিন্তু সাকার পরিত্যাগ করিয়া যখন কেবল নিরাকার চৈতন্যের ভিতর অবতরণ করি, তখন দেখি সকলই অবিশেষ, নির্গুণ, অব্যক্ত। সাকার সামান্য নয়, ইহা নিরাকারকে দেখাইয়া ধরাইয়া দেয়। মর্ত্ত্যবাসী সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে জড়াবলম্বন পরিহার সম্ভব নহে; নিরাবলম্ব যোগে যোগীর পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। গভীর চিন্তা, ঐকান্তিক ধ্যানযোগে আত্মার ভিতর দিয়া পরমাত্মার শ্রবণ দর্শন লাভ হয় বটে, কিন্তু ইহার জন্য শিক্ষক, বাহ্য নিদর্শন, সাকার অবলম্বন এবং দৃষ্টান্ত চাই। ধর্ম্মাচার্য্যরূপী সাকার গুরুদেবের প্রথমেই দরকার। তাঁহার রসনার ভাষা, কণ্ঠের স্বর, চক্ষের জ্বলন্ত প্রতিভা এবং ভক্তির অশ্রুবারি, দেহের ভাবভঙ্গী, ললাটের গাম্ভীর্য্য, মুখের প্রশান্ততা; তাঁহার নৃত্যের জন্য হস্ত পদ, ভাব ভক্তিপ্রকাশক হাস্য ক্রন্দনের জন্য ওষ্ঠ, ধ্যান সমাধির জন্য স্থিরতা, বৈরাগ্য শিখাইবার জন্য সাত্ত্বিক ব্যবহার প্রয়োজন। অপরাধীকে শাসন, শত্রুকে ক্ষমা, দুঃখীকে দয়া, গুরুজনকে মান্য ভক্তি, প্রতিপাল্যদিগকে স্নেহ প্রেম, নিষ্কাম কর্ম্ম, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তিব্যাখ্যা, এ সমস্তই সাকার ক্রিয়া। অর্থাৎ অন্তরের যাবতীয় নিরাকার প্রেম ভক্তি বিশ্বাস বৈরাগ্য ন্যায় দয়া নীতি পুণ্য অপরকে শিখাইবার জন্য এবং শিখিবার জন্য সাকার শরীর নিতান্তই আবশ্যক। অথচ শরীরের কোন অঙ্গ কিম্বা ক্রিয়া ধর্ম্ম নয়, তাহারা সকলেই অস্থি মাংসনির্ম্মিত মৃত জড় এবং যন্ত্রবৎ। আত্মার ভাব প্রকাশ করে বলিয়াই, দেহের এত গৌরব। নচেৎ সাধু ভক্ত যখন জীবিত থাকেন, তখন তাঁহাকে দিন রাত্রি দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাঁহার প্রাণহীন ফটো কিম্বা মূর্ত্তি কত [illegible]ক দেখে? ঘরে ঘরে আশে পাশে ছবি ঝুলিতেছে, কে তজ্জন্য শ্রদ্ধাবান সাবধান হয়? জীবন্ত বাগ্মাদিনী আনন্দদায়িনী মূর্ত্তি চাই।"

"এখন প্রশ্ন এই, জড় হইতে চৈতন্য, না চৈতন্য হইতে জড়? আত্মা যেমন নিরাকার, অদৃশ্য; ইন্দ্রিয়গোচর স্থূল জড় পদার্থের মূল উপাদানও তেমনি অদৃশ্য। বস্তুতঃ তাহা যে কি, কেহই জানে না; পরমাণু একটা অনুমানের সিদ্ধান্ত মাত্র। তাহারা অবশ্য আপনাপনির মধ্যে মন্ত্রণা করিয়া জড় জীব উদ্ভিদ এবং মনুষ্যরূপে গঠিত হয় নাই। কেবল অমূর্ত্ত চৈতন্যের মূর্ত্তিমান্ আধার। জড় ব্রহ্মাণ্ডটা যেন পরমাত্মার ছায়াস্বরূপ। তাঁহা হইতেই

উৎপন্ন, আবার তাঁহা কর্ত্তৃক ইহা রক্ষিত হইয়া প্রতি ক্ষণে পরিবর্ত্তিত এবং রূপান্তরিত হইতেছে। প্রথমে এই জড়ীয় আধার ব্যতীত চৈতন্যের অস্তিত্ব বুঝিবার উপায় নাই। আবার জড়কে অতিক্রম করিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করা যায় না। রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রের কোন না কোন রূপ সাহায্য প্রথমে চাইই চাই। কিন্তু পরিশেষে এ সকলের পরিহারও একান্ত প্রয়োজন। কারণ, বাহ্যাবলম্বন যত কম হয়, ততই আধ্যাত্মিকতার উন্নতি; অতএব, যে পরিমাণে তাহা আধ্যাত্মিক যোগের সহায় সেই পরিমাণে তাহাদের আবশ্যকতা, স্বয়ং তাহারা কিছুই নয়। এ সমস্ত অনন্তের অচিন্তনীয় লীলা, বিচিত্র বিকাশ কেবল এক বিশ্বাসের আলোকে দ্রষ্টব্য। প্রগাঢ় ব্যাকুলতা, ভক্তি অনুরাগে চিত্ত বিহ্বল, হৃদয় প্লাবিত বিগলিত হইলে তিনি মানবাত্মার নিগূঢ় অভ্যন্তরে আপনা হইতে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন; ভক্তিরসে তাঁহার সেই প্রেমচ্ছবি তখন মুদ্রিত হয়; বিচার বুদ্ধি চিন্তা কল্পনার অতীত সে অবস্থা। মানুষ যখন তাঁহার হাতে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কেবল আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকে, তখনই দৈবশক্তি প্রভাবে দেবতার বিচিত্র দেবলীলা সে দেখিতে পায়। ধর্ম্মরাজ্যের মধ্যে ইহাই প্রথম এবং ইহাই শেষ কথা। অতিরিক্ত আর কিছু কেহ বুঝিতেও পারে না, বুঝাইতেও পারে না। তাই গৌরাঙ্গ পাণ্ডিত্যের অভিমান ছাড়িয়া অহৈতুকী ভক্তিস্রোতে জীবন ভাসাইয়া দিলেন। ঈশা বলিলেন, "শিশুর ন্যায় সরল হও; যাহা মহা মহা জ্ঞানীদিগের নিকট দুর্ব্বোধ্য, শিশুর নিকট তাহা প্রকাশিত।"

"ধর্ম্মরাজ্যে বাহ্যিক নিদর্শন এবং জড়াবলম্বনের এত যে প্রাদুর্ভাব, কিন্তু ইহা কি কেবল অজ্ঞান অশিক্ষিত অন্ধবিশ্বাসীদিগের কুসংস্কার ভ্রান্তির ফল? মানবস্বভাবসম্ভূত কি নহে? পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল জাতির মধ্যে তাহা দৃষ্ট হয় কেন? আত্মা পরমাত্মাকে লইয়া কেবল নিরাকার চৈতন্য জগতে কেন ধর্ম্ম বদ্ধ রহিল না? জড় চৈতন্য দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত পদার্থ, তবে একের দ্বারা অন্যের কি সাহায্য হয়? আমার মনে এই সকল গূঢ় গভীর প্রশ্নের উদয় হইল। শেষ দিব্যজ্ঞানে বুঝিতে পারিলাম, ইহলোক-বাসী মানবজীবন জড় চৈতন্যে মিলিত। এখানে তাহাকে যে কিছু জ্ঞান লাভ করিতে হয় সর্ব্বাগ্রে জড়ের ভিতর দিয়া। প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান যদিও

সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে তাহাও বাহ্য ব্যাপারের সহায়তার উপর অনেক নির্ভর করে; জড়ীয় অবলম্বন না হইলে তাহা কোন রূপ কার্য্যেও আসে না।"

"জড় জগৎ এবং ভৌতিক দেহের সঙ্গে যখন আত্মার এমন নিগূঢ় সম্বন্ধ, যখন যোগ সমাধি ধ্যান চিন্তা প্রভৃতি আত্মিক এবং মানসিক ক্রিয়াসাধনও দৈহিক স্বাস্থ্যসাপেক্ষ, তখন জড়তত্ত্বের ভিতরে বিধাতার গভীর অভিপ্রায় নিহিত আছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ইহাকে মায়া স্বপ্ন মিথ্যার মধ্যে গণনা করিলে চলিতেছে না। জড় পদার্থ ইহজীবনের নিত্যসহচর। এই জন্ত ধর্ম্মরাজ্যেও উহা দুরতিক্রমণীয়। ভগবানের জ্ঞান প্রেম করুণা শক্তি মহিমা জড়ের সাহায্য এবং উপলক্ষে আমাদিগের নিকট প্রথমে উপনীত হয়। যাহা অসার তাহা নিত্যতত্ত্ব, সার বস্তুকে প্রকাশ করে।"

"মাতৃস্তন্য, তাঁহার সাকার শীতল বাহুবক্ষ, মধুমাখা বচনাবলী, এবং আর আর বহুবিধ স্নেহ বাৎসল্যের বাহ্য নিদর্শন যেমন মাতৃস্নেহের প্রমাণ, তেমনি সাধু ভক্তের বাহ্য ব্যবহার, সদুপদেশ-বাণী, অঙ্গভঙ্গী ধার্ম্মিকতার নিদর্শন। ইহা দ্বারা অবশ্য মাতৃস্নেহ এবং সাধুর সাধুতা সম্যক্ প্রকাশিত হয় না; স্থলবিশেষে ভাববিহীনও বটে; কিন্তু বাহ্য নিদর্শন ব্যতীত উহা আদৌ অনুভব করা যায় না। এই সমস্ত নিদর্শন এবং অন্যান্য অসার অনিত্য বাহ্য পদার্থ ও ঘটনারাজী ভগবৎকৃপারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আরো কথা এই, জড় বাস্তবিক হেয় অপদার্থ নহে; রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের মধ্যে যে কি অদ্ভুত মহিমাশক্তি আছে, তাহা কেহই জানে না। ইহার সংযোগে বহুবিধ মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সমুৎপন্ন হইয়া চরিত্র গঠন করিতেছে। এই কারণে আমি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বাহিক নিদর্শনের ভিতর দিয়া নিরাকার চৈতন্যের অনেক লীলা খেলা দেখিতে পাই। অজ্ঞানান্ধ কৃষক স্নানের পর সূর্য্যের দিকে দুই হাত তুলিয়া যে প্রণাম করে, ইহার মধ্যে এক অব্যক্ত গম্ভীর ভাব আছে। দেবপ্রতিমা কিম্বা অন্যান্য বহু প্রকারের যে সকল বাহ্য নিদর্শন ধর্ম্মের নামে সচরাচর সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, যদিও সে সমস্ত চৈতন্যবিহীন জড়; কিন্তু কালী দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি প্রতিমা সেই অব্যক্ত পূর্ণ পরব্রহ্মের আধ্যাত্মিক সত্তা খণ্ডাকারে প্রচার করিতেছে। ভাবুক প্রেমিক গভীরদর্শী সাধক বাহ্য নিদর্শনের মধ্যে অনন্ত চিদানন্দের আভাস প্রাপ্ত হন। অজ্ঞানান্ধ কুসংস্কারসেবী পৌত্তলিক অন্ততঃ

তাহাতে কিছু অলৌকিক দৈবশক্তি আরোপ করে। আত্মার মধ্যে পরমাত্মার নিত্য আবির্ভাব এবং অভেদজ্ঞান যে পর্য্যন্ত অনুভূত না হইবে, তত দিন দেশ কালে বিচ্ছিন্ন বাহ্য চিহ্ন কিম্বা দেবমূর্ত্তি আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ মানবের পক্ষে অবলম্বন থাকিবেই থাকিবে। আবার সব জায়গায়, সব বস্তুতে ঈশ্বরজ্ঞান তাহাদের মনে আসে না, কিন্তু বিশেষ স্থানে বিশেষ বস্তু এবং দেবমূর্ত্তি দেখিলে তাঁহাকে স্মরণ হয়। তাই লোকে পথে চলিতে চলিতে দেবমন্দিরের পানে চাহিয়া মস্তক নত করে; পথের দুই ধারে যদি সমস্ত বাড়ী কালীবাড়ী হইত, তাহা হইলে প্রণাম করিতে পারিত না। সর্ব্বভূতে ভগবান্ নির্ব্বিশেষে আছেন সত্য, কিন্তু জড়াধারস্থিত বিশেষ জ্ঞান ভিন্ন তাহার চলে না, কিছু মনেও থাকে না। দেবমন্দির, ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং তাহাদের বিবিধ প্রকারের বাহ্যানুষ্ঠান এবং অবলম্ব্য পদার্থ সকল অবিশেষের স্মরণ চিহ্ন। উহা খণ্ড খণ্ড রূপে অখণ্ডের পৃথক্কৃত স্বরূপ লক্ষণগুলি মূর্ত্তিমান্ আকার ধারণপূর্ব্বক আধ্যাত্মিক ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দীপন করিয়া দেয়। তদবলম্বনে যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞান না পাও, তাহা হইলে তোমার বাহ্যপূজা ভক্তি জ্ঞান ও প্রাণবিহীন মিথ্যা অসার এবং উহা যান্ত্রিক কার্য্য বিশেষ। অতএব এই সকল বাহ্যাবলম্বন এক দিকে স্বাভাবিক। কিন্তু ভাবগ্রাহী তত্ত্বদর্শী সাধক ইহার খোসা ফেলিয়া, সার গ্রহণ করেন।"

"ভক্তি কোথায় অজ্ঞানান্ধ হইয়া জড় পৌত্তলিকতায় পরিণত হয়, এবং বাহ্যাবলম্বন কত দূর পর্য্যন্ত যোগবিজ্ঞানসঙ্গত, ইহার সীমা নিরূপণ করা বড় কঠিন। এই দৃশ্যমান বিশাল বিশ্বগ্রন্থ অদৃশ্য পরম চৈতন্যের নিরাকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে। এই গ্রন্থ পাঠ ভিন্ন তাঁহাকে জানিবার এবং বুঝিবার আর কোনই উপায় নাই। বাহ্যাবলম্বন সাহায্যে কর্ম্মযোগ, কর্ম্মযোগ হইতে জ্ঞানযোগ, এবং নিষ্কাম কর্ম্ম; পরিশেষে নির্গুণ ভক্তিযোগ। এই জ্ঞানযোগ শিক্ষার জন্য সর্ব্বাগ্রে পূজানুষ্ঠান, নাম জপ, মন্ত্র পাঠ, ভক্ত এবং দীনসেবা, সঙ্কীর্ত্তন, ব্রত উপবাস ইত্যাদি কর্ম্মযজ্ঞের প্রয়োজন। কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠান সাধককে স্থান কাল পদার্থ এবং প্রণালীবিশেষে বদ্ধ করিয়া ফেলে। যাহা মুক্তির উপায় তাহাই আবার বন্ধনের কারণ। ভক্তসেবা, সাধুর সমাধিস্থান দর্শন এবং তাঁহার অন্যান্য দৈহিক এবং ব্যবহার্য্য বস্তুর প্রতি ভক্তি করিতে করিতে অবশেষে সেই গুলিই সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে, এবং ভক্তই শেষ ভগবৎ স্থানীয় হন। এই খানে সকলে সাবধান! ঐ সমস্ত বাহ্যাবলম্বনের

নিজের কোন পরিত্রাণপ্রদ শক্তি নাই, কেবল সাময়িক অবলম্বন মাত্র; এই ভাবে তাহাদিগকে যত টুক ভক্তি শ্রদ্ধা সঙ্গত তাহাই করিতে হইবে; তাহাতে বেশী আসক্তি নির্ভর জন্মিলে মূল উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। উপায় উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। সহজজ্ঞানসংস্কার এবং নিষ্ঠা ভক্তির সামঞ্জস্য সাধনপূর্ব্বক জড় চৈতন্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া লও।"

"এই রাজ্যে অনেক মতামত, শাস্ত্রবিধি, তর্কযুক্তি বিচার সিদ্ধান্ত, এবং বহুবিধ দেবদেবী পূজানুষ্ঠান, ক্রিয়াপ্রণালী দেখিয়া এবং তাহাদের একের সহিত অপরের চিরবিবাদ সন্দর্শন করিয়া আমার মনে সহসা এই প্রশ্ন আসিল, কেহ কি ইহার একটা মীমাংসা কখনও করে নাই? অনন্তর সমুদায়ের সামঞ্জস্য সিদ্ধান্তে কেহ উপনীত হইয়াছে কি না তাহাই অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর একটী আশ্চর্য্য নূতন দৃশ্য নয়ন-গোচর হইল।"

"পৃথিবী যেমন স্তরে স্তরে রচিত, এক একটি যুগের চিহ্ন যেমন তাহাতে অঙ্কিত দেখা যায়, ধর্ম্মজগতের বিভিন্ন স্তরে তেমনি বিচিত্র যুগধর্ম্মের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। ভারতের ধর্ম্মেতিহাসের মধ্যে যদি প্রবেশ কর, দেখিবে উচ্চতর ব্রহ্মবাদ হইতে অতি নিকৃষ্ট জড় পশু প্রকৃতিপূজা পর্য্যন্ত নানা বিধ ধর্ম্মের এক একটি যুগচিহ্ন তন্মধ্যে স্তরে স্তরে রচিত। ভূস্তরনিহিত পদার্থ সকল দেখিলে পৃথিবীর উন্নতির ক্রম বুঝিতে পারা যায়। তেমনি ধর্ম্মের ইতিহাসের মধ্যে কখন কোন্ দেশে কিরূপ ধর্ম্মমত উদ্ভূত হইয়াছিল তাহার ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয়। আমি প্রথমে প্রাচীন যুগধর্ম্মের স্তর সকল একে একে দর্শন করিলাম, তদনন্তর আধুনিক সময়ে আসিয়া উপনীত হইলাম। বহু অন্বেষণের পর একটি স্তরে দেখিলাম, "সামঞ্জস্য" এই কয়টী কথা বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে অতিশয় উৎসুক হইয়া আমি সেই স্তরমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম। দৃশ্যটি বড়ই অভিনব, অন্য কোন যুগে এরূপ দেখিতে পাই নাই। এই সামঞ্জস্য যুগস্তরে অনেক গ্রন্থ, বস্ত্র, অলঙ্কার, খাদ্যবস্তু, গৃহভিত্তি, তৈজস, বাদ্যযন্ত্রে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অক্ষরে অঙ্কিত "নববিধান" পতাকা দৃষ্ট হইল। এই শব্দ ইংরাজি বাঙ্গালা মহা-রাষ্ট্রীয় দেবনাগর হিন্দী পারসী প্রভৃতি ভাষায় মুদ্রিত। ইহা দেখিয়া আমার ঔৎসুক্য আরো বর্দ্ধিত হইল। নববিধান নিশানাঙ্কিত ধাতব পদার্থগুলি অবিকৃতাবস্থায় রহিয়াছে। সোণা রূপার অনেক নিশানও দেখিতে পাইলাম।

বস্ত্রের নিশানগুলিও আদৎ রহিয়াছে, কিন্তু জরাজীর্ণ ; তুলিতে গেলে ঝর্ঝর করিয়া খসিয়া যায়। ঐ রূপ নিশান আঁকা প্রস্তরের সমাধি স্তম্ভ এবং বড় বড় ঘর বাড়ী মন্দিরও অনেক দেখা গেল। সংবাদপত্র, ছোট বড় গ্রন্থ যে কত তাহার সংখ্যা নাই। সমস্তই অক্ষত অখণ্ড আছে, কিন্তু নাড়িলেই গুঁড়া হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। আমি এই সকল সামগ্রী আস্তে আস্তে সরাইয়া আরো নীচে নামিলাম। সেখানে দেখি, তৈলচিত্র, ফটোগ্রাফ, বিবিধ ধাতুফলকে এবং হাত্তির দাঁতে আঁকা নানা প্রকারের মূর্ত্তি। ঈশা, মুসা, শাক্য, মহোম্মদ, কনফুস্, জোরোযেস্তার, এব্রাহেম, দাউদ, পল, শিব, নারদ, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ভগবতী, নানক, চৈতন্য, দাদু,কবির, রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্র ইত্যাদি যেখানে যত সাধু ভক্ত, যোগী, ঋষি, ঠাকুর, দেবতার নাম প্রচলিত আছে, সকলের ছবি এক স্থানে সংগৃহীত। যেন একটী সুন্দর চিত্রশালিকা। ইহাদের পাশে বেদোপনিষৎ, কোরাণ, বাইবেল, ললিতবিস্তর, জেন্দাভেস্তা, পুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ। তাহার চারি দিকে মন্দির, গির্জ্জা, মস্‌জিদ্, প্যাগোদা, সিনেগগ, তপস্যাকুটীর, গোফা। তৎসঙ্গে হোম, জলসংস্কারের চিহ্ন এবং গৈরিক কমণ্ডলু, একতারা, খিল্‌কা, কৌপীন, বহির্বাস, নামের ঝুলি এবং মালা ইত্যাদি সাধনোপকরণ। ঠিক যেন একটী ধর্ম্মজগৎ প্রদর্শনের মহামেলা। বড় বড় বিজ্ঞানশাস্ত্র, প্রতিভাশালী কবিদিগের কবিতা গাথা সঙ্গীত, দয়ালু দেশহিতৈষী মহাত্মাদিগের মূর্ত্তি, কীর্ত্তি এবং জীবনচরিত ; বিবিধ প্রকারের শিল্প, সাহিত্য সমস্তই এক জায়গায়। যুগে যুগে দেশে দেশে ব্যক্তিগতভাবে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার সমষ্টি এখানে। পরস্পর বিপরীত বিষয়ের সম্মিলন দৃশ্যটী আরো মনোহর। এক দিকে ষোল আনা সংসারের সামগ্রী,—খাট, বিছানা, ভাল কাপড়, গহনা, দিব্য রাজপ্রাসাদ ; ঠিক আবার তাহার সঙ্গে তপস্যাকুটীর, গৈরিক, একতারা, ব্যাঘ্র এবং মৃগচর্ম্ম, কমণ্ডলু। আবার ঠিক তার পাশে মৃদঙ্গ, করতাল, তূরী, ভেরী, এসরাজ ; ওঁকার, খুন্তি, চাঁদ, পঞ্জা, ত্রিশূলমিশ্রিত সমন্বয় চিহ্ন। কোথাও দিব্য পরিচ্ছদধারী ভদ্রলোকদিগের সভা, তাহাতে বক্তৃতা উপদেশ হইতেছে। কোথাও বা রাজপথ ধূলায় আঁধার করিয়া প্রেমোন্মত্ত ভক্তদল নাচিয়া নাচিয়া দুই বাহু তুলিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। একই ধর্ম্মজীবন বিভিন্ন অবস্থায় পরিব্যক্ত। কেহ গভীর ধ্যানে মগ্ন, কেহ তাঁহার পার্শ্বে কীর্ত্তনে প্রমত্ত। কেহ যোগাসন হইতে উঠিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়

হরিবোল বলিয়া নাচিতে লাগিলেন, আবার যিনি পাগলের ন্যায় নৃত্য করিতেছিলেন, তিনি গলদ্ঘর্ম্ম, ধূলিধূসরিত দেহে যোগের শান্তিজলে ডুবিয়া গেলেন। কেহ ধ্যান চিন্তা, লিখন পঠন পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুৎবেগে কর্ম্ম-ক্ষেত্রের দিকে ছুটিতেছে, কেহ বা কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া গভীর চিন্তান্ধকারে শাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইতেছে। যে জ্ঞানী, সেই ভক্ত, সেই আবার যোগী এবং সেই আবার কর্ম্মী; পর্য্যায়ক্রমে বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়া সামঞ্জস্য অবিভক্ত জীবনপ্রবাহ ছুটিতেছে। সে স্রোত কখন তরঙ্গলহরীময়, কখন শান্ত নিস্তব্ধ। সামঞ্জস্য ধর্ম্মজীবনে জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি যোগ রাসায়নিক মিশ্রণে এক সঙ্গে এক রঙ্গে যেন মিশিয়া গিয়াছে। ভিতরে এক, বাহিরে তাহার বিচিত্র বিকাশ।"

"পৃথিবীর সমস্ত সাধু ভক্ত ঋষি যোগী জ্ঞানী দয়ালু জনহিতৈষী, যাবতীয় ভাষায় লিখিত ধর্ম্মপুস্তক সৎগ্রন্থ, নানা প্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠান এক স্থানে দর্শন করিয়া আমি বড় বিস্মিত হইলাম। এ সব স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল, এক অপরকে ঘৃণা করিত, কে এ সব এক স্থানে মিলাইল? অনেক ক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিলাম। সামঞ্জস্য ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় মতগুলি এবং শিক্ষা ও সাধনপ্রণালী বড়ই হৃদয়গ্রাহী। কোথায় রক্তারক্তি কাটাকাটি বিবাদ, আর কোথায় একবারে বিশ্বপ্রেম মিলন। ধর্ম্মের অনন্ত বিচিত্রতা, অসংখ্য সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের ভিতর একতা, এ ভাব কাহার মনে উদয় হইয়াছিল? এত বড় প্রশস্ত হৃদয়, উদার বুদ্ধি কাহার? এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে উপরকার ঐ বিচিত্র বিমিশ্র সুন্দর দৃশ্যাবরণটী আস্তে আস্তে তুলিতে লাগিলাম। তুলিয়া শেষ তাহার ভিতরে দেখি, এক পরম সুন্দর মহাপুরুষের অপরূপ ছবি! তাঁহার প্রশস্ত ললাটে স্বর্ণাক্ষরে "সামঞ্জস্য" শব্দ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। এরূপ অভিনব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্মমূর্ত্তি কখন আমি দেখি নাই। উপরের বহুবিচিত্র ধর্ম্মসমষ্টির সারভূত পদার্থ একত্রিত ঘনীভূত হইয়া ঐ দিব্যমূর্ত্তি গঠন করিয়াছে। একাধারে যাবতীয় ধর্ম্মভাব দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। সামঞ্জস্যের শাস্ত্র দেখিলাম, তাহার প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধকে দেখিলাম, তদনন্তর ইহার কোন সম্প্রদায় আছে কি না, তাহা দর্শনের জন্য চিত্ত বড় ব্যাকুল হইল। সামঞ্জস্য ধর্ম্ম বিচিত্র স্বভাব স্বাধীন জীবনে সমাজমধ্যে কিরূপে পরিস্ফুটিত হইয়াছে তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি আরও নিম্নে অবতরণ করিলাম। এখানকার দৃশ্য অতি

শোচনীয়। সামঞ্জস্য ধর্ম্মের বাহ্য চিহ্ন, শাস্ত্র মত, বাহ্যানুষ্ঠান, সাধু মহাজনগণের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মচরিত্রের ছবি, এবং উপদেশাবলী তথায় চারি দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। যেখানে সেখানে "নববিধান" শব্দ অঙ্কিত, কিন্তু লোকগুলি পরস্পরের প্রতি বিমুখ; বিশেষতঃ পুরোহিত এবং আচর্য্যগণ। ধর্ম্মমত তাঁহাদের একই বটে, কিন্তু ব্যবহার পুরাতন সাম্প্রদায়িক প্রকৃতির অনুরূপ, অতিশয় বিবাদময়। "সাম্প্রদায়িকতা" এ রাজ্যের গালাগালি, তাহা দ্বারা এক অপরকে অভিসম্পাৎ করে, কিন্তু ইহাদের অনুদার আচরণ দেখিয়া বড় লজ্জা এবং দুঃখ হয়। হায়! হায়! কত দিনে এই অনন্ত বিচিত্র প্রকৃতিস্থ মনুষ্যসমাজ এক আলোকে, এক দৃষ্টিতে, এক সমতল ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া এক সার্ব্বভৌমিক সত্য ঈশ্বরকে দেখিবে। কবে এক সুরে জ্ঞান ইচ্ছা ভাব মিলাইয়া সমতানে সকলে এক দেবতার এক মহাসঙ্গীত গান করিবে! সমন্বয়ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার বড় পরিতাপ হইল, কিন্তু বুঝিলাম, ইহা ধ্বংস হইবার নয়; দেশান্তরে, বংশান্তরে এবং যুগান্তরে ইহা সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে, পরিশেষে জাতীয় জীবনে এবং সর্ব্বজীবনে পরিণত হইবে। এমন কি, এই বঙ্গদেশেই বিংশ শতাব্দীর পরেই হইতে পারে। পরে বিদায় গ্রহণের সময় পুনরায় ঐ সামঞ্জস্যাবতার মহাপুরুষকে এবং সমন্বয়ধর্ম্ম নববিধানকে এক বার প্রাণ ভরিয়া দেখিলাম, এবং ভূমি লুটাইয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলাম। ধর্ম্মজগতের সর্ব্ব স্থানেই সত্য সাধুতা বিদ্যমান আছে, খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ, হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম্ম এক একটি মহাশক্তিশালী দৈববল, তদ্দ্বারা মানবসমাজ বিধৃত রহিয়াছে, কেবল দুঃখ এই যে, এক অপরের বিরোধী; একের সার্ব্বভৌমিক সত্যও অন্যের সার্ব্বভৌমিক সত্যকে খণ্ডন করিতেছে! বিধাতা পুরুষ ক্রমাগত ইহাদের কাঁণ মলিয়া সুর মিলাইতেছেন। আহা! কবে সেই মিলন সুরের মহামিলন সঙ্গীত শুনিয়া সকলে সুখী হইবে!"

সপ্তম অধ্যায়।

আত্মারামের মুখে আমরা এই পর্য্যন্তই শুনিয়াছি। অবশিষ্ট মৃত্যুবিবরণ এবং পরলোকসংক্রান্ত যাহা কিছু ইহাতে বিবৃত হইল তাহা পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত। পাঠক মহাশয়েরা দেখিতে পাইবেন, একটি জীবনে কত বিচিত্র অবস্থা এবং বিচিত্র ঘটনা ঘটিতে পারে। বিস্তারিতরূপে সকল বিষয় আমরা বর্ণন করিতে পারিলাম না; অধিক লিখিলে কি জানি বা কাহারো মনে ইহা অলীক বলিয়া সন্দেহ হয়; এই জন্য কেবল মূল এবং সার সার গুরুতর বৃত্তান্তগুলি প্রকাশ করা গেল। বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া যখন তাঁহার ইন্দ্রিয় বিকল, শরীর শীর্ণ জীর্ণ হইল, তখনকার বিবরণ এই :—

"ফল যেমন সুপক্ক হয়, আমার দেহটি তেমনি পাকিয়া উঠিল। ক্রমে দেখি যে গায়ের ছাল পাতলা এবং শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। চুল সব শাদা এবং সরু সরু, মাংসপেশী শিথিল, কোমরে হাঁটুতে বল পাই না। রসনার স্বাদশক্তি, ত্বকের স্পর্শ এবং চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের বোধশক্তি অল্পে অল্পে কমিতে লাগিল। তার পর, সে ঠিক যেন টুক্‌টুকে পাকা আমটীর মত হইল; এক বার একটু জোর বাতাস লাগিলে অমনি বোঁটাটী খসিয়া ভূতলশায়ী হইবে। ইহার পূর্ব্বে কাজে কর্ম্মে খুব মত্ত ছিলাম, দেহপুরের সংবাদ লইতে পারি নাই। এক দিন আয়নায় মূর্ত্তিখানা দেখিয়া বেশ বুঝিলাম, আর বেশী বিলম্ব নাই, শীঘ্রই পরলোকযাত্রা করিতে হইবে। শরীর যখন ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, তখন আপনিই ভাঙ্গে, ভঙ্গশক্তি আপনার কাজ আপনি করে। দিনে দিনে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভঙ্গ। ভিতরে যেন কুলি মজুর লাগিয়াছে। কেহ দাঁত উপড়াইতেছে, কেহ হাড়ের বাঁধন খুলিতেছে, কেহ ভিত খুঁড়িতেছে, কেহ কাণের গর্ত্ত বুজাইতেছে, কেহ গালে মুখে চড় মারিতেছে, কেহ চক্ষে জাল বুনিতেছে। এই রূপে যৌবন জোয়ারের জল বার্দ্ধক্যের ভাটায় ক্রমে আস্তে আস্তে কমিয়া যাইতে লাগিল। কাজ কর্ম্ম সব বন্ধ, বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ সমস্তই প্রায় একে একে উঠিয়া গেল। ক্ষুধা নিদ্রা, স্নান ভোজন, ভ্রমণ বিশ্রাম, স্বাস্থ্যানুরাগ, দৈহিক উদ্যম সকলে একে একে বিদায় গ্রহণ করিল। দেহের তাদৃশ দুরবস্থা দর্শনে আমি আর ও দিকে বড় চাহিলাম না। কারণ, এরূপ যে হবে, তাহা পূর্ব্বেই জানা

ছিল। এই জন্য শরীরকে বেশী প্রশ্রয় দিতাম না। পীড়া কিম্বা অন্য কারণে দৈহিক ক্লেশ উপস্থিত হইলে প্রবৃত্তিগুলা ক্যান্ ক্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিত; এমনি তাদের আবদার যেন দেহই আমার সর্ব্বস্ব। মরিবার জন্যই যখন সে জন্মিয়াছে তখন আর ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিলে আমি শুনিব কেন? দুঃখ বেদনা সমস্ত ভুলিয়া কেবল আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিতাম। অনন্তর জীবনের হিসাব খতিয়ান করিতে লাগিলাম। আদ্যোপান্ত ঠিক দিয়া দেখি, পৃথিবীর সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, ভাবনা ভয় সকলই চলিয়া গিয়াছে। বাকী হাতে আছে কি? সদসদ্ অভ্যাস আর অনন্ত মঙ্গলের উপর আশা বিশ্বাস। সুখ দুঃখগুলা সাময়িক অবস্থা, ঠিক যেন স্বপ্নবৎ; ইহাদিগকে স্থায়ী মনে করিয়া যাহারা জীবন কাটায়, তাহারা বড়ই গণ্ড মূর্খ। কোথায় কবে সুখভোগ করিয়াছি, কোথায় কিসে দুঃখ পাইয়াছি, শেষ তাহার অনুভূতি কিছুই থাকে না। বস্তুতঃ মানবজীবন সুখ দুঃখের অতীত। স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া ব্রাহ্মীস্থিতি, এইটিই নিত্য অবস্থা। যখন আমি ইহা অনুভব করিলাম, তখন জীবন মরণের সীমা পার হইলাম। ভার অনেক কমিয়া গেল। সমস্ত বাদ ছাদ দিয়া কেবল ব্রহ্মজ্ঞানময় আত্মজ্ঞানটী লইয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। বাহ্য সাধনের মধ্যে কেবল প্রণাম; ত্রিসন্ধ্যা তিনটী দীর্ঘ প্রণাম করিতাম। কখন বা ইজিচেয়ারে বসিয়া থাকিতাম।"

"এই অবস্থায় দিন কাটান কিছু কষ্টের বিষয়। জীবনের পশ্চাদ্দ্বার রোধ করিয়া সম্মুখের দরজা খুলিয়া আমি চিন্তাযোগে হৃদয়ফলকে কেবল ভাল ভাল সব স্বর্গের ছবি আঁকিতাম, আর শুইয়া শুইয়া তাই দেখিতাম। যদি বল সে ত কল্পনা, সত্য ত নয়। হইলই বা কল্পনা? তোমরা স্বপ্নসমান সংসারসুখে কিরূপে মোহিত থাক? তদপেক্ষা সাধুচিন্তারচিত সদনুষ্ঠান, সত্যের আদর্শ কি সত্য নয়? প্রতি দিন এই প্রণালীতে আমি বহু প্রকারের সৎকার্য্য করিতাম। তাহাতে যে আমার আনন্দ সম্ভোগ হইত, তার সঙ্গে সংসারসুখ তুলনা করিলে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়।"

"বিশ্বাসমূলক অভ্রান্ত সারসত্যের পবিত্র কল্পনার রাজ্যে রাজা হইয়া সচ্চিন্তাযোগে ঈশ্বরের ইচ্ছার পূর্ণতা দর্শন করা এক প্রকার সশরীরে স্বর্গভোগ বলিতে হইবে। বৃদ্ধ বয়সে বকামি গল্প, পুরাতন কথার চর্ব্বিত চর্ব্বণ, নাতি পুতির উপর আসক্তি, আর মাঝে মাঝে অহিফেনের সহিত তামাকু সেবন, এইটীই ত সচরাচর পৃথিবীতে দেখা যায়। ঈদৃশ বৃদ্ধজীবনের প্রতি আমার

পূর্ব্বাপর বড়ই একটা অরুচি ছিল। সংসারের কাজ যখন ফুরাইতেছে, দেহের জ্ঞান এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ শিথিল নির্জীব হইয়া পড়িতেছে, তখন ও সব চর্চ্চা আর কেন ?”

“অতঃপর আমি কল্পনাস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলাম। ভাল হইতে ভাল, মন্দ হইতে মন্দ ইহা স্বভাবের নিয়ম। পবিত্র কল্পনার গভীরতা এবং উন্নতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্ষণিক কল্পনার ছবি আঁকিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম না ; যাহা চির দিন শান্তিপ্রদ, আমোদজনক, অথচ আদর্শ সত্য, এমন এক অনন্ত সৌন্দর্য্যময় নিত্য বৃন্দাবনে বাস করিতে আমার ইচ্ছা হইল। প্রথমে রাজা হইয়া রাজরাজেশ্বরের ইচ্ছা এবং তাঁহার মঙ্গল-সঙ্কল্পানুযায়ী একটি অভিনব সাম্রাজ্য প্রস্তুত করিলাম। এ রাজ্যে ইচ্ছা-মাত্র সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ইচ্ছাময়ের শুভ ইচ্ছায় যোগ দিয়া প্রথমে প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা এবং শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে বলিলাম, “বন্ধু, আর কেন ? যথেষ্ট হইয়াছে, প্রচুর অর্থসংগ্রহ করিয়াছ, এখন তোমরা সরিয়া পড় ; পরলোকের জন্য প্রস্তুত হও, আমি নূতন লোক দ্বারা শাসন এবং শিক্ষা সংস্কার আরম্ভ করিব। টাকা এবং পদের লোভ বড় লোভ, সহজে কি তারা কাজ ছাড়িতে চায় ? কখনও বলে, পঞ্চান্ন বৎসর বয়স হয় নাই, কখ-নও বলে, আরও তিন চারি বৎসর বেশী থাকিবার কথা আছে। আমি বলি-লাম, বিশ্বপতির আদেশ, চলিয়া যাও ! তিন ধমক দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলাম। যাঁহারা সাধু সচ্চরিত্র পুরাতন কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলাম,—দেখিও, যেন বিন্দুমাত্র ন্যায় সত্যের অপলাপ না হয় ! বুড় পাপীরা যখন বিদায় হইল, তখন ভাবীবংশের সন্তানদিগকে এক-বারে গোড়া হইতে সৎশিক্ষা দিতে লাগিলাম। পুরাতন বংশের ধ্বংসের পর এই নবীন বংশের পুত্র কন্যাসকল যখন রাজ্যের প্রজা এবং কর্ম্মচারী হইল, তখন ঘরে ঘরে হরিনাম, প্রেমবিনিময় ; সকলে মিলিয়া এক মণ্ডলী হইয়া এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দের পদপ্রান্তে বসিল ; এক সুরে, এক ভাবে তাঁহার জয় গান করিতে লাগিল।”

“এই সকল স্বর্গীয় লক্ষণ পুণ্যপ্রতাপ দেখিয়া চোর ডাকাত পাষণ্ড ব্যভি-চারী বারবধূ সুরাবণিক মদ্যপায়ী পরপীড়ক প্রবঞ্চকেরা আর দেশে থাকিতে পারিল না ; কেহ কেহ অনুতাপ করিয়া ভাল হইল, কতক মরি-য়াও গেল। শুঁড়িরা ঠাণ্ডা সুমিষ্ট সরবতের দোকান খুলিল, চোরেরা শিল্প

ব্যবসায় এবং ভৃত্য কৃষক কুলির কাজ আরম্ভ করিল। লক্ষ লক্ষ গণিকা দুঃখে ভরে তখন নিতান্ত কাতর হইয়া বলিতে লাগিল, "আমরা এখন কোথায় যাই! কুলের বাহির হইয়াছি, অন্য কোন কাজ জানি না, আমরা কি তবে অন্ন বিনা প্রাণে মরিব?" এই বলিয়া হাহাকার রবে কাঁদিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "তোমাদের ঘৃণিত ব্যবসায় আর চলিবে না; কারণ, আমি প্রজাকুলকে পবিত্র দাম্পত্যপ্রণয়ে বদ্ধ করিয়াছি; এখন হয় তোমরা অনাহারে মর, না হয় পতিতাশ্রমে গিয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, শিল্পবিদ্যা শিক্ষা কর। যদি খুব ভাল হইতে পার, বিবাহ দিয়া দিব; নতুবা রাধুনী, না হয় ঝি কিম্বা ধাত্রীর কাজ করিবে। যদি সন্ন্যাসিনী তপস্বিনী হইয়া পরসেবায় জীবন দিতে চাও, আরও উত্তম।" এ কথায় সকলেই ভারি সন্তুষ্ট হইল। কেহ কেহ পাপ স্বীকারপূর্ব্বক সরল অনুতাপের সহিত আমার পায়ে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আহা সে কি স্বর্গের দৃশ্য! পতিতপাবন হরি যেন তাহাদের অশ্রুজলে প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান। ঈদৃশ পরিবর্ত্তন এবং কাতরতা দর্শনে আমিও তাহাদের পদধূলি মস্তকে লইলাম। শেষ জীবনে ইহারা কেহ কেহ দেবীপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।"

"ন্যায়বান্ বিশ্বপতির আজ্ঞা কার সাধ্য লঙ্ঘন করে! গণিকাবৃত্তি, সুরাব্যবসায়, চৌর্য্য মিথ্যা, প্রবঞ্চনা এ সব কেবল সেই পুরাতন ছয়টা রিপুর কাজ বইত নয়! যখন তাহাদিগকে চোখ রাঙ্গাইয়া ধমক দিলাম, তখন বাষ্প বন্ধ হইলে যেমন কল থামিয়া যায়, তেমনি ঐ সমস্ত দুর্নীতির কার্য্য আপনাপনি থামিয়া গেল। মনুষ্যকুল ক্রমশঃ মনুষ্যত্বে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে দেবশ্রেণীতে উঠিতে লাগিল। আমাকে তখন নিজে আর রাজ্যশাসন করিতে হইত না; যাঁর কাজ তিনিই সব করিতে লাগিলেন। প্রজারা আপনা হইতে রাজকর দিয়া যায়, দরকার হইলে বেশীও দেয়; আপনারাই আপনাকে নীতির শাসনে নিয়মিত করে। শাসনের জন্য একটী পয়সাও আর ব্যয় নাই। আহা কি চমৎকার রাজ্য! প্রজাদের তাদৃশ সৌজন্য ভদ্রতা সাধুতা দেখিয়া আমি এক দিন তাহাদের পদতলে গড়াগড়ি দিলাম। তাহাতে সকলের প্রেম ভক্তি কৃতজ্ঞতা একবারে উথলিয়া উঠিল। তখন তাহারা কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "আহা! আহা! রাজা হইয়া এ কি করেন!" অনন্তর আমাকে সকলে প্রেমালিঙ্গনে শেষ এমনি চাপিয়া ধরিল যে, প্রাণ যায় আর কি! আমি বলিলাম, ভাই, রাজাও মিথ্যা, প্রজাও মিথ্যা, সত্য কেবল

ভগবান্; আমি রাজাও নই, কেহই নই; আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান, পরস্পর ভাই ভগ্নী। এই কথা শুনিবামাত্র সমস্ত প্রকৃতিপুঞ্জ হরি হরি বলিয়া নাচিতে লাগিল। ভারি মজা! আমি প্রতি দিন ঘরে ঘরে গিয়া সকলের সংবাদ লইতাম। দিন রাত্রি এই কাজে মজিয়া থাকিতাম।"

"কি আনন্দের রাজ্যই স্থাপিত হইল! নিত্য নিত্য যেন নব নব মহোৎসব। প্রজাকুলের মায়াদূষিত বিকৃত স্বভাব যদি এক বার প্রকৃতিস্থ হয়, তাহা হইলে রাজ্যশাসনের জন্য কোনই ভাবনা থাকে না। পৃথিবীর শাসনকর্ত্তাগণ অপরাধীকে জেলে পাঠাইয়া তাহাকে আরো পশু তুল্য করিয়া ছাড়িয়া দেন। না হয় ত, একবারেই গলাটা কাটিয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তি করেন। এই কি শাসন? না শিক্ষা? ফাঁসি দিয়া, জেলে এবং দ্বীপান্তরে পাঠাইয়া এ পর্য্যন্ত কয়টা আত্মাকে তোমরা ভাল করিয়াছ? জোর জবরদস্তি পশুবল ভিন্ন বন্যপ্রকৃতি স্বার্থপর মনুষ্যকে বসে রাখা যায় না সত্য, কিন্তু সে নিকৃষ্ট শাসনপ্রণালী, সভ্য জাতির উপযুক্ত নহে। ক্রমশঃ বিবেকের স্বাধীনতা দিয়া আত্মশাসন প্রতিষ্ঠিত করাই রাজধর্ম্ম। চির দিন ভয় দেখাইয়া নিজের স্বার্থসাধন, কর্ত্তৃত্ব স্থাপন কি রাজধর্ম্মের প্রথম এবং শেষ লক্ষ্য হইতে পারে? দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন রাজধর্ম্ম বটে; কিন্তু দুষ্টকেত শিষ্ট করা চাই! সে জন্য দয়ার্দ্র হৃদয়ে প্রজার দ্বারে দ্বারে যাও, তাহাদের গলা ধরিয়া কাঁদ, তখন দেখিবে কেমন তাহারা ভাল হয়, কি না। যেখানে রোগ সেই খানে ঔষধ দাও। রোগ চাপিয়া রাখিয়া "বহু লোকের বেশী সুখ" নীতিতে মানব প্রকৃতিকে শেষ বিকৃত পশুবৎ করিবার জন্য রাজপদের সৃষ্টি হয় নাই। এ কি জাহাজ-ডুবি, যে কতকগুল বস্তা জলে ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্টকে রক্ষা করিবে? মানুষকে প্রকৃতিস্থ করাই যে প্রকৃত রাজশাসন, তাহা এখনও পর্য্যন্ত ইহাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না। কি দেখিয়া তবে লোকের রাজভক্তি হবে? আপনাকে আপনি শাসন করিতে পারিলে না, অন্যকে শাসন করিবে? প্রজা সাধারণের যদি ছয়টা রিপু থাকে, কর্ত্তৃপক্ষের কি শত সহস্র প্রবল রিপু নাই? লোভ হিংসা স্বার্থ অবিদ্যা অহঙ্কার এবং ক্রোধের ক্রীতদাস হইয়া লোকশাসন সম্ভব নহে। যিনি বিশ্বেশ্বর লোকনাথ প্রজাপতি বিধাতা তাঁহার স্পষ্ট ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া নাস্তিক মন লইয়া রাজধর্ম্ম প্রতিপালিত হয় না। সকলের উপর সেই এক জন মহাশক্তি মহাবুদ্ধিশালী পরমপুরুষ নিরন্তররূপে বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিলে না, তাঁহার দৈবশক্তি দিব্যজ্ঞানের

সাহায্য লইলে না, অথচ এক দিকে আগ্নেয়াস্ত্রধারী সৈন্য, অপর দিকে আইনের পুস্তক লইয়া প্রজাশাসনভার গ্রহণ করিলে। কে দিলে এ ভার? কতই নূতন নূতন আইন এবং নরহত্যার কত নূতনবিধ আগ্নেয় আয়ুধ রচিত হইতেছে! এরূপ রাজনীতির মূলে পূর্ণ সত্য, পূর্ণ ন্যায় আছে কি?"

পণ্ডিত আত্মারামের এই সকল মন্তব্য রাজবিদ্রোহিতা বলিয়া যেন আমাদের মনে সন্দেহ হয়। এই জন্য অবশিষ্ট তীব্র ভর্ৎসনাগুলি আর প্রকাশ করা গেল না। অবশ্য ইহাতে লাইবেল্ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই; কারণ, কোন ব্যক্তিবিশেষকে তিনি এ সব কথা বলেন নাই। কিন্তু কথাগুলি ঠিক। তবে আমরা না কি ছাপোষা ভীরু কাপুরুষ গৃহস্থ মানুষ, তাই ভয় করি। আত্মারাম প্রাচীন বয়সে নূতন রাজ্যের রাজা অথবা সেবক হইয়া অনেকবিধ আমোদ সম্ভোগ করেন। অন্য আর এক দিনের কথা এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন;—

"বড় বড় পাষণ্ড নাস্তিক, অহঙ্কারী স্ত্রী পুরুষ, যাহাদের ভাল হইবার কোন আশা ছিল না; এমন কি, ধর্ম্মের বেশে যাহারা জনসমাজের শান্তি ভঙ্গ করিত; সভ্য জ্ঞানী হইয়া যাহারা সত্যাসত্য ন্যায়ান্যায়, দেবতা গোসাঞী, ইহপরলোক কিছুই মানিত না; তাহাদের মনের পরিবর্ত্তন দেখিয়া শেষ আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। যে কাউকে মানে না, সর্ব্বদা মাথা উঁচু করিয়াই থাকে; সদুপদেশ দিলে বলে, "ও সব অনেক জানা আছে", অর্থাৎ না মরিলে আর যাদের কোন আশা ভরসা নাই; এমন যে সব লোক, অদ্ভুতকর্ম্মা অন্তর্যামী ভগবান, গোপনে তাহাদের আত্মার মূল স্প্রিং যাই একটু স্পর্শ করিলেন, অমনি অনুতাপের জল হু হু শব্দে পড়িতে লাগিল। শেষ তাহারা একবারে যেন কুমারের মাটী, যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া গড়াইতে পার। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য অলৌকিক কর্ম্ম আর কি কিছু আছে? কেহ জলের উপর দিয়া হাঁটিলেন, কেহ আকাশে মেঘের উপর চড়িয়া স্বর্গে গেলেন, কাহারো শূল রোগ ভাল হইল, অন্ধেরা চক্ষু পাইল, বধির শুনিল, মূক কথা কহিল; না হয় খঞ্জেরা দৌড়িতে লাগিল; এ কি আর আশ্চর্য্য অলৌকিক ক্রিয়া? এ সবত বেদিয়ার বাজী, ভূতের খেলা। অথবা অন্ধ বধির মূকবিদ্যালয়ে আজ কাল এ বিষয়ের দৃষ্টান্তের অভাব কি?"

"যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আমি জ্ঞান সভ্যতা ছাড়িয়া কিছুতেই

হরিভক্ত হইব না; এক দিন দেখি যে ফকীরের বেশে সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, স্বহস্তে হবিষ্য রাঁধিয়া খাইতেছে, আর যেখানে হরি-সঙ্কীর্ত্তন হয় সেই খানে গিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দেয়। কেমন জব্দ! তুমি না বলে ছিলে ভক্ত হবে না? কে তোমায় এমন দশা করিল? সে তখন হাসিয়া কাঁদিয়া বলে, "ভাই, এক দিন হৃদয়ের ভিতরটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল, খানিক পরে দেখি যেন কম্প দিয়া গায়ে জ্বর আসিল, শেষ চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল; তার পর হইতেই এই দশা ঘটিয়াছে।" আমি মনে মনে হাসি আর বলি, "হাঁ বাবা! এস, এখন পথে এস!" কোন এক যুবক দম্পতী, দিবা নিশি কেবল বাবুগিরি করিয়া বেড়াইতেন, হরিভক্ত প্রেমিক বৈরাগীদিগকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিতেন, কখন বা কৃপাপাত্র জানিয়া তাহাদিগকে কিছু টাকা পয়সা দিতেন। সময় আসিল, যখন তাঁহারা কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় আমরা ভবে আসিয়া কি করিলাম! কতক-গুল বসন ভূষণ খাদ্য সামগ্রী, আর অস্থি মাংস লইয়া ভুলিয়া রহিয়াছি! এই বলিয়া বৈরাগ্য বেশ ধরিলেন; ত্রিসন্ধ্যা পূজা পাঠ ধ্যান নামগান, সাধু ভক্তের সেবা, জপ তপ সাধন ভজনে একবারে মত্ত হইলেন। কে এ সব পরিবর্ত্তন ঘটাইল? ভগবানের কি অপূর্ব্ব লীলা! পাপীদের প্রতি শ্রীহরির করুণা দেখিয়া আমি শেষ তাঁহার চরণে মাথা রাখিয়া নীরবে পড়িয়া রহি-লাম। বুঝিলাম, অলৌকিক বটে! দেবশক্তিতে সকলই সম্ভব হয়। আহা! অনুতপ্ত পাপী বড়ই সৌভাগ্যশালী।"

"এই সঙ্গে পৃথিবীর গুরু পুরোহিত, ধর্ম্মশিক্ষক আচার্য্য মহাশয়দের কার্য্য-ফলগুল মনে পড়িল। কেহ কেবল বক্তৃতাই করিতেছেন। তাহা শ্রোতার এক কাণ দিয়া ঢুকিয়া অন্য কাণ দিয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে! কাহারো মনও ফেরে না, কিছুই না। কেহ বা দিবা নিশি পুঁথি পাঁজি পত্রিকাই লিখিতেছেন; কে যে পড়ে, আর কোথায় যে সে সব যায়, দু দিন পরে খোঁজ খবর নাই। যে শিক্ষা মানুষের চরিত্রে স্বভাবে প্রকৃতির মধ্যে জাতীয় শোণিতে স্থান না পাইল তাহা কোন্ কাজের? এরূপ প্রণালীতে কিছু হয় না দেখিয়া কেহ কেহ বুজুর্কির সহিত একটু রকমওয়ারি করিয়া কাণে মন্ত্র দেন, তুকতাক করেন, অদ্ভুত বেশ ভূষায় সজ্জিত হন, কখন রোগের ঔষধ বলিয়া দেন, কখনও বা হক না হক হাসেন, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যান, মুখভঙ্গী করেন; কিন্তু কিছুতেই শিষ্যের মন আর বদলায় না। যখন

কোন প্রকারেই তাহার মন ফিরিল না, তখন গুরু দেবের কলাটা মূলাটা, মুরগির আণ্ডাটা আষ্টা যা কিছু আসে তাই লাভ। শক্তি সঞ্চারের ক্ষমতা নাই, কেবল উপদেশে কি হইতে পারে? যেমন গুরু, তেমনি শিষ্য!"

"আমি যে রাজ্য বসাইলাম, তাহাতে উপদেশ বক্তৃতাও নাই, শাসনও নাই, কেবল স্বভাব স্পর্শ। বড় বড় গাড়ী ঘুড়িওয়ালা রাজা জমিদার, মহা মহা বিদ্বান্, যুবক যুবতী, দীন কাঙ্গাল, সকলেই হরিভক্ত এবং সকলেই সুখী হইল। কেহ দলাদলিও করে না, ঘৃণা নিন্দাও নাই; যে গরিব সে তাহাতেই সুখী, আবার যিনি ধনী জ্ঞানী রাজা রাণী তাঁহারাও সুখী। জ্ঞানী মূর্খের সহিত, ধনী গরিবের সহিত জ্ঞান ধন বিনিময় করিতে লাগিল। সকলেরই সুখ শান্তি এক অনন্ত গুণাকর হরিতে; তিনি সকলের সকল ক্ষতি পূরাইয়া সাম্যবাদ স্থাপন করিলেন। আহা! এ সব ভাবিলেও কত আনন্দ হয়। কখন নানা বিধ সাধুকার্য্যে ব্যস্ত, কখন বা ভক্তগণসঙ্গে হরিসঙ্কীর্ত্তনে মত্ত; মধ্যে মধ্যে অমরগণের সহিত আলাপ, এবং একাকী যোগ ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতাম। এই রূপে বিছানায় শুইয়া এক ধর্ম্ম, এক পরিবার, এক দেবতা, একেতে সমস্ত একাকার করিয়া ফেলিলাম।"

"আর একটী বড় মজার জায়গা আমি করিয়াছিলাম। সেটী সকলের অপেক্ষা একবারে চূড়ান্ত। এই নবরাজ্যের যত কিছু দয়া প্রেম পুণ্য শান্তি সদ্ভাব সাধুতা মধুর ব্যবহার সমস্ত তথায় ঘনীভূত। অর্থাৎ সৃষ্টির যাবতীয় সার এবং নিত্য বস্তু এক স্থানে। সেখানে কেহ গভীর ধ্যান সমাধিতে মগ্ন হইয়া পরমশান্তি ভোগ করিতেছেন, কেহ প্রেমানন্দে মাতিয়া নাচিতেছেন গাইতেছেন। কেহ তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতা দর্শনে অবাক্ হইয়া বসিয়া আছেন, কেহবা হরিভক্তিতে ডুবিয়া ভ্রাতৃসেবা করিতেছেন। কেবল হাসি, কেবল নৃত্য গীত আর ভালবাসা, সেবা পরিচর্য্যা; তাহার সঙ্গে উজ্জ্বল অভ্রান্ত ব্রহ্ম-জ্ঞান। সমস্ত সত্য এবং সাধুভাব যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া এখানে বিরাজ করিত। জরা বার্দ্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়া প্রভুর এই অপূর্ব্ব লীলা দেখিতাম, আর মাঝে মাঝে তাঁর চরণে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতাম। আহা পিতার কি মধুর স্নেহ বাৎসল্য! আমার দুর্ব্বল মস্তকে, জরাগ্রস্ত ভগ্ন দেহে তিনি আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া দিতেন, আর কত আশার কথাই শুনাইতেন! এমন আদর আর কেউ করিতে পারিবে না। এক এক বার তাঁহার সুপ্রসন্না মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া আমি স্নেহে গলিয়া যাইতাম।

কি মধুর ভালবাসা! বলিতাম, 'মা! আর আমার কোন সাধ নাই, সব সাধ তুমি মিটাইয়া দিয়াছ; এখন এই প্রার্থনা, রোগ আর মৃত্যুযন্ত্রণাটা যেন এই রূপ সাম্য এবং শান্তিতে পার হইয়া যাইতে পারি।' মা বলিতেন, "কোন ভয় নাই। আমি তোকে আরও ভালবাসিব। আমি কত ভালবাসি তা কি তুই জানিস্?" দয়াময়ী মায়ের উদার স্নেহ বাৎসল্যের ব্যবহার দেখিলে প্রাণ যেন ফাটিয়া যায়। সে আশাবাণী শ্রবণে আমি বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলাম। গত জীবনের যাবতীয় করুণার ঘটনা তখন মনে পড়িয়া গেল। হায়! আমি তাঁর স্নেহ প্রেম ক্ষমা ঔদার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারি নাই। দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দু, প্রত্যেক পরমাণুতে সে দয়ার কথা অঙ্কিত ছিল। আমি শেষ কাঁদিয়া, তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া অন্তরের ক্ষোভ নিবৃত্ত করিলাম। কত উপেক্ষা, অনাদর করিয়াছি, আহা! তথাপি মা আমায় কখন কোলছাড়া করেন নাই।"

"ইহার পর পরলোকসম্বন্ধে জ্ঞান আমার বড় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। জরা ব্যাধি মৃত্যু পরলোকগমন কিছুতেই আর এখন আমার ভয় বা সংশয় রহিল না। দয়াময় পিতার প্রসাদে এই রূপে যখন নিরাপদ শান্তিময় স্থিত-প্রজ্ঞায় আরূঢ় হইলাম, তখন জীবন মরণ, ইহ পরকালের ব্যবধান ঘুচিয়া গেল, নিত্যযোগে জীবাত্মা পরমাত্মায় স্থিতি করিতে লাগিল। আমার স্ত্রীও আমার পার্শ্বে রোগভগ্ন হইয়া শয্যাগত থাকিতেন। জীর্ণ পিঞ্জরবাসী দুইটি পক্ষীর ন্যায় উভয়ে অমরত্ব বিষয়ে আলাপ করিতাম। পরে তিনি আমার অগ্রেই চলিয়া গেলেন। আমি বলিলাম, যাও, আমিও শীঘ্র আস্‌ছি।"

অষ্টম অধ্যায়।

আত্মারামের মুমূর্ষাবস্থা, মৃত্যুবিবরণ এবং পরলোকগমনবৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য আমাদের একটা অত্যন্ত পিপাসা ছিল, পাঠকমহাশয়দিগেরও বোধ হয় এ বিষয়ে সমধিক ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকিবে; কিন্তু সাংঘাতিক রোগ, মৃত্যু এবং পরলোকবাসের কথা তাঁহার নিজমুখে শুনিবার সম্ভাবনা কোথা? সে সময় আমরা তাঁহার নিকটে ছিলাম না। ঈদৃশ অদ্ভুত প্রকৃতি বহুদর্শী সাধুর মৃত্যুবিবরণ এবং পরলোককাহিনী না শুনিলে জীবনচরিতটী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। এই জন্য বহু কাল পরে আমরা তাঁহার বাক্স

ডেস্ক আলমারি ব্যাগ খুঁজিতে আরম্ভ করি। অনেক অনুসন্ধানের পর তন্মধ্যে কতকগুলি হস্তলিপি প্রাপ্ত হই। তাহাই এখন প্রকাশিত হইবে। কিন্তু হস্তলিপি কাহার, কিরূপেই বা তাহা এখানে আসিল, তদ্বিষয়ে আমরা কোন সন্ধান প্রাপ্ত হই নাই। সে সম্বন্ধে আর বেশী বিচার তর্ক গবেষণা ভালও লাগিল না। আমাদের প্রার্থনীয় বিষয় হস্তগত হইল, তজ্জন্যই অদৃষ্টকে ধন্যবাদ! কোন মুমূর্ষু, মৃত কিম্বা পরলোকগত ব্যক্তির নিজ অভিজ্ঞতার কথা এ পর্য্যন্ত স্বয়ং কেহ কখন বোধ হয় সরল গদ্যে এ প্রণালীতে বলে নাই। কিন্তু কেমন করিয়া কোন্ নৈসর্গিক উপায়ে যে আত্মারামের সে সব কথা এ পৃথিবীতে আসিল, ইহা এক আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। এই জন্যই সে সকল বিবরণ আমাদের নিকট আরো শ্রদ্ধেয় এবং মূল্যবান্। লেখার ধরণ, এবং চিন্তাপ্রণালী, ভাষার প্রাঞ্জলতা, এবং ভাবের গভীরতায় পরিষ্কার বুঝা যায়, এ লেখা আত্মারামেরই বটে। ক্লারভয়েন্স দ্বারা কোন প্রেততত্ত্ববাদী কর্তৃক যদি ইহা লিখিত হইয়া থাকে, বলিতে পারি না। সুবিজ্ঞ বহুদর্শী পাঠকমহাশয়দিগের উপর এ বিষয়ের সুবিচারভার অর্পণ করিয়া আমরা শীঘ্র শীঘ্র গ্রন্থ শেষ করিয়া ফেলি; নতুবা পুঁথি ক্রমে বাড়িয়া যাইবে। প্রথমতঃ সঙ্কট রোগের অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন;—

"শেষ দশায় এই শরীরটার কি দুর্গতিই হয়! যে জল বায়ু সূর্য্যরশ্মি ইহার প্রাণ, তাহাই আবার ইহাকে তখন শীঘ্র শীঘ্র বিনাশের পথে লইয়া যায়। জীবনীশক্তি যখন অস্তমিত হইতে লাগিল, তখন কেবল রোগেরই শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাইলাম। দেহটা যেন একটা মহানরক, তাহাতে অনন্ত কোটী কীট কিল্ বিল্ করিতেছে। হায়রে আমার যৌবনের সুন্দর তনু! তুমি কি আশ্চর্য্য ভেল্কা বাজীই দেখাইলে! রোগে জরাজীর্ণ তনুখানি পরিশেষে অস্থি আর পলিত গলিত মাংসে পর্য্যবসিত বিকটাকার এক ভূতবিশেষ। শ্রী সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য সমস্তই গেল; ইন্দ্রিয়ের দ্বার ক্রমে রুদ্ধ হইয়া আসিল। হাজার জপ তপ সাধন ভজন কর, কাহাকে কি রোগে, কত কষ্ট পাইয়া শেষ যে মরিতে হইবে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। ঠাকুর যেন আমাকে এবার বলপূর্ব্বক মহাবৈরাগ্যের বেশে সাজাইলেন। জীবিতাবস্থায় অনেক বার বৈরাগী সাজিয়াছি, সব সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছি, কিন্তু এবার একবারে ভিটস্থ ঘুঘুস্থ। রোগ কি নিষ্ঠুর! এক মায়ের একটীমাত্র ছেলে, আহা! যেন গোলাপের ফুলটি; প্রাণহরণ রোগ তাহারও হাড় কালী করিয়া দেয়। এক দিকে

যমে টানে, এক দিকে ডাক্তারে খোঁচা দেয়, আর এক দিকে আত্মীয়েরা বুকে চেপে ধরে, বড়ই বিভ্রাট! বাড়ীতে ডাকাত পড়িলে যেমন হয়, রোগে আমাকে তেমনি উদ্বাস্ত করিয়া তুলিল। কার সাধ্য আর তখন শরীরে বাস করে? যে পর্য্যন্ত বোধশক্তি, জীবনীশক্তিটুকু থাকে, হৃৎপিণ্ডে ফুস্‌ফুসের জাঁতা চলে, তত ক্ষণ কেবল মার মার কাট কাট শব্দ। শেষ নিশ্বাসটুকু সমস্ত বেরিয়ে গিয়ে দুটো দুই জায়গায় হলে যেন বাঁচি, এমনি মনে হয়। ক্ষুধানিদ্রাহীন ভগ্ন জরা দেহ লইয়া বিছানায় পড়িয়া থাকা একটা ভয়ানক পরীক্ষা, এবং ইহাই জীবনের শেষ শিক্ষা এবং শেষ পরীক্ষা; ইহাতে সকলকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। উৎকট যন্ত্রণা যখন শেষসীমায় উপনীত হয়, তখন ঈশার ন্যায় নরোত্তম সাধুর মুখেও "হে পিতা, হে পিতা, কেন তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে?" এই কথা বাহির হইয়া পড়ে। অথচ কত শত মহাপাপী অল্প ক্লেশে প্রাণত্যাগ করিতেছে। কিন্তু যন্ত্রণার চরমাবস্থায় অবসন্নতার শান্তি, অজ্ঞানতার শান্তি, বিশ্বাসজনিত বাহ্যচৈতন্যবিহীন আন্তরিক শান্তি থাকে। আমি পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়া রাখিয়াছিলাম, 'মাগো! সেই সময় দেখ, যেন তোমার চরণ ধরে পড়ে থাক্‌তে পারি।"

"রোগ যখন ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিল, তখন তাহাকে বাধা দিবার আর কেহই নাই। ডাক্তার মহাশয়ের বিদ্যা বুদ্ধি হার মানিল। তখন তিনিও অন্তিমের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। সে যেন স্বর্গের নিমন্ত্রণ! আমি প্রস্তুতই ছিলাম; কিন্তু দুশ্চিকিৎস্য, যন্ত্রণাদায়ক পীড়ার যে ক্লেশ যন্ত্রণা সেটাত আর সুস্থাবস্থায় কল্পনাযোগে অনুভব করা যায় না। এখন সেই দুর্ব্বিষহ ক্লেশ অনুভব করিবার সময় আসিল। গেল! গেল! গেল রে! বেদনায় হাড় ভেঙ্গে গেল! উহু হু হু মলেম মলেম, হাত পায়ে খাল ধরছে। দাঁতে ঠোঁটে ঘা, নাকে মুখে গন্ধ, গলায় শ্লেষ্মা, চক্ষে ছানি, পৃষ্ঠে ক্ষত, শৌচ প্রস্রাব বন্ধ। বড় জ্বালা, বড় জ্বালা, বাতাস কর, জল দাও, জল দাও, বুক শুকিয়ে গেল! শয্যাকণ্টকী, শ্বাস কাশ, স্বেদ কম্পন হিক্কা, বিকার দাঁতকপাটি, উত্থান, পতন, সর্ব্বশেষে খাবি। মৃত্যুরোগ এক মহাপর্ব্ব, কত বলিব। যখন দেখিলাম যে বেদনার অন্ত নাই, উপশমেরও আশা নাই, প্রবল স্রোতঃস্বতীর ঘূর্ণাজলে ভীষণ তরঙ্গ তুফানে জীবনতরী যায় যায় হইল, তখন বিশ্বাসবলে, প্রবল ইচ্ছাশক্তিযোগে ইচ্ছাময়ের শীতল ক্রোড়ে মাথা লুকাইয়া রহিলাম। বলিলাম, 'প্রভো! রক্ষা

কর, আর পারি না।' তাঁহার কৃপায় সহিষ্ণুতাশক্তি বাড়িল, অথবা বোধশক্তি কমিয়া গেল; তৎসঙ্গে ঐকান্তিক বিশ্বাসে কিঞ্চিৎ দৈববল আনিয়া দিল; তখন ভগবচ্চরণে আত্মবিসর্জ্জন পূর্ব্বক মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইয়া কথঞ্চিৎ স্থিরতা এবং ধৈর্য্যের সহিত এই গীত গাইলাম :—

"এই তো সে দিন দয়াময়! নিকটে এল সময়। জীবনে মরণে প্রভু, হোক তব জয়।

ঘেরিল চৌদিক্ কাল অনন্ত আঁধারে, আমারে, ডুবিল তরী পাথারে; দীপ হইল নির্ব্বাণ, প্রাণ করিল পয়ান, ফুরাইল সব ভবলীলা অভিনয়।

কে আছে না আছে কাছে দেখিতে না পাই, কেহ নাই, পিতা মাতা বন্ধু ভাই; কোথা রহিল এখন, দারা সুত ধন জন, কালগ্রাসে পঞ্চে পঞ্চ হইল বিলয়।

অনন্ত বিজনে একা পাইনু এখন নিরঞ্জন, একমেবাদ্বিতীয়ং; তুমি মা আমি ছেলে, থাকি দুই জনে মিলে, কিসের ভাবনা আমার, কিসেরইবা ভয়!

কে আমি কোথায় এবে গেল অহংজ্ঞান অভিমান, জাতি কুল নাম ধাম; চিদাকাশে চিদাভাস, মহাযোগে করে বাস, বিন্দু যথা সিন্ধুনীরে একাকার হয়।

বিশ্বাস আলোক এবে কর হে উজ্জ্বল, দেও বল, ভবপারের সম্বল; খোল পরলোক দ্বার, দেখি দেখি এক বার,—পিতা তব নিত্যধাম অমর আলয়।" [খাম্বাজ—ঠুংরি]

"গানই গাও, আর দুর্গা দুর্গা তারা ব্রহ্মময়ী বলিয়া চীৎকারই কর, মৃত্যুর যন্ত্রণা হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। এখন দেহটী রহিল কেবল যন্ত্রণা ভোগের জন্য। তার পর দেখি, ইন্দ্রিয়গণ কখন নিষ্ক্রিয়, কখন বা কিছু কিছু কার্য্যক্ষম; ক্রমে ক্রমে প্রদীপটা যেন নির্ব্বাণ হইয়া আসিল। তথাপি দেহবাসী আত্মা তাহার দৈহিক সংস্কার শীঘ্র ছাড়িতে চায় না। মৃত্যুটা কিরূপ হয় তাহা দেখিবার জন্য আমার মনে বহু দিন হইতে একটা বড় কৌতূহল ছিল। তদনন্তর কখনও স্বপ্ন প্রলাপ, কখনও বা জাগ্রত চৈতন্যের কিঞ্চিৎ আভাস। এত যে আদর যত্নের শরীর, সে সময় তাহার দুর্দ্দশার আর শেষ রহিল না। তখন সুস্থ সবল দেহ ইন্দ্রিয়ের, ক্ষুধা নিদ্রা ভ্রমণ বিশ্রাম রুচি জীর্ণশক্তির কত মূল্য তাহা বুঝিতে পারিলাম। আহা এই পা দুখানিতে কত পথই হাঁটিয়াছি! যখন যেখানে ইচ্ছা হইত চলিয়া যাইতাম। চক্ষে কত সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, কর্ণে কত মধুর সঙ্গীত ধ্বনি-

য়াছি, রসনায় কত সুখসেব্য উপাদেয় বস্তুর স্বাদ লইয়াছি, কণ্ঠে কত গীত গাইয়াছি, হস্তে কত কাজ করিয়াছি। এখন যদি আমার সর্ব্বস্ব কেহ লুটিয়া লইয়া যায় একটী কথাও বলিতে পারিব না। নানা বিধ সুখকর আহার্য্য পানীয় সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহার এক কণিকা গলাধঃকরণ হয় না। তাদৃশ দুরবস্থায় দেহের উপর আর কি কিছুমাত্র আসক্তি, মায়া তিষ্ঠিতে পারে? গেলে বাঁচি, দুইটা দুই জায়গায় হলে বাঁচি, এই কেবল ইচ্ছা হয়। আহা! এ সময় মৃত্যু মনুষ্যের কি পরম বন্ধু। সে যেন মায়ের মত কাছে আসিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা করিয়া দিয়া যায়। অবশেষে কি সুনিদ্রাই সম্ভোগ করা গেল!"

"নিজ অভিজ্ঞতায় যত দূর বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে এইটী স্থির সিদ্ধান্ত হইল, যে এ সময় আর অন্য কোন কাজই হয় না। হাসি আনন্দ আমোদ ত দূরের কথা, দুঃখ ক্রন্দনেরও অবসর থাকে না। নারীর প্রসব বেদনার সময় সে যেমন সন্তান প্রসব করিয়া সুখী হয়, মরিবার কালে আত্মা তেমনি শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেই বাঁচে। কিন্তু তখনও মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ দৈহিক বাসনা বর্ত্তমান থাকে। তদনন্তর বলক্ষয় হিমাঙ্গ, সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। একটা কথা কহিবার কিম্বা হাতটা পা টা নাড়িবারও এখন শক্তি নাই। কাজেই এ সময় লোকে সুদীন বিনম্র হয়। জীবনীশক্তির হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে শেষ যন্ত্রণাও ক্রমে কমিতে লাগিল। যে বোধ করিবে সে পরলোক গমনের জন্য তখন ব্যস্ত। পরে চারি দিকে কান্নার রোল উঠিল। কি ভীষণ সে শব্দ! এবং কি সুগম্ভীর শোকাবহ সে দৃশ্য! ইহার ছবি আঁকিতে পারে এমন উপযুক্ত কবি কোথায়? এই চরমদৃশ্য একটু দেখিতে না দেখিতে, আত্মীয়দের আর্ত্তনাদ শুনিতে না শুনিতে আমার চক্ষু কর্ণ বন্ধ হইয়া গেল। তখন বড় ইচ্ছা হইল, ভাই বন্ধুদিগকে জন্মের মত শেষ দেখা এক বার দেখি; কিন্তু হায় চক্ষের জ্যোতি নিবিয়া গিয়াছে, কে দেখিবে! তাহাদের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিব এমন সামর্থ্য টুকুও রহিল না। কথা কহিতে যাই রসনা নড়িতে চায় না; চক্ষু খুলিয়া দেখিতে যাই, কেবল কুয়াশা অন্ধকার দেখি। কিঞ্চিৎ দ্রাক্ষাপীযূষ পান করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু মুখ হাঁ করিতে পারিলাম না। চারি দিকে আত্মীয়-বর্গ বসিয়া গায় হাত বুলাইতেছে, কিন্তু স্পর্শানুভব নাই। পূর্ব্বে ইঙ্গিত মাত্র আমার দেহ নানা কার্য্যে পরিচালিত হইত, এখন তাহাকে যাহা

করিতে বলি তাই সে বলে যে পারিব না। তাহাকে নিতান্ত অবাধ্য দেখিয়া মনে অত্যন্ত বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। অনন্তর সময় উপস্থিত দেখিয়া পৃথিবীর মায়াসক্তি কাঁদিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন। তাঁহার রোদন শ্রবণে আমারও ইচ্ছা হইল একটু কাঁদি; কিন্তু চক্ষু নাই যে একটু অশ্রুপাত করি। যে দিকে যাই সব দিক্ বন্ধ। মুক্ত ব্যক্তিকে কারাবন্দী করিলে যেমন তাহার মন ছট ফট করে, তদ্রূপ আমার মনটা এক বার বড়ই চঞ্চল হইয়াছিল; কিন্তু উপায় কি? বেঁধে মারে সয় ভাল।"

"এই অবস্থায় আমি ভবসাগরের মাঁঝামাঝি আসিয়া পৌঁছিলাম, এবং ক্রমেই যেন কোন অতল জলে ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম। পরলোকের টান ধরিলে কে তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে? সে টান প্রতি ক্ষণে বাড়িতে লাগিল। পৃথিবীর যোগ তখন প্রায় সমস্তই কাটিয়া গিয়াছে, কেবল হৃদয়যন্ত্রে সঞ্চিত বাতাসটুকু নিশ্বাসের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া গেলেই সব হাঙ্গাম চুকিয়া যায়। কিন্তু পার্থিব মোহাসক্তির কি কঠিন বন্ধন! চড়াই পাখীদের বাসা ভাঙ্গিয়া দিলেও তাহারা পুরাতন স্থানটা ছাড়ে না। কাটা ছাগলটা যেমন এক আধ বার নড়িয়া উঠে, তেমনি দেখি যে আমার প্রাণটা বাড়ীপানে যেন ফিরিয়া আসিতেছে। সমাধি স্থানের চারি পার্শ্বে যেমন পরলোকস্থ ব্যক্তির প্রেতাত্মা ঘুরিয়া বেড়ায়, পক্ষীমাতা বিনষ্ট শাবকের মমতায় যেমন তাহার বাসার চারি দিকে উড়িতে থাকে, শুষ্ক নির্ম্মাল্যরাশির কাছে কাছে যেমন তাহার গন্ধ ভ্রমণ করে, কিম্বা বিদেশগামী ব্যক্তি যেমন বহু কাল পরে মাতৃভূমির ভগ্নাবশেষ চিহ্ন দেখিতে আইসে, আমার পূর্ব্বসংস্কার তেমনি দেহসংক্রান্ত বিষয়গুলির দিকে বার বার মুখ ফিরাইতে লাগিল। তদনন্তর অন্তরে অন্তরে আত্মীয় বন্ধুবর্গকে আলিঙ্গন চুম্বন করিয়া বিদায় লইলাম। ও দিকে শ্বাসও আরম্ভ হইল। তখন যোগে চিত্ত সমাধান করিয়া শ্বাসবায়ুর স্বন স্বন শব্দের সহিত আধ্যাত্মিক সুরে এই বিদায়সঙ্গীতটি গাইলাম ;—

(খয়রা) "হরি হরি বলে, দাও বিদায় এবে, ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাই। জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে! কেঁদ না, কেঁদ না ভাই। (হরি হরি বল) একে একে এস সবে, মার কাছে দেখা হবে, (আবার)—(অমর লোকে) সেথা রোগ শোক বিয়োগ কিছু নাই।

(লোফা) পদধূলি দিয়ে সবে, কর আশীর্ব্বাদ, ভুলে যাও নিজগুণে

দোষ অপরাধ। (মনে রেখ না, রেখ না) কর ভাই প্রার্থনা ইষ্ট দেবতার দ্বারে, পাই যেন দেখা তাঁর মৃত্যুর আঁধারে। (ভবনদীর ধারে)

(ঠুংরি) সাজিয়ে দাও বৈরাগীবেশে, চলে যাই হেসে হেসে, হরি হরি বলিয়ে বদনে; (ভাইরে)—(শান্তিনিকেতনে) পাসরিয়া রোগ শোক, যাব আজ পরলোক, বিহরিব অমরভবনে। (ভাইরে) সমাধি-আঁধারে বসি, নিরখিব প্রেমশশী, লোকান্তরে একাকী বিজনে; (ভাইরে) প্রবেশিয়া যোগবলে, অনন্তের শান্তিকোলে, মিশে যাব হরির চরণে। (ভাইরে) হেরিব নূতন দেশ, ধরিব নূতন বেশ, পরিহরি ভবপান্থধাম; (জনমের মত) লও প্রেম আলিঙ্গন, প্রণতি কর গ্রহণ, গাও মা আনন্দ-ময়ী নাম। (ভাইরে)—(গাও গাও ভাইরে) চলিনু বিদেহবাসে, দাও ভিক্ষা প্রেমদাসে, পথের সম্বল হরি নাম। (হরি বল বল রে)"

"মৃত্যুর অব্যবহিত শেষ অবস্থাটা ইহপরলোকের সন্ধিস্থল। দেহের নিকট শেষবিদায় লইবার সময় অল্প ক্ষণের জন্য একটা বড় ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ঠিক যেন গর্ভযন্ত্রণার পর সন্তানপ্রসব। অতঃপর মোহ মেঘা-চ্ছন্ন বিশাল কাল সমুদ্রের মধ্যস্থলে গিয়া যখন আমি উপনীত হইলাম, তখন একটা ভয়ানক রকমের ঝড় তুফান আরম্ভ হইল। যেন প্রলয় কাল উপস্থিত। ঊর্দ্ধে, অধোদেশে, পার্শ্বে কেবল এক সর্ব্বব্যাপী অনন্ত অন্ধকার। গাঢ় তিমিরাবৃত গগনতলে, ভীষণ তরঙ্গায়িত সমুদ্রজলে জীবনতরণী টলমল করিতে লাগিল। দেহ হইতে জীবনীশক্তি ইতঃপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। শেষ পিঞ্জর ভাঙ্গিলে যেমন পাখী, ঘর ভাঙ্গিলে যেমন গৃহস্থ পলায়, তদ্রূপ আমার আত্মারাম দেহগেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য পথ খুঁজিতে লাগিল। অনেক দিনের মিলন, শীঘ্র কেহ কাহাকে ছাড়িতে চায় না। পরে শরীরের সমস্ত শিরা স্নায়ু মাংসপেশীর মধ্যে একটা টানাটানির ব্যাপার উপস্থিত হইল। সে সময় দেহে নানা প্রকারের দশা হয়। নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইতে থাকে। নাসা বঙ্কিম, দন্ত বহির্গত, গলদেশে ঘর্ঘর শব্দ; দেহপুরে ইন্দ্রিয়গ্রামে তখন একটা বিষম বিপ্লব ঘটে; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত বিরহিণী বিধবা কামিনীগণের ন্যায় যেন কাঁদিয়া উঠে। পরিশেষে গুটি তিনেক খাবি খাইয়া বিদায় লইলাম।"

"মৃত্যুর পর কি নীরব নিস্তব্ধ ভাব! এত যে আড়ম্বর ভয় চিন্তা বাসনা ব্যস্ততা, একটী নিশ্বাসে সমস্ত স্থির শান্ত হইয়া গেল। বিশাল তরঙ্গান্দোলিত

মহাসমুদ্রবক্ষ সহসা যেন অনন্ত প্রসুপ্তির কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। পৃথিবীর কার্য্যকোলাহল, লোকের জনতা পূর্ব্বেও যেমন পরেও তেমনি, কিন্তু আমি আর তাহাতে নাই। জীবনের কার্য্যব্যস্ততা দেখিলে কখন মনে হইত না যে কোন কালে ইহার শেষ হইবে। মৃত্যু এক নিমেষের মধ্যে একবারে তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত করিয়া দিয়া গেল। যবনিকা পতন, ইহলোকে আর তাহা উঠিবে না। মহাবেগে যাইতেছিল যে জীবনরথ, তাহার গতি-রোধ হইল।"

"বহু কষ্টে বিদায় গ্রহণ করিয়া তার পর এক বার পশ্চাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। মৃতদেহের দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হইল। আহা! কত কাল তাহার সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছি, দেহ আমার ছিন্নমূল লতিকার ন্যায়, বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় নিমেষে নিমেষে মলিন হইতে লাগিল। তাহাকে শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডের মত ধরায় পতিত দেখিয়া বলিলাম, 'হে আমার পাঞ্চভৌতিক তনু, তুমি এখন ভস্মের সহিত মিশিয়া যাও। আর এখন তোমায় কেহই আদর করিবে না। বরং শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে তুমি চক্ষের অন্তরাল হও, একবারে আকাশে বিলীন হইয়া যাও, তাহারই জন্য বন্ধুগণ ব্যগ্র হইবে। আহা তোমার জন্য আগে কত ভাবনা, কত ভয়ই হইত! তোমাকে কেহ হতাদর করিলে কি মর্ম্মান্তিক ক্লেশই অনুভব করিতাম! গায়ে মাছিটী বসিতে পাইত না। তোমার একটু নিন্দা প্রাণে সহিত না। হা অন্নচিন্তা! এক মুষ্টি অন্নের জন্য রে শরীর, কতই লাঞ্ছনা গঞ্জনা তোকে সহিতে হই-য়াছে! আর কে তোমাকে এখন আদর করিয়া খাওয়াবে পরাবে! জন্মের মত তোমার সকল সাধ মিটিয়া গেল; তৎসঙ্গে সমস্ত অহঙ্কার দর্প চূর্ণ হইল, মান মর্য্যাদা ফুরাইয়া গেল। আহা! ঐ দেখ দেখ! পূতিগন্ধ-প্রযুক্ত দূরে দাঁড়াইয়া নাকে কাপড় দিয়া এখন সকলে তোমাকে দেখিতেছে! আত্মীয়েরা এক চক্ষে কাঁদিতেছে, আর এক চক্ষে বলিতেছে, "শীঘ্র শীঘ্র লইয়া যাও! বিলম্বে বাসি মড়া হইবে।" প্রথমে যেমন আদর যত্ন, শেষ তেমনি লাঞ্ছনা বিড়ম্বনা। ভ্রাতঃ তোমাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়াছি, সে জন্য আর কিছু মনে করিও না। রোগে অনাহারে, অতিভোজনে, আলস্যে পরিশ্রমে, নিদ্রা জাগরণে, অব্যবহারে অতিব্যবহারে তোমার উপর কতই অত্যাচার করিয়াছি। তুমিও আমাকে অনেক প্রকারে জ্বালা-ইয়াছ। তোমারই ক্ষুধা এবং ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির উত্তেজনা নিবারণের জন্য

প্রাণবল্লভ শ্রীহরিকে কত সময় ভুলিয়া যাইতাম। তোমার অনুরোধে ধর্ম্মাধর্ম্ম সত্যাসত্য মান অপমান বিচার করি নাই। যা হউক, এখন তুমিও বাঁচিলে, আমিও বাঁচিলাম। সখে! এখন বিদায় গ্রহণ করি, প্রণাম হই। তুমি আমার ভগবানের শ্রীমন্দির, শ্রীহরির লীলাভবন, তোমার চরণে বার বার নমস্কার।"

[চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।]

পরকাল।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

আত্মারামের পরলোকবাস ইহলোকেই আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি বার্দ্ধক্যের চরমসীমায় যখন উপনীত হন সেই সময় হইতে দেহজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া অনেক সময় কেবল আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থান করিতেন, এবং আপনাকে পরলোকগত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্য মৃত্যু তাঁহার পক্ষে একটা স্বাভাবিক কষ্টের ব্যাপার হইলেও ভয় কিম্বা বিষাদের কারণ হয় নাই। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, "মৃত্যুর প্রাক্‌কাল নিদ্রার পূর্ব্ব সময়ের মত অতীব শান্তিপ্রদ। ভয়ানক ক্লেশ যন্ত্রণার পর যেন চিরবিশ্রান্তি সম্ভোগ।" সেই অবসন্নতা এবং সাম্যাবস্থার ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে তিনি পরলোকে গমন করেন। ক্ষণ কাল মহানিদ্রা, তদনন্তর নবজীবনের অভ্যুদয়। শেষ সময়ে যত ক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান চৈতন্য ছিল, তত ক্ষণ আত্মবিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরম চৈতন্যের যোগেতে তিনি সমাধিনিমগ্ন ছিলেন। মৃত্যুর পরের বিবরণ এই রূপ বর্ণিত আছে;—

"দেহগেহ হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক মহা ঝড় তুফানের ভিতর হাবুডুবু খাইতে খাইতে যথাসময়ে ভবসাগরের পরপারে আসিয়া পৌঁছিলাম। দেহের পঞ্চ ভূত ভৌতিক জগতে পড়িয়া রহিল, অমরাত্মা অমরধামে প্রবেশের জন্য পরলোকের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল।"

"যে দেশের কথা বলিবার জন্য এখন আমি প্রস্তুত হইতেছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ এবং বড় বড় বিখ্যাত অনেকানেক মহাত্মা তথায় আসিয়াছেন এই কেবল জানি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেখান হইতে একটী লোকও ফিরিয়া আসে নাই, কেহ কিছু লিখিয়াও পাঠায় নাই; সুতরাং আমার লিখিত বৃত্তান্তই সে সম্বন্ধে প্রথম বলিতে হইবে। কিন্তু পৃথিবীর লোকদিগকে এই অভিনব অদ্ভুত রাজ্যের বিবরণ সাকার ভাষায় বিনা উপমায়

কিরূপে বুঝাইব তাহাই এখন আমি ভাবিতেছি। কোন রূপ উপমাই এখানে খাটে না; দেশ কালের সঙ্গে ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। সহজবিশ্বাসে দিব্যজ্ঞানে এ সমস্ত যিনি বুঝিবার চেষ্টা করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন; তদ্ভিন্ন অনেকের নিকট ইহা কল্পিত কাহিনী গাঁজাখোরী গল্প বলিয়া ধোকা লাগিতে পারে। সহজজ্ঞানমূলক বিশ্বাস ভিন্ন আমার কথার অন্য প্রমাণ নাই। যাহা কিছু আছে, সে কেবল আমিই জানি। মর্ত্ত্যজীবনের অভ্যাসদোষে যদি কোন্ স্থলে সাকার উপমা কিম্বা রূপক বর্ণনা প্রকাশিত হয়, তবে তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ যেন সকলে গ্রহণ করেন।"

"ভবসমুদ্রের দক্ষিণ পারে এই পরলোকরাজ্য অবশ্য সকলেই অবগত আছেন। প্রতি দিন এখানে বহু সংখ্যক নর নারী আগমন করিয়া থাকে। ভববাসীরা মৃত্যু আর শ্মশান কেবল দেখে, পরলোক কেহ দেখিতে পায় না; অথচ ইহা এত নিকটে, যে এক নিমেষে আসা যায়। অতি স্বচ্ছ, অথচ স্থূল আবরণে ঢাকা। না মরিলে আর কেহ এ রাজ্যের কোন একটী বিষয় জানিতে পারে না। জীবদ্দশায় এখানকার কতকটা ভাব জানিয়া রাখিতে পারিলে একটু সুবিধা হইবে, নতুবা হঠাৎ অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে আগমন সাধারণতঃ বড় কষ্টকর। এই জন্য প্রিয়তম পাঠকদিগকে তাহার কিছু কিছু পূর্ব্বাভাস আমি প্রদান করিতেছি। কিন্তু জড়মতি স্থূলবুদ্ধি দেহী জীবদিগের পক্ষে ইহা কত দূর বোধগম্য হইবে তদ্বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। কেবল আত্মতত্ত্বদর্শী অমরত্বে-বিশ্বাসী সূক্ষ্ম জ্ঞানী যাঁহারা, দেহের অতীত, মৃত্যুর অতীত অন্য রাজ্যের অস্তিত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন, কেবল তাঁহারাই আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই, এখানে আসিলেই আমার কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।"

"ভয়ানক ঝঞ্ঝাবাত, মেঘগর্জ্জন, অশনিনাদের ভিতর ঘুমাইতে ঘুমাইতে পরপারে আসিয়া যখন উঠিলাম, তখন ঈষৎ চৈতন্যের উদয় হইল; কিন্তু বড় ঘোর ঘোর। সমস্তই নূতন ব্যাপার, সঙ্গে একটী জনপ্রাণী নাই, কেমন এক রকম যেন ফাঁক ফাঁক বোধ হইতে লাগিল। আমি যেন সুপ্তোত্থিত, দিশাহারা নিশাগ্রস্ত এক ভ্রান্ত পথিক। ক্রমে দেখি যে সেই ঘনতমসাচ্ছন্ন আকাশের গভীর কালীমা অল্পে অল্পে একটু শ্বেতাভ

হইয়া উঠিয়াছে। তদনন্তর উহা ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করিল। আমার প্রজ্ঞাও সেই সঙ্গে অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সে জ্যোতি অতি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতি। ভাবিলাম, ইহা বোধ হয়, অমরগণের পবিত্র জীবনের জ্যোতি। জিজ্ঞাসা করিবারও একটী লোক পাই না, কাহারো সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও নাই। নূতন রাজ্য, নূতন দেশ, নূতন আলোক, নূতন জীবন, পুরাতনের সঙ্গে কিছুই মিলে না; পুরাতন পরিচিতের মধ্যে কেবল সেই আমার আমিত্ব, যে বরাবর ঠিক আছে। অন্তঃকরণে যত কিছু আশ্চর্য্য বিস্ময়রস উদয় হইতে লাগিল, অনন্ত ঔৎসুক্যের সহিত তাহা আমি একাই সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। অপরিচিত স্থানে আসিলে প্রথমে যে দশা হয়, আমার তাহাই হইল।"

"পরলোক দেখিবার সাধ আমার অনেক কালের। এখানে আসিয়া বড় বড় মহাত্মাদের সঙ্গে দেখা করিব, আপনার আত্মীয় অন্তরঙ্গদিগের সহিত মিশিব, পাপীর দণ্ড, সাধুর পুরস্কার কিরূপ হয় দেখিব, স্বর্গলোকে শান্তিধামে দেবতাদের সভায় উপস্থিত হইয়া স্বর্গীয় সঙ্গীত, বক্তৃতা শুনিব; এবম্বিধ নানা প্রকার আশা এবং কল্পনায় আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। হায় রে ভ্রান্ত জীব! এ কি তুমি কলিকাতা সহর বেড়াইতে আসিয়াছ যে অমনি এক খানা ঠিকা গাড়ীতে চড়িলে, আর কোথায় বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশব সেন, দেবেন্দ্র ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল; কোথায় যাদুঘর, কেল্লা, কোম্পানীর বাগান রাতারাতি সব দেখিয়া শেষ করিয়া ফেলিবে? সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে এ সকল আশা যেমন দুরাশা, আমার পক্ষে পরলোকে আসিয়া একবারে হঠাৎ ঐ সমস্ত দেখা শুনা, ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে ভ্রমণ এবং অমরগণসঙ্গে আলাপ করা তেমনি। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, নিতান্ত অপরিচিত দেশ হইলেও কোন রূপ ভয় কিম্বা উদ্বেগ অনুভব করিলাম না। বরং আধ্যাত্মিক প্রতিভাশক্তি, জ্ঞান বিশ্বাস আশা, নিত্যানন্দস্পৃহা ক্রমে বেশ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। যাঁহার রাজ্য তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস নির্ভর থাকিলে কেনই বা ভয় হইবে? স্থানমাহাত্ম্যেই হউক, কিম্বা প্রভুর দুর্লক্ষ্য কৃপাবলেই হউক, প্রথমেই আমি এই রূপে নিত্যশান্তির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাস্বাদ প্রাপ্ত হইলাম। চিত্ত নির্ব্বিকার নির্ব্বাসনা হইলে যে অপূর্ব্ব আনন্দ হয়, ইহা তাহারই আভাস।"

"পরলোক রাজ্য অতি বৃহৎ রাজ্য। তোমাদের ভবধাম অপেক্ষা

বহু সহস্র গুণ লোক এখানে বাস করে। এ পর্য্যন্ত ইহার সীমানির্দ্ধারণ, লোকসংখ্যা গণনা, কিম্বা মানচিত্র প্রস্তুত হয় নাই। কোন রূপ ইতর প্রাণী,—জীব জন্তু কীট পতঙ্গ মশা মাছি ছারপোকা পিপীলিকা সরীসৃপ এখানে নাই। দেহসর্ব্বস্ব অনাত্ম মনুষ্যও এখানে আসিতে পারে না। কেবল অমরাত্মাগণের বসতি। এখানে চন্দ্র সূর্য্য নাই, রাত্রি দিনও নাই; শীত গ্রীষ্ম শরৎ বর্ষা, আলোক অন্ধকার কিছুই নাই। দেখিবার শুনিবার ইন্দ্রিয়-গোচর কোন সামগ্রীই নাই। আসিলেই সকলে টের পাবেন। তবে আছে কি? আছে যাহা সার;—জ্ঞান, ইচ্ছা, আর ভাব। পূর্ব্বে চক্ষুবাতায়নের ভিতর দিয়া বাহ্যালোকের সাহায্যে আকাশ ভেদ করিয়া বাহ্য পদার্থের জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইত; কর্ণের ছিদ্র, গাত্রের চর্ম্ম, রসনা এবং নাসিকা ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তিত্বের সহায়তা লইতে হইত, এখন জ্ঞানের রাজ্যেই বাস। নিজেই জ্ঞান। ইচ্ছার স্রোতেই বিচরণ। মহাভাব এবং মহা-জ্ঞানসমুদ্র চারি দিকে বর্ত্তমান। তাহাতে ডুব দাও, সাঁতার খেল, যাহা ইচ্ছা তাই কর। তোমরা টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁযোগে দূরস্থিত ব্যক্তির সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া আনন্দিত হও, এখানে তাহা অপেক্ষা আরো সুবিধা; কোন ব্যবধান নাই। আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমুদয় যথাকালে প্রস্ফুটিত হইয়া অধ্যাত্ম রাজ্যের রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি সমস্ত অব্যবধানে অনুভব করে। অর্থাৎ স্বয়ং জ্ঞানময়ের দিব্যজ্ঞানালোকে অদৃশ্য গূঢ় তত্ত্ব সকল আত্মজ্ঞানে সহজে প্রকাশ পায়। অবশ্য এখানেও অধিকারভেদ এবং উত্তরোত্তর শ্রেণী-পরম্পরা বিভিন্ন লোক আছে। এবং উন্নতির ক্রম বিকাশ আছে।"

"আমার আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলি যখন কিঞ্চিৎ উন্মেষিত হইল, তখন সহসা এক অতি সুন্দর মধুর আঘ্রাণে প্রাণ উন্মাদ হইয়া উঠিল। অনির্ব্বচনীয় দেশের অনির্ব্বচনীয় সুগন্ধ। তোমাদের দেশের কোন্ ফুলের সঙ্গে ইহার তুলনা করিব? যুঁই চামেলী গোলাপ চম্পক বেল মল্লিকা গন্ধরাজ একসঙ্গে মিশিলে যা হয় তাই। আমি ভাবিলাম, ইহা অমরপুরবাসী দেবাত্মা ভক্তগণের শ্রীঅঙ্গের আঘ্রাণ ভিন্ন অন্য আর কিছু নয়। এই আঘ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে এক অভূতপূর্ব্ব সুধাময় সঙ্গীতরব অন্তরে প্রবেশ করিল। আহা! সে কি সুললিত মধুর সঙ্গীত! শ্রবণে আত্মার অন্তস্তল পর্য্যন্ত অমৃত রসে পরিষিক্ত হইয়া যায়। যেমন গীত তেমনি বাদ্য। আমার হৃদয় তাহাতে মাতিয়া উঠিল। জ্ঞান হইল, স্বয়ং দেবী বীণাপাণি সরস্বতী দেবতাদিগকে স্বর্গীয় সঙ্গীত-

সুধা পান করাইতেছেন। ইহা তাল মান লয়বিশিষ্ট সঙ্গীত কেবল নয়, তদ্বারা অবিশ্রান্ত বেগে অভিনব তত্ত্বসুধা ক্ষরিত হইতেছিল। এই মধুর আঘ্রাণে এবং সুললিত তানে বিমোহিতচিত্ত হইয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখি যে এক রমণীয় সুগম্ভীর দৃশ্য। যেন তুষার সদৃশ শ্বেত সৌধমালা দিগন্ত ব্যাপিয়া উচ্চ গগনতল স্পর্শ করত শোভা পাইতেছে। তাহার মাঝে মাঝে নীল পীত লোহিত বর্ণের বিচিত্র আলোকময় মণি মুক্তা রত্নরাজী জ্বলিতেছিল। অকস্মাৎ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি পুলকিত এবং স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।"

"তখন ব্যাকুল চিত্ত আরো ব্যাকুল হইল। ভাবিলাম, যদি এক জন কাহাকেও নিকটে পাই,তাহার সঙ্গে আন্তরিক ভাবের বিনিময় করি,এবং এ সকল বিষয়ে কিছু কিছু জানিয়া লই। আপনাকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সে আমোদ সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। এমন সময় হঠাৎ মৃদু মধু স্বরে কে বলিয়া উঠিল, "ঐ যে পুরোভাগে অপূর্ব্ব মনোহর দৃশ্য দেখিতেছ, উহাই অমরধাম।" আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়া সচকিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে মহাশয়?" তিনি বলিলেন, "আমি বাণী"। [প্র] তাহাত বুঝিলাম, কিন্তু আপনার নামটী কি? নিবাস কোথায়? [উ] এখানে ও সকল পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে নাই। আমি মহাকাশমধ্যে কেবল বাণী মাত্র।"

"নূতন দেশের নূতন কথা শুনিয়া আমি কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। পরে মনে মনে বুঝিলাম, এখানে পৃথিবীর ভদ্রতা সভ্যতা সৌজন্য চলিবে না, স্থানীয় রীতি পদ্ধতি গুল একটু শিখিয়া লইতে হইবে। অতঃপর স্থির করিলাম, বাণী মহাশয় যাহা বলেন, তাই এখন শুনিয়া যাই। ভাগ্যে পাসের কথা, বেতনের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই! তাহা হইলে বোধ হয় উনি আমাকে নিতান্তই বর্ব্বর মনে করিতেন। শেষ মিতবাক্ হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা বাণী মহাশয়, ঐ যে অমরধাম দেখা যাইতেছে, ও এখান হইতে কত দূর?" [উ] অনেক দূর! যত দূর আসিয়াছ, তাহা অপেক্ষা আরো অনেক দূরে।" পল্লীগ্রামের অর্দ্ধ সভ্য লোকেরা যেমন কলিকাতায় প্রথম আসিয়া অথবা শিশু যেমন পিতার নিকট এটা কি, ওটা কি, কেন:এটা এমন হইল? ইত্যাদি প্রশ্ন বার বার জিজ্ঞাসা করে, বাণীকে কাছে পাইয়া ঠিক তেমনি ভাবে সব কথা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে আমার ইচ্ছা হইল। [প্রশ্ন] আচ্ছা, এখান হইতে কি পৃথিবী বহু দূরে নয়? [উ] না, খুব কাছে, মাঝে কেবল একটা সমুদ্র

ব্যবধান। পাছের দিকে চেয়ে দেখ না, এখনই সব দেখতে শুনতে পাবে। পশ্চাতের দিকে চাহিয়া বুঝিলাম, ঠিক কথাই বটে। বেশী দূরত আসি নাই! [প্রশ্ন] আচ্ছা বাণী বাবু! না, না, শ্রীবিষ্ণু! বাণী মহাশয়, পৃথিবীর সঙ্গে কি এখন আর আমার গতিবিধি চলিতে পারে না? [উ] না, গতিবিধির কোন পন্থা নাই। আমরা কেবল এখান হইতে উহাদিগকে দেখিতে পাই মাত্র, কিছু করিতে পারি না।"

"নূতন কথা শুনিয়া আমিত হতভম্বা হইয়া রহিলাম। যত কিছু দেখি শুনি, ততই কৌতূহলমদে প্রাণ যেন মাতিয়া উঠে। শেষ স্থির করিলাম, এখানে বেশী কথা কহা উচিত নয়, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিব, বিদ্যা বাহির হইয়া পড়িবে, কাজ নাই, চুপ করিয়া থাকাই ভাল। বুঝা অপেক্ষা এখানে বিশ্বাস করিলে অনেক জ্ঞান লাভ হয়। একা থাকার যে একটা ভয় এবং অভাব ছিল বাণীর প্রসাদে তাহা কতক পরিমাণে দূর হইয়া গেল। তিনি আশা দিয়া বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিব। বিশ্বাসে আমার সব কথা বুঝিয়া লইবে, পুরাতন জ্ঞান সংস্কারের অধীন হইয়া যুক্তি তর্ক করিও না, আমার কথা অভ্রান্ত।" বাণীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া এবং সাত পাঁচ ভাবিয়া পরিশেষে আপনাতে আপনি বিশ্রামার্থ আমি শয়ন করিলাম। কেবল আপনাকে লইয়া থাকা ইহা একটা বড় নূতন এবং আশ্চর্য্য ব্যাপার। অনন্তর নিজ অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক নিস্পন্দ ভাবে এই সঙ্গীতটী গাইতে লাগিলাম ;—

"কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিনু হায়! সীমা অন্ত রেখা, নাহি যায় দেখা, সিন্ধুতে বিন্দু মিলায়।

অনন্তের টানে, অনন্তের পানে, ধায় প্রাণনদী বাধা নাহি মানে, বাঁধা আছি যাঁর সনে প্রাণে প্রাণে, তাঁহারেই প্রাণ চায়।

সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তার, নিবিড় নিস্তব্ধ নীরব আঁধার, তার মাঝে জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার চমকে চপলা প্রায় ; কেহ নাই হেথা তুমি আর আমি, অনন্ত বিজনে হে অনন্তস্বামী; কোথায় রাখিব, বল কি করিব, লইয়া আমি তোমায়।

কাঁপাইয়া মহানাদে যোগধাম, "আমি আছি" রব উঠে অবিরাম, "তুমি আছ" "তুমি আছ" প্রাণারাম, আত্মারাম দেয় সায়।"

[মিশ্র আলেয়া—একতালা]

দ্বিতীয় অধ্যায়।

"পর দিন জাগ্রত হইয়া পুনরায় ইতস্ততঃ চিন্তা করিতে লাগিলাম। এখানে সূর্য্য নাই, সুতরাং সূর্য্যের উদয়াস্ত অনুসারে দিন গণনা হয় না। চিন্তা আর নিশ্চিন্ততা, জ্ঞানযোগ আর নির্ব্বাণ; ইহারই দ্বারা অবস্থাকে বিভাগ করা হইয়া থাকে। যদিও এখন আমি সেই পুরাতন আমিই আছি, কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ নূতন; জীবনও নূতন। এত দিন কি যেন একটা প্রকাণ্ড বোঝা ঘাড়ে চাপিয়া ছিল, এখন আর সেটা নাই। যেন উচ্চতর আকাশে লঘুতর সূক্ষ্ম বায়ুমণ্ডলে আমি স্বচ্ছ আকাশবৎ হইয়া গিয়াছি। শরীর লইয়াই কি না যত কিছু ভাবনা চিন্তা ব্যস্ততা, তাহা যখন খসিয়া পড়িয়াছে তখন আর কিসের ভাবনা? দেহের জন্য পূর্ব্বে কতই না ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত! আজ সর্দ্দি মাথাধরা, কাল পেট গরম; কখন ক্ষুধায় কাতর, কখন অজীর্ণবশতঃ উদরাময়; কখন গ্রীষ্মে ছটফটানি, কখন শীতে কম্পিত; কখন মশা মাছি ছারপোকার জ্বালায় অস্থির, চক্ষে নিদ্রা নাই, কখন বা দুর্ব্বলতা আলস্য বশতঃ বিছানা হইতে উঠিতে ইচ্ছা করে না। কিসে স্বাস্থ্য রক্ষা হইবে, কেমনে অন্ন সংগ্রহ করিব; আজ ধোপায় কাপড় দিলে না, কাল নাপিত কামাইতে আসিল না; ডাক্তার, ঔষধ, পথ্য, হাওয়াপরিবর্ত্তন; কম কি ঝঞ্চট? তাই কি একটা শরীরের ভাবনা? যে রোগে নিজে সর্ব্বদা অস্থির কাতর, আত্মীয় পরিবার সকলেরই সেই রোগ। একটা ছেলে মানুষ হইতে না হইতে গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে এসে হাজির। জন্মেও ভাবনা, জীবনেও ভাবনা, মৃত্যুতেও ভাবনা; রোগ শোক কিছুতেই আর নিস্তার নাই। এ সকল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া গাটা বড়ই খোলসা খোলসা বোধ হইতে লাগিল। খাই না খাই সুখে আছি। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। স্বাস্থ্যও নাই, রোগও নাই। প্রাতে উঠিয়া কি খাব, কি পরিব, কোথা যাব, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল এই চিন্তা ছিল; এখন আহার বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে অন্নচিন্তা দূর হইল। আত্মা বিদেহ, তাহার কাপড়ের দরকার নাই, সুতরাং দর্জ্জি কিম্বা ধোপারও প্রয়োজন নাই। দেহ ত্যাগের সঙ্গে সমস্ত বাহ্য কার্য্য ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন তবে কি করি? সময় কাটাই কি রূপে? অবিশ্রান্ত কেবল অনন্ত জ্ঞানরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াও, আর ধ্যান চিন্তা কর। নির্ব্বিঘ্নে উপাসনা করিবার পক্ষে এ অবস্থাটা কিন্তু বড়ই অনুকূল। কেহ ডাকেও না, ব্যাঘাতও

করে না ; আর ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া যে অন্য কোথাও যাইব তাহারও প্রয়োজন নাই। বিবিধ কর্ম্ম কাজে ব্যস্ত থাকিয়া দিনটা কাটাইয়া দিব, তার পর রাত্রিটা ঘুমাইয়া কাটাইব, মাঝে মাঝে একটু ভজন সাধন ধ্যান চিন্তা অধ্যয়ন ; সেরূপ ব্যবস্থা এ অবস্থায় আর সম্ভবে না। উত্তর কেন্দ্রে ছয় মাস ক্রমাগত রাত্রির পর দিন দেখিয়াছিলাম, এখানে বার মাসই সমান ; দিনও নাই রাত্রিও নাই। কিন্তু অসারই হউক, আর যাই হউক, একটা কোন কাজের দায়িত্ব স্কন্ধে চাপিয়া না থাকিলে কিন্তু দিন চলে না। অনন্ত কালে অসীম রাজ্যে বাস, অফুরন্ত জীবন ; কোথাও একটা কমা নাই, ছেদ নাই। পাঠক মহাশয়দের প্রাণ বোধ হয় এ সব কথা শুনিয়া হাঁপ হাঁপ করিতেছে। কিন্তু কোন ভয় নাই, প্রথম প্রথম যা কিছু কষ্ট, তার পর অবস্থায় পড়িলে সব ঠিক হইয়া যাইবে।”

“দেহহীন, কর্ম্মহীন নিঃসঙ্গ নিরাকার হইয়া একাকী থাকিতে প্রথমে কিছু দিন বড় কষ্ট বোধ হইত। পুরাতন অভ্যাসের সমস্ত কাজই বন্ধ, তৎ পরিবর্ত্তে এখন নূতন অভ্যাসের প্রয়োজন। সঙ্গীর মধ্যে কেবল এক বাণী, তাঁহার সঙ্গে আরত সব বিষয়ে আলাপ চলে না, ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়। কাজের মধ্যে পুরাতন অভ্যস্থ এক কাজ উপাসনা ধ্যান চিন্তা ; তাহাই বা কত ক্ষণ করা যায় ? ইতঃপূর্ব্বে হয়ত দিনের মধ্যে দুই-এক ঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে সহবাস করিয়াছি ; তাও কি সমস্ত সময় ইষ্টদেবের ঠিক অভিমুখীন হইয়া তাঁহার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টিকে মিলাইয়া চোখোচোখী মুখোমুখী করিয়া থাকিতে পারিতাম ? মুখে বলিয়াছি তাঁহার স্তব স্তুতি গাথা বন্দনা, অন্তরে ভাবিয়াছি সংসারের কত কি বিষয়। নিত্য কর্ত্তব্যের প্রণালীবদ্ধ কার্য্যগুলি অভ্যাসে নিষ্পন্ন হইয়া যাইত, আত্মার সহিত পরমাত্মার যেমন ঘেঁসি মেশামিশি দীর্ঘ সহবাস তেমন গাঢ় হইত না ; তার পর অনেক সময় বাহিরের কার্য্যে এবং নিদ্রায় চলিয়া যাইত। এ বিষয়ে এখন বড়ই পরীক্ষায় পড়িলাম। পূর্ব্বে যে কর্ম্ম কাজ করিতাম, এখানে আসিয়া বুঝিতে পারিলাম, সেত কর্ম্মযোগ নয়, এক প্রকার কর্ম্মভোগ বা কর্ম্মবন্ধন। ঠাকুরের নামে কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়া প্রবৃত্তির কর্ত্তৃত্বে সংসারচক্রে যন্ত্রবৎ ঘুরিয়া বেড়াইতাম ; সেখানে গুরু শিষ্যে দেখা শুনা অতি অল্পই। এখন হয় একা চুপ করিয়া বসিয়া থাক, না হয় অনন্ত পরম পুরুষের ধ্যানে মগ্ন হও ; কিম্বা বাণীর সঙ্গে নির্জ্জনে আলাপ কর।”

"পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিলাম, যখন কোন দিকে যাইবার আর উপায় নাই, তখন বাণীর সঙ্গে বসিয়া গল্প করা যাক্। আর অভীষ্টদেবকে মাঝে মাঝে চাহিয়া চাহিয়া দেখি। কিন্তু সে কি আর সহজ কথা? বাণী আরত আমার ইয়ার নহেন যে তাঁর সঙ্গে যখন তখন যে সে বিষয় লইয়া গল্প করিব। তিনি গুরু গম্ভীর স্বভাব, কেবল বিধি নিষেধ বলিয়া দেন; পথহারা হইলে ঠিক পথ দেখাইয়া দেন। কেবল ভগবানের সম্মুখেই বা কত ক্ষণ স্থির হইয়া থাকা যায়? চঞ্চল মতি বালকাত্মা গুরু গম্ভীর স্বভাব গুরুজনের কাছে কি সর্ব্বদা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? তার খেলার সঙ্গী চাই, আমোদ চাই। দীর্ঘকাল সুতীক্ষ্ণ ব্রহ্মতেজ ধারণ করা কঠোর সাধন সাপেক্ষ। এক্ষণে কর্ম্মফলভোগ আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব জীবনের যে কিছু আসক্তি বাসনার রস ছিল তাহা অনাবৃত জ্বলন্ত দেবজ্যোতিতে শুকাইতে লাগিল।"

"পৃথিবীতে অবস্থান কালে হায়! এমন সুযোগ কত সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন কোন কার্য্য বা ভাবনা চিন্তা কিছুই থাকিত না; কিন্তু তাই বলিয়া কি ঐকান্তিক ভাবে বাণীর উপদেশ শুনিবার জন্য কিম্বা ভগবৎস্বরূপের ধ্যান ধারণা, তাঁহার সঙ্গে সহবাস এবং প্রেমালাপের জন্য পিপাসু হইতাম? দশটা হইতে পাঁচটা আফিস্ না করিলে বেতন বাদ যায়, জরিমানা হয়, কিন্তু ভজন সাধনে যে যত ফাঁকি দিতে পারে সে তত কাজের লোক। নির্জ্জনচিন্তা বা জপ তপ ধ্যানেরত অনেক সময়ই ছিল, তথাপি তাহাতে কি প্রাণ টানিত? বিধির কি অলঙ্ঘ্য বিধি। অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল যেমন ইহকালে, তেমনি পরকালে। অবসর থাকিলে কি হইবে? ফলতঃ পরমাত্মা প্রাণসখার সঙ্গে যাহার একটু নিগূঢ় প্রণয়, আন্তরিক ভালবাসার টান না হইয়াছে, তাহাকে পরকালে আসিয়া প্রথমে কিছু দিন বড়ই বিপদে পড়িতে হয়। আমি সে বিষয়ে বিলক্ষণ ভুক্তভোগী। যাহাদের আধ্যাত্মিক বিষয়ে একবারেই কোন সংস্কার বোধ নাই, না জানি তাহাদের দশায় কি ঘটিবে! আমি এক জন ব্যক্তি, কত কাল ধরিয়া আত্মতত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছি, আধ্যাত্মিক সাধন ভজন চিন্তা গবেষণায় জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছি, আমাকেও এখন যেন চারি দিক আঁধার দেখিতে হইল। জড়মতি বিষয়াসক্ত ভাই ভগিনী, তোমরা এ বিষয়ে সাবধান হইও। নতুবা বড় কষ্টে পড়িবে।"

"আমাকে এখন একা পাইয়া পুরাতন পার্থিব সংস্কার, মায়া, এবং ইন্দ্রিয়বাসনাগুল ভূত পেত্নীর মত যেন আশে পাশে উকি ঝুকি মারিতে লাগিল।

দেহত্যাগের সময় যেমন তাহার সঙ্গে টানাটানি করিতে হইয়াছিল, বাসনা ত্যাগসময়ে আমাকে এখন তেমনি ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কেবল ব্রহ্মসহবাস, ব্রহ্মচিন্তা, ব্রহ্মধ্যান, আর বাণীর উপদেশ শ্রবণ, ইহাতে আর যেন জীবন কাটে না; আরো কিছু যেন অভাব বোধ হয়। পৃথিবী হইতে আসিবার সময় সেখানে যেন ভুলিয়া কি ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহার জন্য প্রাণে বড় টান ধরিল। সে যেম মরণটান। অহিফেন কিম্বা সুরাপায়ীর মৌতাতের টান, শেষ টান। এমনি সে টান, যেন একবারে আমাকে পৃথিবীর দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। পূর্ব্বে যদি জড় লইয়া এত ঘাঁটা-ঘাঁটি না করিতাম, মায়িক সংসারের অসার সৌন্দর্য্য প্রলোভনে না মজিতাম, তাহা হইলে এ সময় বড় সুবিধা হইত। কি করি, নিরুপায় হইয়া শেষ গভীর আত্মসংযম আরম্ভ করিলাম। ভূতগুল বড়ই উৎপাত করিতে লাগিল। ভূতের দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছি, তথাপি ভূত পাছু ছাড়ে না কেন? এ কি বিপদ! তাহারা হাসিয়া বলে, "এত কালের প্রণয়, যাবে কোথা? তোমার কি একটুও মায়া দয়া নাই? এখানে একলাটী কেবলাত্মা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছ, আহা! এক জনও কেহ কাছে নাই। আমরা তোমার পুরাতন বন্ধু, তাই সংবাদ লইতে আসিয়াছি। হায় কি কষ্ট! কেঁদ না, কেঁদ না, চুপ কর।" এই রূপে কেহ ভালবাসা দেখায়, কেহ ঠাট্টা করে, কেহ ভ্যাংচায়, কেহ বা হাসে। এক জন বলিল (তাহার নাম কল্পনা) "তুমি যদিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু আমরা তোমাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তুমি ধর্ম্ম ছাড়িয়াছ বলিয়া কি আমরা ধর্ম্ম ছাড়িব? হায় তোমা ভিন্ন আমাদের যে আর কেহই নাই।" বাস্তবিক তাহাদের সঙ্গে এক সময়ে গাঢ় প্রণয়ে আসক্ত ছিলাম, এখন গম্ভীর ভাবে সাধুতা দেখাইলে তাহারা কি ছাড়িবে? না ভয়ে ভক্তি করিবে? আমি নিতান্ত কাতর হইয়া তখন অনেক মিনতি করিলাম, কাঁদিলাম, তথাপি তাহারা ছাড়িল না। আমাকে লইয়া যেন নকড়া ছকড়া করিতে লাগিল। ঘোর দুঃখে পতিত হইয়া তখন পৃথিবীর ভাই ভগিনীদের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম, যদি ফিরিয়া যাইবার সুবিধা থাকিত, এক বার গিয়া তাহাদিগকে গোটা দুই কথা বলিয়া আসিতাম, যে ভাইরে! তোমরা জড়ভূতের মায়ায় অভিভূত হইয়া আর থাকিও না। যাহার যত বেশী বাহ্যাকর্ষণ, এবং বহির্মুখ গতি, এখানে আসিয়া তাহাকে কর্ম্মফল তত পরিমাণে ভোগ করিতে হয়।"

"এই অবস্থাটিকে আমার পক্ষে এক রকম শেষপ্রায়শ্চিত্ত বলিতে হইবে। অহো! কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা। সে অশান্তি কেবল নিজেই অনুভব করা যায়, কাহাকেও বলিয়া বুঝান যায় না। দুঃখে আকুল হইয়া এক এক বার ইচ্ছা হইতে লাগিল, ইহা অপেক্ষা সংসারে যে আমি ছিলাম ভাল! হায় যোগের জমাট ভিন্ন পরকালে জীবন ধারণ কি কষ্টকর! শোক দুঃখ পরিতাপ অনুশোচনার শেষসীমায় পৌঁছিয়া যখন আমি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলাম তখন সহসা "মাভৈর্মাভৈঃ" রব কর্ণে প্রবেশ করিল। বাণী মধুর বচনে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আশ্বস্ত হও, অচিরে চিরশান্তি লাভ করিবে!" তখন ভক্ত্যবনত হৃদয়ে, সকৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলাম, "দেব, আমাকে অনুমতি করুন, আমি এক বার পৃথিবীর ভাই ভগ্নীদিগকে সাবধান হইতে বলিয়া আসি। আহা! এমন যন্ত্রণা যেন শত্রুরও না হয়।" বাণী বলিলেন, "তোমার সেখানে কষ্ট পাইয়া যাইতে হইবে না; তাদের যদি শুনিবার ইচ্ছা হয়, সাবধান করিয়া দিবার অনেক লোক আছে। বড় বড় যোগী মহাপুরুষেরা বার বার সে কথা বলিয়া আসিয়াছেন। যাহারা শুনিবার তাহারা শুনিয়াছে। অবশিষ্টেরা এখানে আসিলে সব বুঝিতে পারিবে; কর্ম্মফল অপরিহার্য্য।"

"আমি বলিলাম, "মহাশয়! আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এই বিপদ সময় দেখা দিলেন, তবে এক্ষণে বলুন, আমি কি করিব। বড়ই কষ্ট পাইতেছি।"

বাণী। তুমি এখন পূর্ব্বসংস্কার ধৌত করিয়া নবজীবন লাভের জন্য একান্ত মনে ঠাকুরকে ডাক।

আমি। যাদের ফেলিয়া আসিয়াছি, সে সকলের চিন্তা কল্পনা কেন আবার আসিল? বস্তু নাই, অথচ তাহার ছায়া আছে, এ কি রূপ?

বাণী। ইহাকেই বলে কর্ম্মফল অথবা পাপের দণ্ড। বস্তুতঃ ইহারা কোন কালেই বস্তু ছিল না, তোমার বাসনা পিপাসা কল্পনাই তাহাদের মা বাপ।

আমি। এখন ইহা যায় কি প্রকারে বলুন দেখি!

বাণী। যাইবার সুবিধা হইয়াছে। স্ত্রী মরিলে যেমন শ্বশুরবাড়ীর সম্বন্ধ ফুরাইয়া যায়, তেমনি দেহ যখন তোমার বিনষ্ট হইয়াছে, তখন অচিরে এ সমস্ত কামনা বাসনা আসক্তি কল্পনা আপনিই তিরোহিত হইবে। কেবল বল, দূর হ! দূর হ! দূর হ! ভয় কিম্বা মিত্রতায় উহারা সঙ্গ ছাড়িবে না,

তর্ক বিচার প্রবোধ প্রদানেও কিছু হইবে না; মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া এক বারে খুব জোরে ধমক দাও।

আমি। বেশ কথা। আমার আর ত এখন অন্য কোন কাজ নাই, কেবল বসিয়া বসিয়া ভূত তাড়াই।

বাণী। বেশী দিন তাড়াইতে হইবে না, শীঘ্রই উহারা সঙ্গ ছাড়িবে। যখন বাসা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন আর আসিয়া তাহারা দাঁড়াবে কোথা? অভ্যাস বশতঃ কিছু দিন যাতায়াত করিবে। ইচ্ছাবলকে খুব প্রবল করিয়া খুব জোরে ধমক দাও।

"বাণীর আশাবাক্যে সাহস বাড়িল, মনে আহ্লাদ হইল। তখন ভাবিলাম, এবার তবে সেই শান্তিধাম বোধ হয় দেখিতে পাইব। অতঃপর প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম, "এবার ভূত তাড়িয়ে তবে আর অন্য কাজ।" বাসা ভেঙ্গে গেল তবু আবার এখানে এসে উৎপাত? দাঁড়া এবার, একেবারে গোড়ায় আগুন ধরিয়ে তোদের পুড়িয়ে ছারখার করিব। এই কথা বলিয়া নিম্নলিখিত গীতটী গাহিলাম;—

"দূর! দূর! দূর! সয়তান। রে অধম, দুরাত্মন্, পাপপুরুষ পিশাচ আভান্!

রাগ দেষ হিংসা লোভ মোহ যত, আলস্য বিলাস রিপু শত শত; তোর অনুচর, খল বিষধর, নাশে সবাকার প্রাণ।

জয় নিরঞ্জন, দানবদলন, ভক্তসখা ভগবান; জয় দয়াময়, জয় ব্রহ্মতনয়, জয় সর্ব্বশক্তিমান!" (জয়) [ইমন—কাওয়ালি]

"বাণীর উপদেশানুসারে পূর্ব্বসংস্কার দূর করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম, এবং ক্রমে তাহাতে কতকটা কৃতকার্য্যও হইলাম। অভ্যাসই শত্রু, অভ্যাসই মিত্র। ভগবচ্চিন্তা এবং ইচ্ছাযোগপ্রভাবে অল্পে অল্পে কর্ম্মফলের গতি মন্দীভূত হইয়া আসিল। পরে অন্তঃকরণমধ্যে এই ভাবনার উদয় হইল যে, "পরলোকে আসিলাম, কৈ দেবতাদের শান্তিধামত এখনও দেখা হইল না! মরিলেই লোকে বলে, "অমুক স্বর্গে গিয়াছে, মা ভগবতী আপনার সন্তানকে কোলে স্থান দিয়াছেন, আর কাঁদিবার দরকার নাই।" এ কথার তবে মানে কি? কত দিন আর এখানে একলা অপেক্ষা করিয়া থাকিব? প্রাণ যে বড় আকুল হইল, আর কিছু ভাল লাগিতেছে না। এখানেও কি আবার শৈশব বাল্য যৌবন আছে না কি? ভবযন্ত্রণার কি এখনও শেষ হয় নাই?"

"আপনাপনি এই রূপ আন্দোলন করিতেছি, আর ভাবিতেছি, এমন সময় বাণী বলিলেন, "বিশ্বাসের সহিত ধৈর্য্য ধরিয়া থাক! আশাপূর্ণ মনে প্রতীক্ষা কর! ব্যস্ত হইও না!"

"অদ্যকার কথার সুর যেন কিছু বেশী গম্ভীর। একে আমার চিত্ত ব্যাকুল চঞ্চল, তাহার উপর এই কঠোর উপদেশ, হৃদয় আরো যেন অস্থির হইয়া উঠিল। বলিলাম, "মহাশয়! কৈ আমি আজোতো দেবতাদের শান্তি-ধাম দেখিতে পাইলাম না!"

বাণী। এখনি শান্তিধাম! হয়েছে কি তোমার? ক্ষেপেছ না কি?

আমি। কেন মহাশয়! আমি যে বিদেহ হইয়া পরলোকে আসিয়াছি।

বাণী। তবেত মাথা একেবারে কিনে নিয়েছ! পরলোকে এলেই বুঝি অমনি তৎক্ষণাৎ শান্তিধাম দেখিতে পাবে?

আমি। সেই রূপইত শুনা ছিল। সকলেই বলে, পরলোকে আসিলেই স্বর্গ পাওয়া যায়।

বাণী। কোন্ মূর্খ এমন কথা বলে? ভারি যে তোমার উচ্চ আশা দেখি! দেহটা ত্যাগ করিলে,—তাই কি ইচ্ছায় করিয়াছ?—আর অমনি দেবতাদের দলে মিশে স্বর্গভোগ! বা! বা! বা! বামন হয়ে চাঁদে হাত!

"উত্তরগুলি যেন দুই গালে দুই চড় মারিল। মুখখাবা খাইয়া ভয়ে লজ্জায় বড় কাহিল হইয়া পড়িলাম। আমার আশা উৎসাহের আগুনে বাণী মহাশয় যেন ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া সব নিবাইয়া দিলেন। তাঁহার অদ্যকার উপদেশ কেবল গম্ভীর নহে, স্বরও বড় কর্কশ, যেন বেত্রাঘাতের মত তীব্র।"

"অনন্তর সভয়ে বিনীত ভাবে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! তবে পৃথিবীতে এরূপ মিথ্যা কথা কেন প্রচারিত হইল? যে মরে সেই স্বর্গে যায়, সকলেই এই কথা বলে। মরিতে মরিতে খবরের কাগজওয়ালারা তাহাকে একেবারে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দেয়, কত প্রশংসা করে! স্বামী বর্ত্ত-মানে যে স্ত্রী এখানে আসে, তাহার পায়ের ধূলা লইয়া স্ত্রীলোকগুলো বলে, "আহা! সতী সাবিত্রী আমার স্বর্গে চলে গেল!" তিনি তপস্যা পুণ্যধর্ম্ম কিছু করুন না করুন, কোন প্রকারে স্বামীর আগে মরিলেই হইল। এমন কি, যে ব্যক্তি চিরজীবন পাপ করিয়াছে, মরিবার সময় সজ্ঞানে হরিনাম করিতে করিতে এবং শুনিতে শুনিতে যদি সে মরে, তাহাকেও লোকে বলে, "ইনি

বড় মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন!" অনেকের মুখেইত শুনি, "অমুক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।" "আমার স্বর্গবাসী পিতা মাতা।" দেহ ত্যাগ করিলেই স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, এ কথা কে না জানে?"

বাণী। তোমার কি মনে হয়?

আমি। যা চিরকাল শুনে আসছি তাই মনে হয়। সেই আশায় আমিও এখন জীবন ধারণ করিতেছি। একলা আর এখানে থাকিতে পারি না।

বাণী। থাকিতে পার, না পার সে কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু এখানে আসিলেই অমনি যে একেবারে স্বর্গবাসী হইবে তাহার কোন মানে নাই। স্বর্গ এত অনায়াসলভ্য স্থান নহে। দেবতাদের সঙ্গও রাতারাতি লাভ হয় না। নিজে তাহাতো প্রত্যক্ষ করিতেছ, শোনা কথার দরকার কি?

আমি। তাইতো! তবে যে বড় বিপদের কথা হইল!

বাণী। অত কথায় কাজ কি, তুমি নিজেই কেন ভাবিয়া দেখ না, যে ব্যক্তি চিরজীবন যথেচ্ছাচারী হইয়া রহিল, ভগবানকে এক বার ধ্যান চিন্তা করিল না, ভক্তিভাবে ডাকিল না, কিম্বা না হয় নির্দ্দোষ ভাবে লৌকিক ভদ্রতা এবং সৌজন্য রক্ষা করিয়া জীবন কাটাইয়াছে; সে কেবল রোগযন্ত্রণা, মৃত্যুভয়ে এবং পাঁচ জনের শোক আর্ত্তনাদ কান্না কাটি শুনিয়া দুই এক বার হরিনাম করিল বলিয়াই তাহার আত্মা একবারে স্বর্গবাসের উপযুক্ত হইয়া গেল! মৃত্যুর পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত তাহার মন যেমন তেমনিই ছিল, ক্ষণিক ধর্ম্মভাব প্রকাশে কি হরিনাম শ্রবণে তাহা পরিবর্ত্তিত হইবে কি প্রকারে? চাপ পড়িলে সকলেই বাপ বলে, কিন্তু তাহাতে মন অত শীঘ্র বদল হয় না।

আমি। কেন, অনেক কালের পুরাতন পাপীর মনও তো এক নিমেষে ফিরিয়া যায়। জগাই মাধাই তার দৃষ্টান্ত।

বাণী। সে কি মৃত্যুভয়ে, শ্মশানবৈরাগ্যে, না রোগযন্ত্রণায়? ঈশ্বর-প্রেরিত অনুতাপ দ্বারা মনের পরিবর্ত্তন হয়।

আমি। মরিবার সময় কি সে অনুতাপ আসিতে পারে না?

বাণী। পারে, যদি জ্ঞান চৈতন্য থাকে, এবং পাপ স্মরণ করিয়া যদি আত্মগ্লানি হয়। আর ভগবান যদি কৃপা করেন। মৃত্যুকালে তাহা বড় ঘটে না। তখন মরিবার জন্যই লোকে ব্যস্ত হইয়া পড়ে, অনুতাপের অবসর থাকে না। ভয়, সংসারমোহ, প্রিয়বিরহযন্ত্রণা আর দৈহিক ক্লেশে মানুষকে তখন অভিভূত করিয়া ফেলে।

আমি। তবে এরূপ মিথ্যা আশার কথা প্রচার হইল কেন?

বাণী। তার মানে আছে। শোকার্ত্তদিগকে ঐ কথা বলিয়া লোকে সান্ত্বনা দেয়। আর যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া পরলোকে যাইতে বসিয়াছে তাহার প্রতি লোকের একটু মায়া মমতাও বেশী হয়। সে সময় তার দোষ অপরাধ অত্যাচার লোকে আর মনে রাখিতে বড় ইচ্ছা করে না। তা ছাড়া মুমূর্ষু ব্যক্তির মন সাধারণতঃ তখন বহু পরিমাণে ক্ষমাশীল উদার এবং বিনয়ীও হয়। সেই জন্য তখন ছোট বড় আপন পর সকলের নিকট সে পদধূলি প্রার্থনা করে; কাহাকেও আর তৎকালে শত্রু ভাবিতে চাহে না। এই সমস্ত কারণে সন্তুষ্ট হইয়া ইহার বিনিময়ে লোকে তাহার হাতে স্বর্গ আনিয়া দেয়। দুইটা ভাল কথা বলিতে আরত কোন ব্যয় ভূষণ নাই, তাই বিপদের সময় বন্ধুজনেরা এই প্রকার বলিয়া থাকে।

আমি। আচ্ছা মরিবার সময় কি সকলেরই মন ভাল হইয়া যায়?

বাণী। কারো কারো হয়ও না। এমন কঠিন এবং কুটিল আত্মা আছে যে মরিবার সময় সে মরণ কামড় দেয়। তবে চিত্তের গতি ফিরিবার ইহা একটী সুযোগ বটে। কেন না, বিধাতাপ্রেরিত যে মৃত্যুরোগ, সে বড় কাজের লোক। সহস্র উপদেশ, সাধু দৃষ্টান্ত, দারিদ্র্য কষ্ট অবমাননায় যাহা না হয়, সাংঘাতিক পীড়ায় তাহা অতি সহজে হয়। তখন যে আর অন্য কোন উপায় থাকে না। এটাও অবশ্য সৌভাগ্য। কারণ, অনেকে অজ্ঞানে জীবন কাটাইয়া অজ্ঞানেই মরে।

আমি। তাদের বোধ হয় মরিবা মাত্র লোকে স্বর্গে গেল এ কথা বলে না।

বাণী। হাঁ, ইহাতেই বুঝিয়া দেখ, কে স্বর্গে যায়, কেইবা নরকে যায়। আসল কথা, কেহ কোথাও যায় না, যে অবস্থায় যে ছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই সে থাকে; কেবল বিপাকে পড়িয়া দেহত্যাগজন্য কাহারো কাহারো মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, আর ভাল হইবার জন্য অন্তরে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। যিনি সাধু তিনি ইহ পরকালে স্বর্গভোগ করেন। যে পাপী, সে নরক হইতে উঠিয়া অন্তরে নরক লইয়াই এখানে আসে; এসে ভাল হইতে বাধ্য হয়। তাও কি ইচ্ছাপূর্ব্বক? প্যায়দায় করে তোলে। দয়ার ঠাকুর শ্রীহরি অনেক সময় ভাল বাসিয়া শিক্ষা দেন, আবার কত সময় শাসন পীড়ন দ্বারাও শিক্ষা দিয়া থাকেন; কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্য মঙ্গলজনক।

আর জীবিতেরা যে মৃত ব্যক্তির এত প্রশংসা করে তাহার আর একটা মানে আছে। তাহাকে লইয়া আরত ভুগতে হবে না, তার সঙ্গে ঠকামকিও বাধবে না; লৌকিক সৌজন্ত দেখানতে কোন খরচও নাই; তাই দুই কথায় প্রতিবাসীরা তাহাক একবারে স্বর্গে তুলে দিয়ে ঘরে চলে যায়। মনে মনে সেটা বড় বিশ্বাস করে না। অনেক স্থলে হাড় জুড়াইল, বাঁচিলাম, এরূপও মনে ভাবে। ফলে সে সময় শত্রুও মিত্রবৎ হয়। যেমন মুমূর্ষু রোগী যে কোন উপাদেয় বস্তু খাইতে চাহিলে আদর করিয়া তাই তাকে সকলে দেয়; স্বর্গপ্রাপ্তিও কতকটা সেই রূপ জানিবে। নিজে মরিলে ঐ রূপ প্রশংসা পাইব, ইহাও বোধ হয় আশা রাখে। কিন্তু মানুষের বিচার ঈশ্বরের মত নহে।

"বাণীর কথাগুলি যেন আমার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া গেল। বুঝিলাম, ঠিক কথাই বটে। কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভাবিয়া হৃদয় বড় বিষণ্ণ হইল। এখানে আরত ঘুষ ঘাষ তোষামোদ চাটুবাদ চলে না, লোকের প্রশংসা সাধুবাদেও কুলায় না, সূক্ষ্ম বিচার। কাজেই আমি অন্তরের বেগ কমাইতে বাধ্য হইলাম।"

"আমাকে ভগ্নোদ্যম দেখিয়া বাণী বলিলেন, "স্বর্গ বহু দূরে এবং অতি নিকটে। ভগবচ্চিন্তা এবং ধ্যানে তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে সশরীরেও স্বর্গভোগ হয়। ফলতঃ আত্মাই স্বর্গ এবং নরক। তবে যত দিন দেহ থাকে, তত দিন নরক কিছু নিকটে, বিদেহ হইলে স্বর্গগমনের পথ পরিষ্কার হয়। কিন্তু কর্ম্মফল অলঙ্ঘ্য। মৃত্যু কেবল অবস্থান্তর মাত্র, রূপান্তর নয়। কথঞ্চিৎ নির্দ্দোষ ভাবে কাল কাটাইয়া যে মরে, কিম্বা কিছু কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম যে করে, আত্মীয়েরা তাহাদিগকে বলে, ইনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। কিন্তু স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্যের বিচারক কি মানুষ, না ঈশ্বর? যে সাধু সাধ্বী ছিল, মরণান্তে সে স্বর্গে গেল বলিলেই মনে হয় যেন সে এত কাল নরকে ছিল। এ সব লৌকিক ব্যবহারের কথা। মৃত্যুকালীন ধর্ম্মের যে বাহ্য আড়ম্বর দেখা যায় তাহার উপরে স্বর্গ নরক নির্ভর করে না। তুমি নিরাশ হইও না, শীঘ্রই আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিয়া অনন্তজীবনপ্রদ নবজন্ম লাভ করিবে।"

তৃতীয় অধ্যায়।

"কর্ম্মফল এক প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান; কারণের সহিত কার্য্য, গতির সহিত বেগ, জলের সহিত শৈত্য, অগ্নির সহিত উত্তাপ যেমন অবশ্যম্ভাবীসূত্রে গ্রথিত, কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ তেমনি অপরিহার্য্য। ঋণ করিয়া তাহা শোধ না দিলে ক্রমে তাহার সুদ বৃদ্ধি হয়; শেষ সুদের সুদ তার সুদ বাড়িয়া ঋণ-ভার অতিশয় গুরু হইয়া উঠে। পার্থিব জীবনের কর্ম্মফলের গতিরোধ করিবার জন্য আত্মসংযম এবং সৎপ্রবৃত্তির যদি উৎকর্ষ সাধন না করা যায়, পাপা-সক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হয়। নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ সাধনে সুদ বন্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু আসল ঋণ যেমন তেমনি থাকে; পরে তাহা হইতে আবার সুদ বাড়িবার সম্ভাবনা। কেবল অধিক মাত্রায় সৎপ্রবৃত্তির উন্নতি সাধন করিলে, ঋণদায় হইতে জীব একবারে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ইন্দ্রিয়ের আধার, প্রবৃত্তির ক্রীড়াগৃহ রক্তমাংসময় দেহের অন্তর্দ্ধান নিবৃত্তি সাধনের পক্ষে অনুকূল অবস্থা হইলেও আমাকে পুরাতন বাসনার সঙ্গে কিছু দিন প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। ইহা চিরনির্ব্বৃতি লাভের জন্য শেষসংগ্রাম, পাপের শেষপ্রায়শ্চিত্ত এবং দণ্ডভোগ। তদনন্তর যথাসময়ে আধ্যাত্মিক জীবনের সৎপ্রবৃত্তির বিকাশ আরম্ভ হইল। দেহে অবস্থান কালে যতই কেন যোগ তপস্যা শম দম সাধন করা যাউক না, দেহের বহির্ম্মুখ ধর্ম্ম কিছুতেই নিঃশেষিত হয় না। যেখানকার যে সাধন সেখানে না পৌঁছিলে তাহা কল্পনাযোগে কেহ আয়ত্ব করিতে পারে না; ইহা এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। পূর্ব্বে কল্প-নার সাহায্যে অনেক বিষয় সাধন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা মনের প্রকৃত অবস্থা কি রচনা করা যায়? দুঃখ বিপদে উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত না হইলে কিম্বা মৃত্যুমুখে না পড়িলে কি সে সকল অবস্থার মর্ম্ম কেহ অনুভব করিতে পারে? অথচ সেই অনুভব ব্যতীত তত্তৎ অবস্থার উপযোগী সাধন সম্ভব নহে।"

"নিবৃত্তি সাধন দ্বারা যখন আমি সাম্যাবস্থায় উপনীত হইলাম, তখন সামঞ্জস্য লাভের জন্য আমার চিত্ত বড় উৎসুক হইল। ভাবিলাম, বাণী যে বলিলেন, "তোমার নবজন্ম লাভ হইবে" এ কথার অর্থ কি? পুনর্জ্জন্মের কথা ত অনেক বার শুনিয়াছি, তবে কি আবার আমায় দেহ ধারণ করিতে

হইবে? অনন্ত গুণময় বিধাতার রাজ্যে কোথায় কোন্ বিধি প্রচলিত কিছুইত জানি না, তিনি পুনরায় পৃথিবীতে কিম্বা অন্য কোন লোকে কি আমাকে পাঠাইবেন? আবার কি আমায় শেয়াল কুকুর, হাড়ি চণ্ডাল হইয়া জন্মিতে হইবে? এই রূপ নানা প্রকার ভাবনা আসিয়া জুটিল। আশা নির্ভর যথেষ্ট আছে যে ঠাকুর কখন মানুষের মত বিচার করিবেন না; যাহা কিছু তিনি করিবেন আমার মঙ্গলের জন্যই করিবেন। তথাপি চিত্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল। কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া শেষে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। তখন বাণী স্বর্গীয় ভাষায় বলিতে লাগিলেন;—"তোমার যে পুনরায় নবজন্ম হইবে, তাহার মানে নিকৃষ্ট দেহ ধারণ নয়; পশুত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া দেবত্বে প্রবেশ করিবে এই বিধি। কিন্তু মুমুক্ষুর পশুত্ব বিনাশের জন্য কি আর পশুদেহ ধারণ বিধাতার বিচারে সঙ্গত হয়?"

"আমি বলিলাম, তাহা অসম্ভব বলিয়াই আমি ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। আমি অজ্ঞ বালক, আপনাদের এ রাজ্যের বিধি নিয়ম কিছুই ত জানি না; অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সব শিখাইয়া দিন। আমাদের দেশে পুনর্জন্মের মতটা বড়ই প্রচলিত। পণ্ডিতেরা বলেন, যত দিন বাসনা থাকে, তত দিন পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিতে হয়। অর্থাৎ দৈহিক ইন্দ্রিয়ের সুখবাসনা, বিষয় কামনা দেহ ভিন্ন কিরূপে চরিতার্থ হইবে?' এক জন্মে তাহাত হয় না, এই জন্য জন্ম-জন্মান্তর আবশ্যক। বহু জন্মের পর কর্ম্মফল ভোগ এই রূপে নিবৃত্ত বা নিঃশেষিত হইলে তার পর জীব মুক্তি লাভ করে। তখন আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রায় বাসনা চরিতার্থ করিয়া তাহাতে অরুচি অশান্তি জন্মিলে তবে মুক্তি, তদ্ভিন্ন মুক্তির আশা নাই।"

বাণী। তোমাদের দেশের এ কিরূপ অদ্ভুত শাস্ত্র! কামনার নিবৃত্তি জন্য যদি পুনঃ পুনঃ সেই কামনা চরিতার্থ কর, তাহা হইলে উহা বাড়িবে, না কমিবে? "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।" এই প্রাচীন ঋষিবাক্য কি কখন শুন নাই? অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে তাহা উত্তরোত্তর জ্বলিয়া উঠে, ইহা যদি সিদ্ধান্ত হইল, তবে পশুদেহ ধারণ করিলে পশুপ্রবৃত্তি কি ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকিবে না? যে প্রবৃত্তির যত চালনা হয় তাহা ততই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, ইহাত সহজজ্ঞান-সিদ্ধ কথা, সচরাচর পরীক্ষিত?

আমি। আজ্ঞে হাঁ, এ ঠিক কথা। সেই জন্যইত আমি এত ক্ষণ মিলা-

ইতে পারিতেছিলাম না। আপনার নিকট যখন শুনিলাম, তখন আর আমার ইহাতে কোন সংশয় রহিল না। তবে এ সম্বন্ধে আর এক কথা এই যে, পুনর্জ্জন্মলাভ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য। ব্রাহ্মণের তনয় যদি পাপ করে, তবে সে তজ্জন্য নীচ কুলে পুনরায় জন্মিবে। বৈশ্য কি শূদ্র যদি অপরাধী হয়, সে শৃগাল কুকুর তীর্য্যগ সরীসৃপের গর্ভে জন্মলাভ করিবে; সুতরাং ইহা তাহাদের পক্ষে পাপের দণ্ড হইল। এই রূপে দণ্ডভোগ করিয়া আবার তাহারা ঋষিকুলে, তদনন্তর দেবকুলে জন্ম গ্রহণ করত সর্ব্বশেষে একবারে ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হইবে।"

বাণী। এটাও নিতান্ত উপহাসের কথা। পাপ করিয়াছে, এই জন্য আরো সে পাপ করিবে; এটা কি সুবিচার হইল? পাপে পাপ বৃদ্ধি, পুণ্যে পুণ্য বৃদ্ধি, ইহা প্রকৃতিরই গুণ, অবশ্যম্ভাবী নিয়ম; কিন্তু মানুষ যদি পশু হইয়া জন্মে, তাহা হইলে যে তাহার পাপ পুণ্য বোধই রহিল না? বিবেক ধর্ম্মবুদ্ধি তাহারত থাকা চাই। কোন শৃগাল কুকুর কিম্বা ভেক সর্পকে কি পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া তুমি কখন অনুতপ্ত হইতে দেখিয়াছ? না কোন চণ্ডাল মেথরকে বিষ্ঠাভার স্কন্ধে হা বিধাতঃ বলিয়া কাঁদিতে শুনিয়াছ? বরং তোমাদের কেরাণী বাবু, জমিদার এবং রাজা বাবুদের অপেক্ষা তাহারা প্রফুল্ল চিত্ত। শেয়াল কুকুর বিড়াল প্রভৃতি পশুরা এবং কাঙ্গাল দুঃখী নীচ ব্যক্তিরা সকলেই কাঁদে বটে সময়ে সময়ে, কিন্তু পূর্ব্বজন্মে আমি এই এই পাপ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য এ জন্মে তাহার এই দণ্ড ভোগ করিতেছি, ইহা বিশ্বাস কিম্বা অনুভব করিয়া কেহ ত প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে কাঁদে না। "এমন কর্ম্ম আর করিব না। এখন হইতে ধর্ম্মপথে যাইব।" ইহাকেই প্রায়শ্চিত্ত বলা যায়। এরূপ ভাবে কি উহাদিগকে কখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে দেখিয়াছ? দুঃখ বিপদ রোগ শোকে অদৃষ্ট, বিধিলিপি, কর্ম্মফল ইত্যাদি কতকগুল কথা মুখে অনেকে বলে বটে, কিন্তু তাই কি তাহাদের আন্তরিক বিশ্বাস? যদি বিশ্বাস হইত, কিম্বা ঐ সকল দুরবস্থাকে যথার্থই পূর্ব্বজন্মের পাপের দণ্ড বলিয়া বুঝিত, তাহা হইলে অবশিষ্ট জীবন যোগ তপস্যায় অতিবাহিত করিত সন্দেহ নাই। যিনি ন্যায়বান, মঙ্গল-সঙ্কল্প দণ্ডদাতা তিনি অগ্রে জীবের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দেন, যে আমি এই এই পাপ করিয়াছিলাম, তাই এখন এই এই দণ্ড ভোগ করিতেছি। তৎ সঙ্গে তিনি তাহার অন্তঃকরণে এই সৎ প্রতিজ্ঞা, সাধু সঙ্কল্পও আনিয়া

দিবেন, যে আমি আর এমন কর্ম্ম করিব না, ভাল হইব। ইহাকেই বলি শাসন দণ্ড, এবং ইহাকেই বলি পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত।

আমি। তাইত! এ যে অতি উত্তম কথা! এমন সহজ বিষয়টা এত ক্ষণ আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। আচ্ছা, তবে অন্ধ পঙ্গু খঞ্জ বধির মূক হইয়া কেহ কেহ জন্ম গ্রহণ করে কেন? এবং এক অবস্থায় থাকিয়া কেহ ভাল কেহ মন্দ, কেহ দুষ্ট কেহ শিষ্ট, কেহ নির্ব্বোধ কেহ সুবোধ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কেহ ধনী কেহ দরিদ্র হয় কেন? এ সকল কি পূর্ব্বজন্মের অপরাধজন্য নহে? তাহা যদি না হয়, তবে ইহাঁতে বিধাতার কি পক্ষপাতিতা প্রকাশ পায় না?

বাণী। পাপশাসনের এবং প্রায়শ্চিত্তের মূল অভিপ্রায় এবং লক্ষণের সঙ্গে ইহা মিলাইয়া দেখ, তাহা হইলে আপনিই এখনি বুঝিতে পারিবে। আর যে পক্ষপাতিতার কথা বলিতেছ, তাহা যদিও মানবীয় বুদ্ধিতে আপাততঃ প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু মনুষ্যলোকে প্রচলিত ভাল মন্দ সুখ দুঃখ ছোট বড় বিচারের আদর্শ এ স্থলে বিধাতার গূঢ় দুর্জ্ঞেয় মঙ্গলাভিপ্রায়ের সঙ্গে মেলে না। অসার ধনলোভী, ধনী দরিদ্রের বৈষম্য মীমাংসা করিতে গিয়া পুনর্জন্ম কল্পনা করিয়াছে। জন্মদুঃখী বা রোগীর কথা যাহা বলিলে, তাহার অন্য কারণ আছে। পিতা মাতার দৈহিক ও মানসিক-বিকার তাহার এক প্রধান কারণ। ফলতঃ মনুষ্যসমাজ এক অখণ্ড দেহবিশেষ, তাহার এক অঙ্গের সহিত অপর অঙ্গের দূর এবং নিকট সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনের জন্য দায়ী হইলেও সমাজের উপর তাহার মঙ্গলামঙ্গল বহু পরিমাণে নির্ভর করে। তদ্ব্যতীত এ সম্বন্ধে অনেক বিষয় মনুষ্যকে বুঝিতে দেওয়া হয় নাই; দুর্ব্বোধ বিষয়ে স্রষ্টার উপর বিশ্বাস রাখিতে হয়, তার পর বিশ্বাস হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। মঙ্গলময়ের গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় সকল বহুতর জীবনের ভিতর দিয়া, সুবিস্তৃত কার্য্যকারণশৃঙ্খলে, নানা ঘটনা উপলক্ষে লোকচক্ষুর অগোচরে প্রস্ফুটিত হয়।"

"বাণীর উপদেশে আমার ভয় এবং ভ্রান্তি দূর হইল, পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করিতে হইবে না শুনিয়া প্রাণে বড় শান্তি লাভ করিলাম। তিনি ইহাও বুঝাইয়া দিলেন, "কর্ম্মানুসারে যে জন্ম লাভ তাহা আধ্যাত্মিক অবস্থার অনুসারী। দেহেতেও তাহার লক্ষণ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু এক জন্মেই

তাহা ঘটে। তজ্জন্য পুনর্জন্মের প্রয়োজন হয় না। যে দুরাচার মদ্যপায়ী সে ক্রমশঃ দেবত্বপরিভ্রষ্ট হইয়া পশু, উদ্ভিজ, পরিশেষে জড় প্রকৃতি ধারণ করে। আবার কর্ম্মগুণে এক জন্মেই উক্ত ত্রিবিধ অবস্থা অতিক্রম করত সে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাকে ঠিক জন্ম বলা যায় না, অবস্থান্তর বা রূপান্তর বলা যাইতে পারে।" বাণীর প্রসাদে আমি সান্ত্বনা এবং আশা পাইলাম এবং তাহাতে মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা আমার বিশ্বাসও বৃদ্ধি হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই আমি নবজীবনে প্রবেশ করি।"

চতুর্থ অধ্যায়।

"নবজন্ম বা নবজীবন বাস্তবিকই কেবল অবস্থান্তর মাত্র, দেহ ধারণ নয়। অমরাত্মার অবিশ্রান্ত ভগবতাভিমুখ্য গতিকে অনন্ত উন্নতি বা অনন্তজীবন কহা গিয়া থাকে। এ সমস্তই আত্মিক ব্যাপার, পৃথিবীর জড়াত্মবাদের সহিত ইহা মেলে না। দেশ নাই, কাল নাই, দেহ নাই, কেবল চৈতন্যময় নিরাকার আত্মার অস্তিত্ব, স্থিতি, বিচরণ, উন্নতি ; অনন্ত চৈতন্যের জগতে অমরাত্মা-গণের সঙ্গে তাহার সহবাস, মিলন এবং ব্যবহারক্রিয়া, এ সকল গূঢ় অধ্যাত্ম তত্ত্বের কথা অনির্ব্বচনীয়। ভাষায় তাহা ব্যক্ত করার পক্ষে ক্রমেই এখন কঠিন হইয়া আসিতেছে। শরীরহীন আত্মা (Spirit without form) বহির্মুখগতি অযোগী ব্যক্তি ইহা ধারণা করিতে পারে না। যন্ত্র নাই যন্ত্রী আছে, কিরূপে ইহা সে ভাবিবে ? মনুষ্য যতই কেন বুদ্ধিজীবী ক্ষমতাশালী হউক না, যন্ত্র ভিন্ন সে কিছুই করিতে পারে না। হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ নাসিকা মস্তিষ্ক নাই, অথচ মনুষ্য আছে। সে কিরূপ ? কার্য্যেতেই মানবের অস্তিত্ব, কিন্তু দেহহীন নিষ্কর্ম্মা মনুষ্য কি রূপ ? কোন ইন্দ্রিয়যন্ত্র নাই, আত্মা আছে, তাহার জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা আছে, ইহা কেবল যোগীরাই ভাবিতে পারেন। গভীরাত্মা সূক্ষ্মদর্শী ধীরেরা যে সময় সশরীরে স্বর্গভোগ করেন, তৎকালে তাঁহাদের না কি বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। যাই হউক, এ সম্বন্ধে আমার নিজ অভিজ্ঞতার কথা যত দূর প্রকাশ করিতে পারি তাহার ত্রুটি করিব না।"

"পার্থিব বাসনাকষায় যখন আমার একবারে নিঃশেষিত হইল এবং মুক্তি-

রাজ্যে নবজীবনে যখন আমি প্রবেশ করিলাম, তখন আমার স্বচ্ছ ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের ভিতর অনন্ত পরমাত্মা ক্রমে বিকসিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রস্ফুটিত হইবার পক্ষে এখন আর কোন বাধা বিঘ্ন নাই। কেবল অপূর্ণতাজন্য যে ত্রুটি। অল্পজ্ঞতা, আর কিছু কিছু পূর্ব্বতন ভ্রান্ত সংস্কারের আভাস তখনও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইত। অনেকে শুনিতে পাই বলেন, পরকালে আসিয়া এক প্রকার সূক্ষ্ম দেহ লাভ হয় এবং তাহা এত সূক্ষ্ম যে সমস্ত স্থূল আবরণ ব্যবধান ভেদ করিয়া সে বহু দূরস্থিত বিষয় দেখিতে শুনিতে পায়, এবং অন্তর ভেদ করিয়া অন্তরের ভাব জানিতে পারে। তাহার তাৎপর্য্য এখন আমি বুঝিতে পারিলাম। এখানে সূক্ষ্ম দেহের কোন আবশ্যকতা থাকে না, বিদেহ আত্মাই সেই সূক্ষ্ম পদার্থ; যোগবলে চিদানন্দের সহবাসগুণে তাহার জ্ঞানের সীমা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হয়। দেহে অবস্থান কালেও কি তাহা হয় না? অবশ্যই হয়, তবে এখন যেমন সুযোগটী ঘটে, দেহ ধারণে তেমন নহে। পরমজ্ঞানময় অনন্ত চৈতন্য যখন জীবাত্মার ভিতর জ্ঞান সঞ্চার করেন তখন আর জ্ঞানের অভাব কোথায়? তাঁহার এক কণিকা জ্ঞানজ্যোতিতে সমস্ত জীবন আলোকচ্ছটায় প্লাবিত হইয়া যায়। যিনি পরমতত্ত্ব, মহাশক্তি, ইচ্ছাময় পুরুষ, তাঁহার জ্বলন্ত প্রভাব ধারণ করে কাহার সাধ্য? পৃথিবীর লোকেরা কেবল শরীরকেই সর্ব্বস্ব মনে করে। তাহার ভিতর দিয়া ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে কিঞ্চিৎ জ্ঞানের আস্বাদ পায় তাহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট মনে হয়। মহাজ্ঞানের সহিত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানযোগ যে কত গভীর সমুজ্জ্বল এবং উচ্চ, সে বিষয়ে তাহাদের আদৌ সংস্কার বোধ নাই। চিন্তাশীল যোগী এবং প্রত্যাদিষ্ট মহাজনেরা সে তত্ত্ব কিছু কিছু অবগত হইয়াছিলেন। জ্ঞানের মহাসমুদ্রমধ্যে যখন বাস, তখন সীমাবিশিষ্ট একটা সূক্ষ্ম দেহ লইয়া তুমি কি করিবে? দৈহিক জীবের ক্রমোন্নতির বিকাশপ্রণালী ইহা দ্বারা কল্পিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন নাই। দেহত যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়! এখানে সে যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না; চিদ্‌ঘন যন্ত্রের ভিতর দিয়া চিতের সঙ্গে চিতের সাক্ষাৎ যোগ। এই জন্য যোগীরা দেহের সমস্ত ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়গণের দ্বার সর্ব্বাগ্রে অবরুদ্ধ করেন, সমস্ত ব্যবধান ঘুচাইয়া তার পর যোগ সাধনে নিযুক্ত হন। ইহা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, চৈতন্যের রাজ্যে যাঁহারা দিব্যজ্ঞান অন্বেষণ করেন, দেহ তাঁহাদের পক্ষে এক বিষম অন্তরায়। দেহের আর এক আবশ্যকতা

বাহ্য কার্য্য সাধনের জন্য। কিন্তু দেখা উচিত, কার্য্যটা কি? ভগবানের ইচ্ছা পালন ভিন্ন আরত কিছুই নয়। যখন সেই ইচ্ছাময়ের সহিত ইচ্ছার মিলন হইল, তখন বাহিরের সামান্য কার্য্য আর কে করিতে চায়? (অবশ্য নিকৃষ্ট অধিকারীর উন্নতির জন্য অন্যবিধ যন্ত্র প্রদত্ত হইয়া থাকে)। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি তখন আধ্যাত্মিক অনন্ত উন্নতির কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আত্মাকে পূর্ণ ব্রহ্মের মহত্ত্ব, গাম্ভীর্য্য, অতুল ঐশ্বর্য্য এবং মধুরতা সৌন্দর্য্যের দিকে মহাবেগে পরিচালিত করে। মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব এ অবস্থায় কেবল জ্ঞান ভক্তি প্রেমানুগত্যের পূর্ণতাসাধক আধার মাত্র। পার্থিব জগতে বাহ্যিক যাহা কিছু তোমরা দেখিতে পাও তাহা সেই অখণ্ড আধ্যাত্মিকতার ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখানে সেই আধ্যাত্মিক জীবনের আধ্যাত্মিক কার্য্য ব্যতীত আর কিছু দেখা যায় না। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত লীলার রাজ্য; যত ইচ্ছা তত শিক্ষা এবং সম্ভোগ কর। জীবাত্মা অনন্তদেবের একটী ক্রীড়া পুত্তলিকা, তাহাকে লইয়া তিনি কত ভাবে কত রূপে খেলা করিবেন তাহা কে বলিবে? পার্থিব জীবন যেমন জীবনী-শক্তির সাহায্যে, ক্ষুধা, ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি এবং বাসনার উত্তেজনায় সহজে প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি বাসনাবর্জ্জিত নির্ব্বাণগতিপরায়ণ ব্রহ্মাভিমুখী উন্নতিশীল অমরাত্মা এখানে অতি সহজে দৈবশক্তিযোগে অনন্তের দিকে উত্থিত হইতে থাকে। তখন স্বয়ং অনন্ত তাহার জীবনীশক্তি, জীবিকা; ভগবানের অতুল বিভব বিচিত্র বিভূতি তাহার নিত্য উপভোগ্য বিষয়। জীবোপাধি আত্মার পশ্চাতে অনন্ত বলের পেষণ, সম্মুখে অনন্ত বলের আকর্ষণ।"

"এই অবস্থায় কথঞ্চিৎ শান্তি এবং স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া একদা বাণীকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মহাশয়! আমাকে কি পূর্ব্বপাপের জন্য এখানে আর নরকদণ্ড ভোগ করিতে হইবে না? এমন যে পুণ্যশ্লোক রাজা যুধিষ্ঠির, তাঁহাকেও না কি স্বর্গে যাওয়ার পূর্ব্বে শুনিয়াছি এক বার নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল; আমি আর তবে কোন্ কীটস্থ কীট যে বিনা নরক-ভোগে স্বর্গে যাইতে পারিব? নরক কিরূপ এবং কোথায়? শেষবিচার কাহাকে বলে? আমাকে যদি অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দেন, বড় বাধিত হই।

বাণী। পাপের প্রায়শ্চিত্ত, দণ্ড, পুনর্জন্ম ইত্যাদি প্রসঙ্গে ইতঃপূর্ব্বেই আমি যে যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহারই মধ্যে তোমার এ প্রশ্নের উত্তর আছে।

একটু স্থির চিত্তে ধ্যানস্থ হইয়া ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। পুনরায় বলিতেছি, যোগসমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। নরক কিসের জন্য? অবশ্য পাপীর দণ্ডবিধানের জন্যই উহা কল্পিত হইয়াছে। ইহা জানা উচিত যে, যেমন অতৃপ্ত বাসনা, পশুপ্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ করিবার জন্য পশুদেহ ধারণপূর্ব্বক ক্রমে নিবৃত্তিমার্গে আরোহণ অযৌক্তিক এবং অসম্ভব কথা; তেমনি মহাকবি মিল্টনের বর্ণিত ভীষণদর্শন অগ্নিময় নরকাবর্ত্ত, কিম্বা হিন্দু-শাস্ত্রোল্লিখিত যমালয়, এ সব কল্পিত চিত্র, পাপযন্ত্রণার এক মূর্ত্তিমান ছবি। ইহা অবশ্য জান, পাপ বলিয়া কোন বস্তু নাই, পাপ অবস্তু, মানসিক একটি অবস্থামাত্র; ইহার দণ্ডস্বরূপ যে নরকযন্ত্রণা তাহাও একটি আধ্যাত্মিক অবস্থা। তুমি নিজেই ত এই অবস্থার ভিতর দিয়া আসিয়াছ! অতএব, নরক বলিয়া কোন একটী স্থান নাই; সর্প বৃশ্চিক ইত্যাদি ঘোরদংষ্ট্রা জীবসঙ্কুল গভীর পুরীষহ্রদ প্রকৃত নরক নহে। তাহাতে নিক্ষেপ করিলে অন্তরের পাপ যায় না। তাহা যদি হইত, মেথর, চর্ম্মকার, কশাই, ডাক্তার, ধাত্রী, ইন্দুর ছুঁচো ব্যাঙ্ এবং বিষ্ঠাভোজী কীটেরা মুক্ত হইয়া এত দিন স্বর্গে চলিয়া যাইত। দেহধারী জীবমাত্রেই কি এ প্রকার নরকভোগ করে না? দেহটা কি নরকতুল্য নহে? অতএব এ প্রকার সংস্কার আর তুমি পোষণ করিও না, একবারে ছাড়িয়া দাও।

আমি। দেহে ব্যাধি এবং কষ্ট যন্ত্রণা অবমাননা হইলে কি আত্মাতে যন্ত্রণা বোধ হয় না? এবং সেই যন্ত্রণা কি পাপের দণ্ড নহে?

বাণী। কখনই না। তবে বিশ্বাসের সহিত সেই ভাবে যদি উহাদিগকে গ্রহণ কর, বিনয় ভক্তি বৈরাগ্য বাড়িবে। কিন্তু শরীরে সহস্র যন্ত্রণা বোধ হইলেও আত্মাতে পাপবোধের যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। মহাব্যাধিগ্রস্ত গলিত-কুষ্ঠ রোগীর জীবন দেখ। ও পথই নয়। পাপযন্ত্রণা বা পাপের দণ্ড সম্পূর্ণরূপে মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। চিত্তের পরিবর্ত্তন, পাপের প্রতি ঘৃণাবোধ, তৎসঙ্গে পবিত্রতা সাত্ত্বিকতায় রুচি এবং শ্রীহরির উদার স্নেহপ্রেম স্মরণে লজ্জা আত্মগ্লানি না হইলে কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। শরীরকে খণ্ড বিখণ্ড করিলেও পাপাসক্তি যায় না, পুণ্যপথে মন ফেরে না। ইহার শত সহস্র প্রমাণ তোমরা ত স্বচক্ষে পৃথিবীতে দেখিয়াছ; অধিক কথায় আর দরকার কি?

আমি। তবে পাপ বাস্তবিক কাহাকে বলেন? এবং তাহার যথার্থ

দণ্ডভোগের প্রণালীই বা কি ? আমাকে এ বিষয়টা আরো একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

বাণী। তত্ত্বতঃ পাপ কি, ইহা যদি বুঝিতে চাও, তবে ভগবদেচ্ছার বিরুদ্ধ যাহা কিছু চিন্তা ভাব কল্পনা অভিপ্রায় কার্য্য সমস্তই পাপ। কিন্তু মানবজীবনে কার্যাতঃ ইহার অস্তিত্ব প্রতি জনের বোধশক্তির উপর নির্ভর করে। যত দিন পাপকে পাপ বলিয়া উপলব্ধি না হয়, তত দিন পাপের কথা মুখে বলা কেবল বুদ্ধিগত একটা মত, এবং লোকলজ্জার একটা গ্লানি মাত্র। অনেক স্থলে কবিকল্পনা। পুণ্যে রুচি অনুরাগ না জন্মিলে পাপে ঘৃণা বা যন্ত্রণা বোধ হয় না। কুসুমপরিমলসিক্ত বিশুদ্ধ বায়ুসেবিত দিব্য অট্টালিকাবাসীর নাসিকায় গলিত ঘৃণ্য পূতিগন্ধময় পদার্থ যেমন ঘৃণা এবং ক্লেশোদ্দীপক, পাপমাত্রের প্রতি তাদৃশ ঘৃণা না জন্মিলে পাপের অস্তিত্বই প্রমাণ করা যায় না। তুমি যদি দুরাচারী চোর দস্যু মদ্যপের নিকট তাহাদের আচরিত পাপানুষ্ঠানের দোষ ঘোষণা কর, উহাতে তাহাদের ঘৃণা হওয়া দূরে থাকুক, অধিকতর আগ্রহের সহিত তাহারা সে সকল পাপকার্য্যে ধাবিত হইবে। অবশ্য পাপের প্রতি ঘৃণাবোধেরও মাত্রা আছে এবং তদ্বিষয়ে শাসন ও শিক্ষারও ক্রম আছে। কিন্তু যে পরিমাণে বোধের উদয় সেই পরিমাণে কার্য্যতঃ উহার অস্তিত্ব। পাপ এক দিকে যেমন প্রকৃতির বিকৃতি, এবং ব্যাধি, তেমনি ইহা দুর্ব্বলতা অপূর্ণতা; যেমন সকর্ম্মক, তেমনি অকর্ম্মক। যে পরিমাণে পুণ্যের আদর্শ সমুজ্জলিত এবং উন্নত হইয়া উঠে, সেই পরিমাণে পাপবোধ তীব্রতররূপে উত্তরোত্তর অনুভূত হইতে থাকে। চিরস্বাস্থ্যভোগীর সামান্য একটা মাথাধরা যেমন, ইহাও ঠিক তেমনি। এই বোধবিকাশ না হইলে প্রায়শ্চিত্তই বল, আর দণ্ডই বল, তাহার কোন মানে নাই। যে পাপের দণ্ড পায়, সে বড় সৌভাগ্যশালী। অনুতাপের প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বর্গীয় নবজন্মের প্রসব বেদনা। সেই জন্য, অনুতপ্ত পাপীরা ধন্য! কেন না, তাহারা অচিরে স্বর্গে যাইবে। আর পাপের দণ্ডভোগের প্রণালীর কথা যাহা বলিতেছিলে, তাহার উত্তর এই, পাপ আপনিই আপনার দণ্ড। নরকভোগ কিম্বা অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত যাহা কিছু সমস্তই আন্তরিক, বাহ্যিক নহে। দৈহিক রোগযন্ত্রণা পাপবোধের উপলক্ষ হইতে পারে, নাও পারে; বরং অনেক স্থলে শারীরিক দণ্ড অবমাননা পাপীকে আরও মহাপাপী করিয়া তোলে। এই নিমিত্ত ন্যায়বান্ বিচারপতি পরমেশ্বর পাপীর

উদ্ধারের জন্য তাহাকে লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত করেন। তাঁহার উদার প্রেম, মঙ্গল সঙ্কল্প দেখিয়া পাপী যখন বড় সঙ্কুচিত এবং ক্ষুব্ধ হয়, তখনই অনুতাপে সে কাঁদে এবং আত্মগ্লানিতে জ্বলিয়া মরে। কিন্তু এই যন্ত্রণার ভিতর শান্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়। দেখ বিধাতার কেমন মঙ্গল কৌশল! মনুষ্যাত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া দ্বিজাত্মারূপে পুণ্যপথে দিন দিন অগ্রসর হইবে, পশুত্ব এবং মনুষ্যত্ব পরিহারপূর্ব্বক সে দেবশ্রী ধারণ করিবে, ইহারই জন্য পাপের দণ্ড; দণ্ডের জন্য দণ্ড নহে। রোগ বিনাশের জন্যই ঔষধের প্রয়োজন, বৃদ্ধির জন্য নহে।

আমি। তবে পৃথিবীর লোকেরা কথায় কথায় "অনুতপ্ত হও, অনুতাপ করা উচিত, নরকে পচ্‌বি" ইত্যাদি কথা বলে কেন? আপনি যে পাপের দণ্ডের কথা বলিলেন, ইহা ত স্বর্গলাভের উপায়; তবে আর দণ্ড কি হইল?

বাণী। ওহে বাপু, তোমাদের পৃথিবীর যে প্রচলিত ব্যবহার শাস্ত্র, তাহার ভিতর অনেক কবিত্ব কল্পনা আছে, এবং তাহা ব্যাখ্যাকারদিগের দোষে বিকৃতাকারে লোকের নিকট প্রকটিত হয়; অনেকের আবার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিবারও ক্ষমতা অতি কম। কাজেই অনুতাপ করিবার জন্য তাহারা লোককে ধমক দিবে না কেন? কিন্তু তাহারা যদি জানিত যে, অনুতাপ করিতে বলা আর স্বর্গে পাঠান সমান; তাহা হইলে বলিত, "মর ব্যাটা পাপে ডুবে মর!" এ সব কি তা জান, তোমাদের দেশের লোকেরা এই রূপে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। অপরাধী বলিলেন, "আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি।" দণ্ডদাতা গুরুদেব বলিলেন, "তুমি ক্ষমা পাইলে।" কেহ অনুতাপ করাইলেন, কেহ বা তাহা করিয়া কাগজে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। অথচ যিনি যেমন অবস্থায় ছিলেন, তেমনি রহিয়া গেলেন। এ সকল কেবল কাজ চালানো পলিটীকো ধর্ম্মশাস্ত্র। পিনালকোডের দণ্ডবিধি। অনুতপ্ত হইলেত মানুষ বাঁচিয়া যায়। ক্যান্সার রোগে পূয, বায়ুরোগে জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধরোগে ভেদ, অম্লরোগে বমন কি স্বাস্থ্যের কারণ নহে? মহাযোগী যিশু পরের পাপের জন্য আপনি কাঁদিতেন, জান ত? আর ভিরুশীস্বভাব ধর্ম্মাভিমানীরা পাপীদের পাপের কথা লইয়া আমোদ করে, নানা রঙ্গে তাহা কাগজে লেখে। ঈদৃশ প্রকৃতির লোকেরাই বলে, "তুমি অনুতাপ কর! ক্ষমা প্রার্থনা কর!" পরে সেই পাপী যাই তাহাদের অনুগত বাধ্য হইল, অমনি সে সাধুদলে মিশিয়া গেল।

তখন তাঁহার সাত খুন মাপ। অতএব তোমাদের দেশের বিকৃত ধর্ম্মব্যবহারের কথা আর বলিও না।

আমি। মহাশয়, যদি অনুমতি করেন, তবে আর একটী বিষয় আমার জানিবার জন্য বড় কৌতূহল হইতেছে। কেবল আমার নয়, অনেকেই ইহা জানিতে চায়। কথাটী এই যে, যে সকল লোক অপরাবিদ্যা এবং বিষয়-বুদ্ধিতে খুব সুনিপুণ, কার্য্যদক্ষ, জ্ঞান অর্থ পরিশ্রম দ্বারা পৃথিবীতে যাঁহারা ভূরি ভূরি হিতানুষ্ঠানও করিয়াছেন, কিন্তু ভগবানের নাম এক বার মুখে আনেন নাই, তাঁহাকে মান্য ভক্তি করেন নাই; এমন কি, হয়তো তাঁহার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত সন্দেহ নিন্দাবাদ করিয়াছেন; ঈদৃশ অগণ্য অসংখ্য সুসভ্য বিদ্বান্ যশস্বী ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের আত্মা সকল এখানে কি অবস্থায় কোথায় আছে? আর যে সমস্ত অর্দ্ধসভ্য অসভ্য অশিক্ষিত নরনারীর আত্মা পরমাত্মা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ না করিয়া, কেবল দেহগর্দ্দভের সেবায় সারা জীবন কাটাইয়া এখানে আসিয়াছে তাহারাইবা এক্ষণে কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত? তদ্ব্যতীত জন্মজড়, জন্মান্ধ বধির মূক ব্যাধিগ্রস্ত, কিম্বা অকালে মৃত শিশু বালক, অজ্ঞান তরুণ যুবক যাহারা, তাহাদেরই বা পরিণামে কি দশা হইল? এই সকল বিষয় যদি আমার জানিবার অধিকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার ঔৎসুক্য চরিতার্থ করুন।

বাণী। এ সম্বন্ধে তোমার এখনো সম্যক অধিকার জন্মে নাই। তথাপি যাহা যাহা বলি বিশ্বাস করিয়া যাও; পরে তোমার বিশ্বাসে দিব্যজ্ঞান সংযুক্ত করা হইবে।

প্রথমতঃ জ্ঞানী সভ্য ধনী জনহিতৈষী, অথচ আত্মতত্বানুভিজ্ঞ ভগবদ্ভক্তি-বিহীন নাস্তিকবৎ যাহারা তাহারাও ভগবল্লীলার সহায় হইয়া ভবে জন্মিয়াছিল, ইহাদিগকে তাঁহার বিভূতির মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। কারণ, ইহারা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারার ন্যায় প্রভাবশালী; সমুদ্র পর্ব্বত অগ্নি বায়ু এবং শস্যক্ষেত্রের ন্যায় পরমোপকারী। কেবল তাহাই নয়, এ তদপেক্ষা ইহারা বুদ্ধিমান উচ্চশ্রেণীর সৃষ্ট পদার্থ। জড় বস্তুর এবং পার্থিব বাসনার বিচিত্র বিমিশ্রণে যে উন্নত প্রখর মনোবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয় ইহারা তাহাই; এ তত্ব ইহারা নিজেই আবিষ্কার করিয়া আপনার মুখে স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। বিষয়বুদ্ধি, বৈষয়িক নীতি, আর পশু-প্রবৃত্তি ছাড়া এরূপ জীবনের আর অন্য কোন আধ্যাত্মিক উন্নতি

হয় নাই। সুতরাং তাহারা উন্নত অনাত্ম জীবশ্রেণীভুক্ত। ফুল ফল এবং পশু পক্ষীদের যেমন কোন ব্যক্তিত্ব নাই, তাহারাও তেমনি ব্যক্তিত্ববিহীন; এ সিদ্ধান্ত তাঁহারা নিজেই স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা উন্নত শ্রেণীর সুন্দর জীব। ইহার মধ্যে অনেকে এমন ছিলেন যাঁহাদের দয়া সৌজন্য ন্যায়পরতা সত্যপ্রিয়তা সারল্য সততা স্বভাবতঃ অতি প্রবল এবং বিকাশশীল। আত্মা পরমাত্মা বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেও এ সকলকে আধ্যাত্মিক প্রচ্ছন্ন গুণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে স্বভাবের অলজ্ঘ্য নিয়মে ইহা পরমাত্মার অভিমুখেই অলক্ষিত ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। এ সকল শৈশবাত্মা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাঁহাদের এখন সজ্ঞান আধ্যাত্মিক উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু উপরে উঠিবার এখনও অনেক বিলম্ব। মনুষ্যাত্মা অমর, সে বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হইলেও কখন ধ্বংস হইবার নহে। ফুল ফল উদ্ভিদ্ পশুদিগের এবং একটী জড় পরমাণু কণারও যখন ধ্বংস নাই, তখন বিলুপ্তের সম্ভাবনা কোথায়? তবে জড়বাদী দেহসর্ব্বস্ব মনুষ্যগণ না কি এক প্রকার ব্যক্তিত্ববিহীন আত্মার অন্তর্গত, এই জন্য শৈশবাত্মাদিগের শ্রেণীতে তাঁহাদিগকে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। একটি দুঃখের বিষয় এই, যে এ সকল জীবের বিদ্যা সম্পদ মান সম্ভ্রম এবং বিষয়বুদ্ধি আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি বড়ই শত্রুতা সাধন করিয়াছিল। সেই জন্য উহাদিগকে এখন আবার ক খ হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। পৃথিবীর অনেক উচ্চ বিষয় এখানে অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত। যাহা বহু যত্নে শিখা হইয়াছিল তাহাও ভুলিয়া যাইতে হইবে। অনেকই বাদ যায়, অল্প কিঞ্চিৎ অর্থাৎ কেবল শাদা অস্তিত্ব—আত্মার প্রোটোপ্লাজম্ টুকু থাকে।

"বাণীর কথা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ বড়ই ব্যথিত হইল। পৃথিবীতে যাঁহাদিগের নিকট আমরা অগ্রসর হইতে পারিতাম না, এমন সকল সম্ভ্রান্ত উচ্চ পদস্থ জ্ঞানী ব্যক্তির এত দিনের বিদ্যা বুদ্ধি হিতানুষ্ঠান ধন মান সৌভাগ্যের কি এখানে কিছুই মূল্য নাই? হায় কি কঠিন ঠাঁই! বিধাতার বিচার কি নির্ম্মম নিরপেক্ষ! পঞ্চাশ ষাঠ সত্তর আশি বৎসরের জীবন শেষ কি না একটী শূন্যে পর্য্যবসিত! ভারি আক্ষেপের বিষয়। এ সংবাদ পৃথিবীর কৃতবিদ্য বড় লোকদিগের কাণে গিয়া যদি পৌঁছে, তাহা হইলে না জানি কত রাজা রাজপুত্র, ধনী সওদাগরপুত্র, কত পাত্রের পুত্র, কত কত উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত নরনারী মনের দুঃখে উদাসী সন্ন্যাসী হইয়া বনে চলিয়া

যাইবে! আহা তাহাদের পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভাই ভগ্নীরা সে জন্য হয়তো কতই কাঁদিবেন, শোক করিবেন!”

“বাণী আমার আন্তরিক ভাব জানিতে পারিয়া হাস্যস্বরে বলিলেন, সে জন্য তোমায় আর এত খেদ করিতে হইবে না। কেহ বনেও যাবে না, কেহ কাঁদিবেও না। তাহাদের পরিণাম কি, তাহারা তাহা বেশ জানে; মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিয়াছে, মরণের সঙ্গে সঙ্গে সব ফুরাইয়া যাইবে। যে বৈরাগ্যের আশঙ্কায় তুমি দুঃখিত হইতেছ, তাহা অপেক্ষা তাহাদের বৈরাগ্য অনেক বেশী। একবারে নির্ব্বাণ, মহাবিনাশ! আদৌ তাহারা পরকাল চায় না, তুমি কেন তবে তাহাদিগকে এখানে আনিবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছ? বিধাতার বিচারে যাহা ঠিক তাহাই হইবে, সে জন্য আর ভাবিও না। তিনি যাহাকে যেরূপে গড়িয়াছেন, আত্মঘাতী মনুষ্য তাহা বিনাশ করিতে পারিবে না। তবে কাহার দ্বারা তিনি কি কাজ করাইয়া লইতে চান তাহা কেবল তিনিই জানেন। সকলের তাহা জানিবার দরকার নাই।” পরে তিনি বলিলেন, “হে আত্মারাম, তুমি কি তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিতে চাও? আচ্ছা, তবে আমার পশ্চাৎ অনুসরণ কর।”

“বাণী এই কথা বলিয়া আমাকে এক ঘোর অন্ধকারময় স্থানে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে ভয় এবং দুঃখে আমাকে নিতান্ত অভিভূত করিয়া ফেলিল। কর্ম্মফলের পূর্ণ পরিণতি যেন চিত্রপটের ন্যায় এখানে অঙ্কিত রহিয়াছে। “যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি ভবতি তাদৃশী” ইহা অতিশয় সত্য কথা। পৃথিবীর যত যত যশস্বী ধনী সুসভ্য জ্ঞানী আত্মাগণ ঘোরান্ধকারে পড়িয়া পার্থিব বিষয় সকলের অভাবে এবং আত্মপ্রকৃতির বিকৃতিজন্য এখানে যে কি কষ্ট পাইতেছে তাহা আর বলিয়া উঠা যায় না। ধরাতলে যিনি যে বিষয়ে অনুরক্ত আসক্ত ছিলেন এখানে তিনি তত্তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তজ্জন্য লজ্জা অনুতাপ আত্মগ্লানি, তৎসঙ্গে অস্থিরতা অশান্তির আর ইয়ত্তা নাই। পৃথিবীতে অবস্থানকালীন ইহাদের আত্মার যথার্থ মূর্ত্তি কিছুই দেখা যাইত না। গোপনে গোপনে কে কি ভাবিত, কি চাহিত তাহা কে জানিবে? বাহিরে দিব্য আতর গোলাপ সেণ্ট-মাখা সুসজ্জিত শরীর, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অসার বিষয় ভোগ এবং কুচিন্তা করিয়া ইহারা অতিশয় বিকট বীভৎস রূপ ধরিয়াছিল; এখন আবরণ উন্মুক্ত হওয়াতে সেই গুপ্ত বিকৃত প্রকৃতি বাহির হইয়া পড়িয়াছে; ঢাকিবার আর

যো নাই। কি লজ্জা! পাপের পচা দুর্গন্ধ কাছে যাওয়া যায় না। যেমন আম মালাই আনারস লেবু ইত্যাদি বস্তু দ্বারা বরফের কুল্পি, কিম্বা নানাবিধ পুষ্পগন্ধে সাবান প্রস্তুত হয়, তেমনি ষড়রিপুর সংঘর্ষণে ঐ সকল আত্মা তত্তৎ গুণ এবং আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। দেখিয়া আমার মনে হইল, সভ্যতার সুবাসিত সুসজ্জিত ভদ্র মূর্ত্তি এবং সাধু ভাষা কি প্রবঞ্চক! ভিতরে স্বার্থ লোভ ক্রোধ অহঙ্কার হিংসা কুটিলতার দুর্গন্ধময় নরক, কালকূট সর্প বৃশ্চিক এবং শ্বাপদ জন্তু ও পিশাচ দানব সদৃশ রিপু ছয়টীর বিহার স্থান, আর উপরে এত সৌন্দর্য্য সৌগন্ধ! এত দিন ইহা চাপা ছিল, যথাসময়ে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানের অলঙ্ঘ্য শাসনের ইহা প্রত্যক্ষ ফল। যে কারণের যে কার্য্য তাহা হইবেই হইবে।"

"বাণী আমাকে জ্ঞানালোক ধরিয়া সমস্ত দেখাইতে লাগিলেন। দেখিলাম, কেহ মদ্য মাংস প্রভৃতি পঞ্চ মকারে পরিণত; কেহ ধন মান অট্টালিকা, কেহ বিলাতি এবং স্বদেশীয় বিলাস দ্রব্যে পরিণত। এক দল আত্মা টাকা নোট কোম্পানির কাগজের মূর্ত্তি ধরিয়া বসিয়া আছে। অহঙ্কারী অভিমানীদের আত্মার মূর্ত্তি দেখিলে হাসি পায়। কেহ ঘোড়া কেহ কুকুর, কেহ বাগান, কেহ আফিসের হিসাব, কেহ গাড়ী, কেহ ষ্টীমার, কেহ ট্রেন, কেহ ভূষিমাল, কেহ পোষাক, কেহ গহনা, যে যাহা ভাল বাসিত এবং সর্ব্বদা ভাবিত চিন্তা করিত, সে ঠিক সেই রূপে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ ঠিক যেন পরমাণুসমষ্টি। অপর এক দল কেবল Abstract Ideas, আর এক দল Wild Theory। দালালেরা হাট বাজার ব্যাঙ্ক, উকিল মোক্তার হাকিমগণ বাদী প্রতিবাদী সাক্ষীরূপী, আবার তাহারা উকিল মোক্তার হাকিম্ রূপধারী। ডাক্তারগণ রোগী আর ভিজিট ভাবিতে ভাবিতে তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজা মহারাজা সওদাগর রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রীরা বাউণ্ডেরি পিলারে, যোদ্ধাগণ বারুদ কামান তলোয়ারে, ইঞ্জিনিয়ারেরা কলকারখানায় পরিণত। রাণী মহারাণী লেডীরা রেসম পশম হীরা পান্না ভাবিতে ভাবিতে কেহ গুটিপোকা, কেহ মূল্যবান্ প্রস্তর অথবা ধাতুর আকার পাইয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লুচি মণ্ডা এবং ভূজ্জির রূপ ধরিয়াছেন। আর সাধারণ স্ত্রীজাতি, কেহ ঘটী বাটি, কেহ ধামা কুলো খুচ্‌নি; কেহ হাঁড়ি সরা হাতা বেড়ী উনোন অর্থাৎ চুলো; কেহ কাপড়ের তোড়ঙ্গ, কেহ গহনার বাক্স, কেহ পুত্র কন্যার দেহপুত্তলিকায়

পরিণত। গ্রন্থকার কিম্বা সংবাদপত্রের লেখকগণ পাইকা স্মল পাইকার মত। কেরাণী বাবুরা বাক্স ডেস্করূপে, ইংরাজেরা ঘোড়া কুকুর বোতল গেলাস রূপে, শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক হ্যাটকোট কাঁটা চামচরূপে পরিণত হইয়াছে। ঠিক যেন পৃথিবীর নানা ছাঁচে ঢালা এই সকল আত্মা। যাঁহাদের অসার ভয় ভাবনাতে সমস্ত জীবন অতীত হইয়াছিল, তাঁহাদের অবস্থা যেন পাগলের মত। যিনি লোভে অন্ধ হইয়া আশার পশ্চাতে ধাবিত হইতেন, তাঁহার সে আশাও মিটে নাই, অথচ জীবনটী ফুরাইয়া গিয়াছে; শেষ হিসাবে ঠিক দিয়া দেখেন যে তিনি একটী আশালোলুপ কুক্কুর বিশেষ। ক্রোধী হইয়াছে রাক্ষস, হিংস্রক সর্পের ন্যায়, আর কত বলিব? ইহলোকে যে যাহা অধিক ভাবিত, চিন্তা করিত, কাজে তাহা বাহিরে অনুষ্ঠিত হউক বা না হউক, প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে সে তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে; পরলোকে আসিয়া এত দিনে তাহা জানিতে পারিল। বিজ্ঞানবিদেরা যে বলেন, সামান্য একটী চিন্তা কি অভিপ্রায়ও নিষ্ফলে বিনষ্ট হয় না; এখানে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গোপনে কে কবে একাকী কুচিন্তা কুকল্পনা কুমন্ত্রণা করিয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাস জীবন-চরিতে যাহার চিহ্নমাত্র নাই; তাহার নিজেরও কিছু মনে নাই, অথচ তাহা সূক্ষ্ম অদৃশ্য উপাদান স্বরূপ হইয়া ভিতরে ভিতরে চরিত্রকে তদনুরূপ ছাঁচে ঢালিয়া তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে। স্বভাবের অখণ্ড নিয়ম।”

“এখানে আসিয়া ইহারা এখন সকলেই বড় বিড়ম্বনাগ্রস্ত। টাকা গহনা পোষাক গাড়ী বাড়ী উত্তম খাদ্য আমোদ বিলাস ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব মান কাহার না ভাল লাগে? কিন্তু নিজ স্বরূপত্বে বঞ্চিত হইয়া তাহাদিগের আকারে পরিণত হইতে কি কাহারও সাধ হয়? হউক, আর না হউক, কর্ম্মফলে অজ্ঞাতসারে সকলকে সেই রূপ করিয়া তুলিয়াছে। মদ্য মাংস, লুচি মণ্ডা, গহনা কাপড় বাড়ী ঘরে আসক্তি জন্মিলে যে ক্রমে মনুষ্যকে তত্তৎ স্বরূপে পরিণত হইতে হইবে, এ কথা অনেকেই অবগত নহেন; অথচ ভিতরে ভিতরে এই রূপ ঘটিয়া থাকে। বিধাতার কি সূক্ষ্ম বিচার! তাঁহার শাসনকৌশলের কার্য্যপ্রণালী দেখিলে হাসি পায়। গরিব বেচারী সখ করিয়া দিন কয়েক কোন বস্তু ভোগ করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে কি সে জন্য একবারে তৎ-স্বরূপে পরিণত করা উচিত? এটা বড় আক্ষেপের কথা। তাই বুঝি লোকে বলে, “কমলি ছোড়তা নেহি।” বস্তুতঃ মদ্যপ যদি শেষ দ

ছাড়ে, তথাপি মদ তাকে ছাড়িতে চায় না; পরিণামে সে মদ্যপায়ীকে পান করে। বড়ই কৌতুকের বিষয়। কিন্তু বড় লাঞ্ছনা। নিজ নিজ আসক্তির ভোগ্য বিষয়ে পরিণতাবস্থা পরিহারপূর্ব্বক স্বীয় স্বভাব প্রাপ্তির জন্য এক্ষণে সকলে যেন ছটফট করিতেছেন। ভোগী এবং ভোগ্য উভয়ই এখন অসহ্য ভারবহ। বিলাসাসক্তি গুল যেন সাপ ব্যাং ছুচো ইন্দুর বিছে জোঁক কেন্নায়ের মত সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! ইহাদের হাহাকার আর্ত্তনাদে সেই ভীষণ অন্ধকারময় প্রদেশ আরও যেন ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছিল।”

বাণী বলিলেন, “বিশ্বনিয়ন্তার কেমন অলঙ্ঘ্য শাসন, সূক্ষ্ম বিচার দেখিলে? তিনি রাগেনও না, কাহাকে দণ্ডও করেন না, কর্ম্ম আপনিই এ সব করে; ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা জীব নিজেই। অবশ্য মূলে তিনি নটের গুরু; কিন্তু লীলা খেলাটা এই রূপ। বালক যদি আগুনের সঙ্গে খেলা করিতে যায়, তাহার কি হাত পুড়িবে না? এবং সে জন্য কি সে কাঁদিবে না? কিন্তু ভবিষ্যতে আর সে তেমন কায করিবে না। আবার ঐ পার্শ্বে চাহিয়া দেখ, সৎপ্রবৃত্তির অনুশীলনের কি সুফল! উহাদের বহু বৎসরের পাপ অপরাধ জীবনের অধোদেশে পচিয়া সার হইয়া গিয়াছে, তাহা এখন তরুণ ধর্ম্মবৃক্ষের পরিপোষক। ইচ্ছার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিলে অধর্ম্ম পাপও অমরত্বের সহায় হয়।”

আমি বলিলাম, “প্রভো, ভয়ে দুঃখে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, আর আমি এ দৃশ্য দেখিতে পারি না, শীঘ্র আপনি আমাকে এ স্থান হইতে লইয়া চলুন।” পরে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বাণীর ইঙ্গিতানুসারে আমি অন্য এক অবস্থায় গিয়া উপনীত হইলাম। অনন্তর তিনি বলিতে লাগিলেন;—

“অন্যান্য অর্দ্ধসভ্য অসভ্য মায়াবদ্ধ জীবের বিষয় যাহা তুমি জানিতে চাহিয়াছিলে তাহাদের মধ্যে অনেকে এখানে আসিয়া তোমার অগ্রবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাদের পাঠ ভিতরে ভিতরে লোকের অজ্ঞাতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। এমন কি, যে সকল বড় লোক তাহাদিগকে নিকৃষ্ট জানিয়া ঘৃণা করিতেন, তাঁহারা এখন তাহাদের কত নীচে গিয়া পড়িয়াছেন! সরল ইচ্ছা, সাধু অভিপ্রায়, যথাসাধ্য চেষ্টা দেখিয়া এখানে বিচার হয়, গুণ জ্ঞান বা কার্য্যের প্রাচুর্য্য ধরিয়া নহে। আপাতদৃষ্টিতে পশুর ন্যায় যাহাদিগকে প্রতীয়মান হয় এবং জন্মান্ধ জড় মূক বা অকালে মৃত শিশু

বালক যাহারা; মরণান্তে ইহাদের সকলের কি অবস্থা ঘটে, তাহা যদি বুঝিতে চাও, তবে অনন্তের দুর্ব্বিগাহ্য লীলার বিষয় অনুধাবন কর। অনেকের ব্যক্তিত্ব অদৃশ্যভাবে তাঁহার লীলার সহায়তা করিতেছে। একটা ফলে সহস্র গণ্ডা বীজ, এক জীব হইতে সহস্র সহস্র জীব কেন হয়, তাহারা কোথায় যায়, কি কাজে লাগে, তাহা কেবল লীলাময়ই জানেন। তাঁহার লীলার রঙ্গভূমিতে জ্ঞানী পণ্ডিত এবং যোগীরা স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া ভূত পেত্নী পাপ-পুরুষের বেশে অভিনয় করেন। এই ভাবে কত ঋষি মুনি আপনাদের নাম ধাম পরিচয় না দিয়া সত্যশাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। একের ভিতর অনন্ত কোটী জীবের জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় এবং রূপান্তর হইতেছে। অনন্ত কার্য্য-কারণের শেষ ফল মানুষ দেখিতে পায় না। সে কেবল বর্ত্তমান দেখিয়া ভ্রমে পড়ে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

"পরলোকসম্বন্ধে আমার যাহা কিছু জানিবার ইচ্ছা ছিল, একে একে তৎসমুদায় আমি বাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি তাহার উত্তরও বেশ পরিষ্কার ভাষায় দিয়াছিলেন। বাণীর সিদ্ধান্তগুলিতে যদিও আমার পূর্ব্বপোষিত কৌতূহল চরিতার্থ হইল না বটে, (তাহা হইবার নয়) এবং তজ্জন্য আমি পদে পদে অপ্রস্তুত এবং নিরাশ হইয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত যে অকাট্য, বিশ্বাসযোগ্য এবং সুসঙ্গত তাহাতে আর আমার কোন সন্দেহ রহিল না। সুতরাং আমি তাঁহার কোন কথায় দ্বিরুক্তি করিতে পারি নাই। করিবার প্রয়োজনও বোধ হয় নাই। কত দূর আমার এ বিষয়ে অধিকার, অনধিকারচর্চ্চাই বা কোন্ খানে, তাহাও তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। তাহাতে আমার আশা পরিতৃপ্ত হইল, বিশ্বাস বাড়িল।"

"একটী বিষয়ে আমার প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কার দূর হইতে অনেক দিন লাগিয়াছে। অর্থাৎ এখানকার বিষয় পূর্ব্বে যাহা কিছু ভাবিতাম, সমস্তই সাকারভাবে। কেন না, তদ্ভিন্ন কোন বিষয় মানুষের ধারণা হয় না। যদিও সে সকল ভাব অতি সুন্দর সূক্ষ্ম মধুর পবিত্র এবং কবিত্ব-রসসিক্ত হৃদয়ানন্দকর এবং চিত্তবিনোদন, কিন্তু সাকার; কাজেই নিরাকার আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সঙ্গে কিছুতেই তাহা মিলান যায় না। উপমার সাহায্যে ভাবের উদয় হয় সত্য, তথাপি বস্তুতঃ সাকার নিরাকার দুয়ে মূলগত

গভীর প্রভেদ। যাহা বুঝা যায়, তাহা বুঝান যায় না। এ দেশে কেহ কাহারো নিকট বুঝেও না; প্রতি জনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুঝিয়া লয়, প্রত্যক্ষ ভাবে অব্যবধানে জ্ঞানামৃত আস্বাদন করে। ইহা (Subjective assimilation)—এর রাজ্য। এখানে আত্মজ্ঞানগত সহানুভূতির একত্ব।"

"যাঁহারা পরকাল আর স্বর্গ দুই এক মনে করিয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদের ভয়ানক ভ্রম। প্রথমে আমাকেও সেই ভ্রমে পড়িতে হইয়াছিল। শেষ বাণীর উপদেশে তাহা চলিয়া যায়। পরকাল একটী আধ্যাত্মিক অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ চিন্ময় রাজ্যে সমস্তই কেবল চৈতন্যের ব্যাপার। পুনর্মিলন অর্থাৎ আত্মীয় প্রিয়জনের সহিত এখানে আসিয়া পুনর্ব্বার দেখা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে একটি বাসনামূলক মত পৃথিবীতে প্রচলিত আছে তাহাও বহুপরিমাণে ভ্রমাত্মক এবং ক্ষণিক ভাবোদ্গমের পরিচায়ক। তবে কি তাহাদিগকে কেহ দেখিতে পাইবে না? আমি বলি, দেখিতে চায় কয় জন? এবং কি ভাবে? প্রথম প্রথম শোকোচ্ছ্বাসে অনেকে শারীরিক বিরহযন্ত্রণা অনুভব করে, এবং তজ্জন্য পরলোকগত আত্মীয় জনের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইতে চায়, কিন্তু শেষ ক্রমে ক্রমে বিষ্ণুমায়ায় সব ভুলিয়া যায়। অল্প, অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সে জন্য ব্যাকুলিত থাকে। দৈহিক পুনর্ম্মিলনের ভাবই অনেকের মনে জাগে, কিন্তু বিদেহ রাজ্যে সে আশা বৃথা। যথার্থ মিলন,—আধ্যাত্মিক নিত্য সম্বন্ধের মিলনে ইহ পরলোকে কোথাও বিচ্ছেদ নাই। দেহের অদর্শনজন্য যে বিচ্ছেদ তাহা সেই মিলনকে ঘনীভূত অন্তর্ভূত হৃদ্গত করিয়া উভয়কে অভেদত্বে পরিণত করে।"

"আমার পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনেক অনুশীলন ছিল ব[illegible] একটু সুবিধা হইল; তথাপি অনেক ঘোল খাইতে হইয়াছে। [illegible]রা আদৌ এ বিষয়ে অন্ধ, তাঁহাদিগকে পুনরায় হাতে খড়ি দিতে হইবে। এমন কি, যে সকল ব্যক্তি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া বিবিধ যাগ যজ্ঞ হিতানুষ্ঠান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পৃথিবীর লোকের অনেক উপকারও হইয়াছে; তাঁহাদেরও অধিকাংশ সৎকার্য্য কোন কাজে আসিবে না। কারণ, তাঁহারা "আমি করিলাম" এই অহংজ্ঞানে অপরাধী। ফলাকাঙ্ক্ষী ধনাভিমানীদের ত কথাই নাই। তাঁহাদের অনেক মত, বিশ্বাস এখানে ভ্রান্তিরূপে প্রকাশ পাইবে। মৃত্যু যেমন জীবনের সমস্ত পুরাতন বন্দোবস্ত ওলট পালট করিয়া দেয়, পরকালের শিক্ষা তেমনি অভূতপূর্ব্ব অভাবনীয় অনির্ব্বচনীয়। কবিত্ব

কল্পনা উপমা তুলনা দ্বারা যতই কেন তাহা চিত্রিত করা হউক না, তাহার উপলব্ধি আর এক প্রকার। কিন্তু এক বার তাহাতে যে মজে, সে অনন্ত আনন্দে পুলকিত হয়, এবং নবরসের রসিক ভগবান্ সচ্চিদানন্দের অনন্ত ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করে।"

"আমি ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক জীবন ব্যবহারে অভ্যস্ত হইতে লাগিলাম, অল্পে অল্পে এখানকার শিক্ষা আমার আয়ত্ত হইয়া আসিল। তথাপি ইচ্ছা যে স্পষ্টরূপে সমস্ত দেখি শুনি। এ রাজ্যের যত কিছু শিক্ষা উন্নতি সম্ভোগ সমস্তই যোগের ভিতর দিয়া। অর্থাৎ অব্যবধানে সুগভীর সুনির্ম্মল ব্রহ্ম-দর্পণের ভিতর দিয়া। প্রত্যাদেশ বলিয়া যাহা মনুষ্যলোকে প্রচলিত তাহাই এখানকার শিক্ষার একমাত্র প্রণালী।"

"পরলোকে আসিয়া প্রথমে যে এক অপূর্ব্ব তুষার ধবলাকৃতি শ্বেত সৌধমালাসদৃশ মনোহর দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, এবং স্বর্গ বলিয়া যাহা জ্ঞান হইয়াছিল, সেটা কি? এবং কত দূরে? এখনো কি আমি তাহার নিকটবর্ত্তী হই নাই? যোগী ঋষি ভক্ত অমরাত্মা মহাজনগণই বা কোথায় কি ভাবে আছেন? তাঁহারা এখন কি করেন? মর্ত্ত্যলীলা শেষ করিয়া তাঁহারা কত হাজার হাজার বৎসর হইল এখানে আসিয়াছেন, না জানি এখন তাঁহাদের যোগ ভক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের কতই উন্নতি হইয়াছে! সে সকল মহাত্মাদিগের সঙ্গে মিলনের উপায় কি? তাঁহারা অগ্রসর হইয়া নিকটে আসিবেন? না আমাকে তাঁহাদের নিকট যাইতে হইবে? শুনেছি, এখানে প্রেমিক অমর-বৃন্দের না কি এক আনন্দের নববৃন্দাবন আছে? সেখানে না কি তাঁহারা সকলে একহৃদয় একাত্মা হইয়া শ্রীহরির সঙ্গে নানা প্রকার লীলা করেন? হায়! কবে আমি মধুর নববৃন্দাবন দেখিব! যথায় দেবদেবীগণ সচ্চিদানন্দ-ঘন যুগলরূপের তরঙ্গলহরীতে ডুবিয়া নৃত্য গীতে সর্ব্বদা মত্ত থাকেন, আমি কি সেখানে একটু স্থান পাব? স্থান যদি না পাই, সে শোভা যদি একটী বার প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাই, তাহা হইলেও কৃতার্থ হই। অতঃপর শ্রীনববৃন্দা-বনের দর্শনলালসায় প্রাণ আমার নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। হৃদয়াবেগ বশতঃ ক্ষণ কাল নীরবে একাকী বসিয়া কাঁদিলাম, কাতরান্তরে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলাম, পরে শ্রান্ত অবসন্ন চিত্তে ঔদাস্যভাবে কীর্ত্তনের এই গানটী গাইলাম।

(লোফা) "কবে যাব নববৃন্দাবন। (প্রাণসখা হে)

হলো পরিশ্রান্ত ক্লান্ত এ জীবন।

যুগল মূরতি, পুরুষ প্রকৃতি, একাধারে করিব দর্শন।

যেখানে অমরবৃন্দ ভক্তপরিবার, ব্রহ্মানন্দে সদানন্দে করেন বিহার। (হরিপদতলে রে) নাহি যথা হিংসা নিন্দা বিবাদ বিচ্ছেদ, ঘটে ঘটে চিদানন্দ অখণ্ড অভেদ। (কিবা শোভা মরিরে;—নববৃন্দাবনে)

(দশকুশী) মিশে হরিভক্তদলে, প্রেমযমুনাজলে, কবে আমি খেলিব সাঁতার; (হরি হরি বলে হে;—স্রোতে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে)—(প্রেমানন্দে নেচে নেচে) গেয়ে হরিনামের সারি, ভেসে যাব সারি সারি, নানা রঙ্গে করিব বিহার। (নব নব রসেরে;—ভক্তসঙ্গে প্রেমতরঙ্গে)—(ধরি সবে গলে গলে)

মাতি মহামহোল্লাসে, প্রেম আলিঙ্গন পাশে, বুকে চেপে ধরিব সকলে; (আয় ভাই বলেরে;—জুড়াব হৃদয়জ্বালা) মিলে সবে প্রাণে প্রাণে, হরিপ্রেমামৃত পানে, হাসিব আনন্দকোলাহলে। (মহাভাবরসে গলে)

(খয়রা) কভু যোগভরে, ভিতরে ভিতরে ডুবিয়া শান্তির জলে;—নীরবে একাকী বসিয়া রহিব অনন্তের শান্তিকোলে (ধ্যানে মগ্ন হয়ে;—

(চিদানন্দরসে) আবার হুঙ্কার রবে উঠে হরি বলে, নাচিব দুবাহু তুলে; (ব্রজের পথে পথে, কুঞ্জে কুঞ্জে দ্বারে দ্বারে) ভক্তপদে পড়ি দিব গড়াগড়ি, আপনারে যাব ভুলে। (নবলীলারসে)

(লোফা) কবে মহাযোগে—যোগে লয় হয়ে, মহাভাবে রহিব মজিয়ে হে। (দয়াময় হরি;—তুমি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু)"

"সঙ্কীর্ত্তনের প্রেমমিশ্র শান্তিরসে আমার চিত্ত বড়ই আরাম সম্ভোগ করিল। যোগ-ভক্তি উভয় সুরের বেশ জমাট বাঁধিয়া গেল। নির্জ্জন তটিনীতটে গভীরা যামিনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে একাকী দেবমন্দিরের রোয়াকে বসিয়া কেহ সেতারের স্বরলহরীর ঝঙ্কার করিলে যেমন তাহা মধুর বোধ হয়, আমার হৃদয়ের অনুরাগ এবং প্রেমাবেশের তার তেমনি মধুর স্বরে বাজিতে লাগিল। তখন সেই সুরে সুর মিলাইয়া বাণী কহিলেন, "তোমাকে যে সঙ্কেত শিখাইয়া দিয়াছি তাহা দ্বারাই সমস্ত আশা পিপাসা চরিতার্থ হইবে। তুমি ব্রহ্মযোগের গভীরতার মধ্যে আরো প্রবেশ কর, দিব্যজ্ঞানালোকে তাবৎ বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।"

"তদনন্তর আমাদের উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে প্রশ্ন উত্তর হইল।"

প্র। পূর্ব্বে আমি যে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা আর কত দূর? আমি কি এখনও সেই অমরালয়ের সমীপবর্ত্তী হই নাই?

উ। প্রথমে তুমি এখানে আসিয়া যাহা দেখিয়াছ, তাহাতে একটু দৃষ্টি-ভ্রম ছিল। তখন তোমার দৃষ্টিশক্তি পার্থিব সংস্কারবিমুক্ত হয় নাই। এ রাজ্যের দৃশ্য স্পৃশ্য শ্রবণ আস্বাদন সকলই ব্রহ্মযোগের ভিতর দিয়া, এ কথা আমি তোমায় বার বার বলিয়াছি।

প্র। তাহা আমি বেশ বুঝিতেও পারিয়াছি, কিন্তু সে দৃশ্য তবে কি?

উ। চর্ম্মচক্ষে পূর্ব্বে যে আকাশে গভীর নীলিমা দেখিতে, তাহা কি? কোন স্পর্শনীয় পদার্থ তাহা অবশ্য নহে, অথচ ঘন নীলবর্ণ। যতই ঊর্দ্ধে উঠিবে, ততই উহা যে কোন পদার্থ নয় তাহা প্রমাণিত হইবে। দিব্য-ধামের যে সুন্দর ছবি তোমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা চিদাকাশ, কিন্তু কোন পদার্থ নহে।

প্র। অমরবৃন্দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের কি সময় এখনও আমার হয় নাই?

উ। কেন হবে না? এ বিষয়ে সময় অসময় কিছু নাই, ধারণ করিবার অবস্থা যখন হয়, তখনই তাঁহাদিগকে দেখা যায়। সশরীরেও হইতে পারে।

প্র। আপনি যে দেখিতেছি, আমার আকাঙ্ক্ষণীয় যত কিছু সমস্তই নিরা-কারে পরিণত করিয়া আনিতেছেন! দেখা শুনা ধরা ছোঁয়ার সাধ কি কিছুই পূর্ণ হইবে না? কেবলই যোগ ধ্যান জ্ঞান আর নিরাকার?

উ। নিরাকার মানে শূন্য অন্ধকার নহে; কল্পনা ভাবান্ধতার মাদ-কতাও নহে। দেখা শুনা ধরা ছোয়ার অপেক্ষা ঘনতর মিষ্টতর অনুভব এখানে আছে। পার্থিব রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ কি অধিক মিষ্টতর ঘনতর নহে? তুমি নিজে এখন কি আপনাকে নিরাকার বলিয়া স্বীকার কর না?

প্র। তাহা ত করিতেছি। কিন্তু তাই বলিয়া আমার জ্ঞাতব্য ভোগ্য সমস্তই কি নিরাকার?

উ। তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহা আধ্যাত্মিক তাহাই সার এবং নিত্য; সাকার কেবল তাহার ছায়া মাত্র, বাহ্য আকারে তত্ত্ব প্রকাশ করিবার যন্ত্রবিশেষ; চিরদিন তাহা থাকিবার নহে। ঘর বাড়ী প্রস্তুত হইলে কে আর বাঁশের ভারার আদর করে?

"এত ক্ষণে আমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। বুঝিলাম, সমস্তই যোগের কাণ্ডকারখানা; যোগের ভিতর দিয়াই স্বর্গের ঐশ্বর্য্য দেখিতে হয়। বাণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, সবই যদি নিরাকার এবং যোগের ব্যাপার, তবে এখানে আসিয়া আমার লাভ কি হইল? দেহধারী হইয়াও ত আমি ইহা সম্ভোগ করিতে পারিতাম? অনেকানেক নূতন বিষয় এখানে আসিয়া দেখিব যে আশা করিয়াছিলাম, তাহা আর তবে পূর্ণ হইল না।"

বাণী। দেখিবার শুনিবার এখনো অনেক বাকী। যোগী আত্মা যোগবলে অধ্যাত্ম জ্ঞানালোকে পৃথিবীতে অবস্থান কালেও এখানকার পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হন, কিন্তু বিঘ্নের এবং ব্যবধানের ভিতর দিয়া। এখানে আসিলে সমস্ত ব্যবধান এবং বিক্ষেপের কারণ যায়, এই কেবল প্রভেদ। তোমার জ্ঞানের সীমা কি ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেছে না?

"আমি আহ্লাদের সহিত বলিলাম, তাহা হইতেছে। এবং তদ্বিষয়ে পিপাসা ক্রমেই আমার বাড়িয়া যাইতেছে।"

বাণী। ঐ পিপাসা বৃদ্ধিইতো মজা! যত পিপাসা তত শান্তি। আবার যত শান্তি তত পিপাসা বৃদ্ধি। নৈলে আর অনন্ত উন্নতি বলেছে কেন?

"বাণীর সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী উপদেশ শুনিতে শুনিতে আমার অন্তঃকরণ যখন অতিশয় আশা আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল তখন তাঁহাকে বলিলাম, মহাশয়, তবে স্বর্গভোগ আমার কবে হবে? আমার বড়ই ইচ্ছা যে এক বার স্বর্গ দেখি। তার পর যদি নীচে নামাইয়া দিতে চান দিবেন, কিন্তু এক বারটী দেখাইয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

বাণী। দেখাইবার কর্ত্তা আমি নই, কেবল পথ বলিয়া দিবার আমার অধিকার। তুমিত স্বর্গ অনেক বার দেখিয়াছ। এখানে আসিবার পূর্ব্বেও দেখিয়াছ।

"আমি একটু বিস্মিত বিহ্বল চিত্তে আত্মবিস্মৃতের ন্যায় বলিলাম, "কৈ, স্বর্গত আমি কখনও দেখি নাই! পৃথিবীতে স্বর্গ দেখিব কি রূপে? এখানে আসিয়া স্বর্গ দেখিব, দেবগণের সঙ্গে মিশিব, এই আশা করিয়া বসিয়া রহিয়াছি।"

বাণী। স্বর্গ তুমি কাহাকে বল? তুমি বুঝি যমের বাড়ীর ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক নরকের মত স্বর্গকেও একটা সুন্দর আরামের এবং বিলাস

সম্ভোগের স্থান মনে করিয়া বসিয়া আছ? যেখানে তুষার সদৃশ শ্বেতকান্তি কিন্নরী ও পরীরা পারিজাত ফুলের মালা গলায় দিয়া, দেবগণের সহিত স্বর্গীয় সুরাপানে মাতিয়া হাস্যামোদ কৌতুক বিহার করে, নাচে গায়, পার্থিব সুখ শান্তি আমোদ বিলাসের চরমোৎকর্ষ যে স্থান, তাই বুঝি তোমার স্বর্গ?

আমি। আজ্ঞে না মশায়, তা কেন; অপার্থিব আধ্যাত্মিক স্বর্গই আমি দেখিতে বাসনা করি। ভক্ত যোগী প্রেমিক নরনারীগণ যেখানে মহাদেবী আনন্দময়ীর সঙ্গে নিত্য যোগানন্দে বিহার করিতেছেন তাহাই আমি দেখিব।

বাণী। তাহা হইলে "যেখানে" আর বলিও না, যে অবস্থায় বল।

আমি। হাঁ মহাশয়, তাই বটে। আমি অজ্ঞান মূর্খ, এখানকার ভাষা আমি জানি না; ক্ষমা করুন।

বাণী। ক্ষমার দরকার হইতেছে না, তোমার যাহাতে যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাহাই আমি চাই। সে স্বর্গের আভাস তুমি অনেক বার পাইয়াছ, ভাবিয়া দেখ। স্বর্গও একটী আধ্যাত্মিক অবস্থা।

"অনেক ক্ষণ ভাবিয়া এ কথার গূঢ় তাৎপর্য্য কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিলাম। সব শাস্ত্রের একই মন্ত্র। অতঃপর ভক্তসম্মিলন সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "তাঁহাদের নিকট যাওয়া কিম্বা তোমার নিকট তাঁহাদের আসা, এ কথার কোন অর্থ নাই। এখানে দেখা শুনা যাওয়া আসা অতি মোটা কথা; মিলন মিশ্রণ বিলীন একাকার তন্ময়ত্ব একাত্মতা অভেদত্ব ইত্যাদি বাক্যের অব্যক্ত গভীরতা উপলব্ধি কর। তাহার পর ভক্তসম্মিলন কি তাহা বুঝিতে পারিবে। যোগী বৈরাগী সাধু ঋষি ভক্ত সেবক জ্ঞানী পূর্ব্বেত অনেকই দেখিয়াছ এবং তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়াছ; এক্ষণে তোমাকে সেই যোগী ভক্ত সাধু হইতে হইবে। এখানকার মিলনে কোন ব্যক্তিত্বের ব্যবধান থাকে না, একাকার তন্ময় হইয়া যাওয়াই যথার্থ মিলন। ক্ষুদ্রাকারে, অল্প পরিমাণে জীবগণ ঈশা চৈতন্য জনক যাজ্ঞবল্ক্য হইয়া যায়। সাধুদর্শন, সাধুভক্তি, সাধুসেবা, গুরুউপদেশ গ্রহণ এই রূপ মিলনের জন্যই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। দেশ কালে ব্যবহিত, ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য অবস্থায় প্রকৃত প্রেমমিলন অসম্ভব। আত্মীয় অন্তরঙ্গের সহিত পার্থিব প্রেমসম্বন্ধই বল, আর সাধু ভক্তের সহিত আধ্যাত্মিক প্রেমই বল, একত্বে অভেদত্বে যত দিন উহা পরিণত না হয়, তত দিন মধ্যে মোহ অজ্ঞানতার ব্যবধান থাকে।"

"কথা কহিতে কহিতে বাণীর বাগ্মিতা ক্রমশঃ অতিশয় প্রভাবশালিনী

হইয়া উঠিল। এমনি অজস্র ধারে সুধাময় তত্ত্ব কথা তিনি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, আমি আর তাহা ধারণ করিয়া উঠিতে পারিলাম না; একবারে যেন ভাসিয়া ডুবিয়া গেলাম। অনন্তর বীণাবিনিন্দিত মধুর স্বরে তিনি বলিলেন, "ব্রহ্মও অবস্থা, স্বর্গও অবস্থা, ভক্তসম্মিলনও অবস্থা; তুমিও শীঘ্র অবস্থা হইয়া যাইবে। যাঁহা হইতে উৎপত্তি, পরিশেষে তাঁহাতেই মিলন। যোগসমাহিত চিত্তে ঐকান্তিক ভক্তিভাবে শুনিয়া যাও, অস্থির হইও না। এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ছিলও না, থাকিবেও না। অনন্ত জলধিবক্ষে বিম্ব সদৃশ জীবসকল তাঁহার লীলার প্রকাশ। জলবিম্ব যেমন জলে মিশিয়া যায়, পরিণামে জীব তেমনি ব্রহ্মের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতে নিত্য কাল বাস করে। দৃশ্যমান বিশ্ব তাঁহার লীলাবিকার মাত্র, অর্থাৎ স্বগুণত্বের অভিব্যক্তি। যদি তুমি স্বর্গ দেখিতে চাও, এবং অমরগণের সহিত মিশিতে চাও, তাহা হইলে এখন ঐ মূলাধারে প্রবেশ কর। অনন্ত ব্রহ্মবক্ষে অমরগণের বাস, নির্ব্বিকল্প সমাধি যোগে তাঁহাদিগের সহিত মিশিতে হইবে। ব্রহ্মই স্বর্গ, ব্রহ্মই অমরধাম। যোগবলে যখন ব্রহ্মকৃপা সম্মিলিত হয়, তখনই আধ্যাত্মিক দর্শন শ্রবণ স্পর্শ আঘ্রাণ রসাস্বাদন প্রভৃতি ক্রিয়া সহজে অব্যবধানে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাহেন্দ্রিয় যোগে পূর্ব্বে যাহা কিছু দর্শন করিয়াছ, তাহা কি আর দর্শন? সে কেবল উপর উপর। অন্তরেন্দ্রিয়ের নির্ম্মল দর্পণে এখন আসল বস্তু এবং বস্তুর বস্তু দেখিয়া জ্ঞান হইয়া যাও। তদনন্তর দেবাত্মাদিগের এবং পরব্রহ্মের চরিত্রের পবিত্র মধুর সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া গন্ধ হইয়া যাও। কর্ণরন্ধ্রে গীত বাদ্য শুনিয়া মোহিত হইয়াছ, এখন নিজে গীত বাদ্য হইয়া যাও। স্পর্শসুখ এবং আস্বাদনসুখও এখন অব্যবধানে সম্ভোগ করিয়া তন্ময় হইয়া যাও। নতুবা চিরকালই কি স্বতন্ত্র থাকিয়া পৃথক্ আধারে জ্ঞান প্রেম পুণ্য আনন্দ শান্তি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইবে? ইহাকেই বলে স্বর্গভোগ এবং দেবসহবাস।"

"বাণীর গম্ভীর অর্থযুক্ত মহাবাক্য শুনিতে শুনিতে আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। মোহমদিরা ঘোরে আমি যেন নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলাম। তার পর যে সকল কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহার অর্থ অবধারণ করিতে পারি নাই; তথাপি কিন্তু বড়ই মিষ্ট বোধ হইয়াছিল। কেন না, এখানে আনন্দ মত্ততা প্রেমাবেশের মধ্যেও দেখিলাম, সম্যক চেতনা থাকে। চৈতন্যহীন হইলে আর এ সব সম্ভোগ করিবে কে? ইহা দিব্যজ্ঞানমিশ্র দিব্যপ্রেম।

তখন ভাবিলাম, যাহার তত্ত্বশ্রবণ এমন মধুর, না জানি তাহার সম্ভোগ কতই না সুখকর! পরে বাণীর উপদেশানুসারে আমি মহাযোগ চরমধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম।"

"একমেবাদ্বিতীয়ং শব্দের অর্থ এত দিনে আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। পূর্ণ-ব্রহ্ম বাঞ্ছাকল্পতরু হরি আমার সকল কামনার পরসমাপ্তির স্থল। বড়ই আনন্দের তত্ত্ব। এক জনকে ধরিলে সকলকে পাই, আর অন্য কাহারো দ্বারস্থ হইতে হয় না। হরি আমার কি না হইতে পারেন? আর কি না দিতে পারেন? তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গ মুক্তি কিছুই চাই না। তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে, প্রেমভরে বলিলাম, 'ঠাকুর, আমি বুঝিছি, তুমিই সব। তুমি জ্ঞানীর জ্ঞান, তুমি যোগীর যোগ, ভক্তের ভক্তি, প্রেমিকের প্রেম। তুমি এক, তুমি বহু, এবং তুমিই বিচিত্র গুণধারী অনন্ত। তুমি অদ্ভুত আশ্চর্য্য, তুমি গভীর দুরবগাহ্য নিগূঢ় রহস্য। তুমি পাপীর সরল অনুতাপ, সাধুর বৈরাগ্য পবিত্রতা; তুমি ভক্তের মধুর হাসি, এবং আনন্দের নৃত্য গীত। তুমি আমার হৃদয়ের শান্তি, প্রাণের আরাম, আত্মার বিশ্রামশয্যা। তুমি পরিপূর্ণমানন্দম্ এবং ব্রহ্মরূপাহি কেবলম্। তুমি পতিহীনের পতি, পিতৃমাতৃ-হীনের পিতামাতা; সন্তানহীনের তুমি সন্তান। মাতৃত্ব পিতৃত্ব, স্ত্রীত্ব স্বামীত্ব, ভ্রাতৃত্ব বন্ধুত্ব পুত্রত্ব ভৃত্যত্ব, এ সকল কেবল তোমার অনন্ত মহাসিন্ধুর এক একটী বিন্দু; তোমা হইতে তাহারা আসে এবং তোমাতে ফিরিয়া যায়। তুমি নিত্য নির্ব্বিকার, এবং তুমি লীলাময়। তুমি আমার, আমি তোমার।"

"তার পর প্রশান্ত হৃদয়ে অল্পে অল্পে ক্রমশঃ আপনার ভিতর অবতরণ করিতে লাগিলাম; যত নামি ততই শীতল এবং শান্তি বোধ হয়। আত্ম-জ্ঞানের সীমা পার হইয়া যখন খাস ব্রহ্মজ্ঞানের সীমায় আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন বাণী পূর্ব্বাপেক্ষা আরো মধুর ভাবে আমাকে বলিলেন, "তোমাকে পুন-র্ব্বার পবিত্রাত্মার নিকট অভিষিক্ত এবং দীক্ষিত হইতে হইবে। যে যে প্রণালীর ভিতর দিয়া একত্বে বিলীন হইতে হয় তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব্ব প্রথমে আত্মজ্ঞানাবতার মহাত্মা সক্রেটিশ, তার পর নির্ব্বাণ-রূপী মহামুনি শাক্য, তার পর মহাযোগী মহাদেব, তদনন্তর ইচ্ছাযোগেসিদ্ধ বিশ্বাসী সুপুত্র যিশু, তার পর প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ; সর্ব্বশেষে সামঞ্জস্যাবতার শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ; ক্রমে ইঁহাদের ভিতর দিয়া প্রতি জনকে আত্মস্থ করিয়া অনাদি আদি পরমতত্ত্বে তোমাকে প্রবেশ করিতে হইবে।

"খাস ব্রহ্মরাজ্যের আসল গূঢ় এই সব খাঁটি কথা শুনিয়া বাণীর প্রতি আমার হঠাৎ তখন সন্দেহ উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, কে এ ব্যক্তি এত ভাল ভাল তত্ত্ব কথা বলে ?, ইনি কি ব্রহ্মের কোন অমাত্য সহচর ? বাণী, কিন্তু কার বাণী ? ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, গুরুদেব, "আপনি কে, আমাকে পরিচয় দিন। এবার আর আমি কিছুতেই ছাড়িব না। বলুন আপনি কে ?

বাণী। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, আমি অনন্ত আকাশে এক বাণী, অন্য পরিচয় আর কি দিব ? তোমাকে যাহা বলিলাম, তাই অগ্রে কর; পবিত্রাত্মার নিকট অভিষিক্ত হও।

আমি। তাহা ত' বুঝিলাম, এবং শুনিলাম; আপনি কে, এক্ষণে আমাকে তাহা বলুন।

"সহসা আমার এই রূপ ভাবান্তর দর্শন করিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। যাই হাসিয়াছেন, আর যাবেন কোথা! আমি অমনি প্রেমের গভীর আবেশে দৃঢ় বিশ্বাসে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, 'ঠাকুর, তুমিই সেই! আর কেন আমায় তবে বঞ্চনা কর! আমি কথার ভাবে এবং স্বরে এবার বুঝিতে পারিয়াছি। তখন আকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া বলিলাম, "নাথ হে, কাঙ্গাল জনে কি এত ফাঁকি দিতে হয় ? এত ক্ষণ কেন আমায় পরিচয় দিলে না বলিতে হইবে। তুমি না চিনাইলে কি আমি তোমায় চিন্‌তে পারি ? না, দেখা না দিলে, দেখিতে পাই ?"

"আমার আবদারের এবং অভিমানের রোদন শুনিয়া লীলার সময় ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "আমার এই এক লীলা।" তখন দুই জনে এক হাসি হাসিলাম, মহোল্লাসে অনন্ত চিদাকাশ পরিপ্লাবিত হইয়া গেল। তদনন্তর ঠাকুর সখ্যভাবে বলিলেন, "এখনো তোর মহামিলন, মহাযোগ হয় নাই; কারণ, ব্যক্তিত্বের শক্ত বিচি আছে। যে পথের কথা শুন্‌লি, সেই পথ ধরিয়া আয়, পরিণামে আমাতে বিলীন হইতে পারবি। অন্য কোথাও আর যাইতে হইবে না, আমার ভিতর বসিয়া সকলের দেখা পাবি। আমিই উপায়, আমিই উদ্দেশ্য; আমিই পথ, আমিই আলোক; প্রথমেও আমি, শেষেও আমি; আমিই নেতা এবং গম্য স্থান।"

"তখন আশা প্রফুল্লিত অন্তরে প্রথমে বৃদ্ধ সক্রেটিশের সঙ্গে মিশিলাম এবং তাঁহাকে একবারে খাইয়া ফেলিলাম। অতীব উপাদেয়। পূর্ব্বাপেক্ষা

আরো সুপক হইয়াছেন। তাঁহাকে ভোজন করাতে আমার আত্মজ্ঞান স্বচ্ছ হইল, ব্রহ্মজ্ঞানজ্যোতি স্ফটিকপ্রতিবিম্বিত জ্যোতির ন্যায় তাহাতে ফুটিয়া উঠিল। তদনন্তর বুদ্ধরূপ নির্ব্বাণের শান্তিজলে স্নান করিয়া বিগতবাসনা হইলাম। এই দুই আত্মাকে ভোজন করিবার পর আমার আত্মা বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল, ক্ষুধা এবং জীর্ণশক্তি বাড়িল। তার পর যোগী মহাদেবকে খাইয়া শান্ত যোগী হইলাম। তার পর কর্ম্মযোগী ঈশা, ইঁহাকে খাইয়া আস্ত হজম করিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। বড় গুরুপক সামগ্রী! শ্রীঈশাকে যখন আত্মস্থ করিলাম তখন গৌরাঙ্গভোজন বেশ সহজ হইল। বড় কোমল, মোলায়েম সামগ্রী, মুখে দিতে না দিতে মিলাইয়া যায়। কিন্তু বড় সাবধানে গিলিতে হয়, চিবাইতে গেলে স্বাদ পাওয়া যায় না। সর্ব্বশেষে ব্রহ্মানন্দভোজন। ইনি সকল প্রকার ধর্ম্মাঙ্গের মিলন, ইঁহাকে সর্ব্বাঙ্গীনরূপে একবারে আস্ত হবন করিতে না পারিলে ঘোর বিপদে পড়িতে হয়। অনেক রকম মাল মশলায় তৈয়ারি, অনেক অঙ্গে গঠিত। ব্রহ্মে একত্ব প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে এই মহাত্মাকে ভোজন করিতে হইয়াছিল। যেমন ব্যঞ্জনের সুতার, ঐক্যতান বাদ্যের মিলন স্বর, দাম্পত্যপ্রেম, প্রকৃতির সামঞ্জস্য; তেমনি ব্রহ্মানন্দের আত্মা। সুজাতাপ্রদত্ত পরমান্নের ন্যায় ঘনীভূত পদার্থ। বহুতর মিশ্রধর্ম্মযোগে যদিও ইহা রচিত, কিন্তু অতি উপাদেয়, পুষ্টিকর এবং মুখরোচক। ইহার সঙ্গে মিলন ব্রহ্মমিলনের পূর্ব্বাভাস। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ব্রহ্মপুত্র মেঘনায় মিলিয়া যেমন সাগরে পড়িয়াছে, ব্রহ্মানন্দ তেমনি ভক্তবৃন্দের মিলিত নদীবৎ হইয়া ব্রহ্মসাগরে মিশিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সঙ্গে মিশিলে ব্রহ্মমিলন অতিশয় নিকটবর্ত্তী হয়।”

“এই রূপে ব্রহ্মকৃপাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ব্রহ্মানন্দের সহিত বিলীন হইয়া যখন আমি পরব্রহ্মের মহাসত্তায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন এক রঙ্গে রঞ্জিত, এক গন্ধে পরিষিক্ত হইয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে যাহা ছিলাম তাহাই হইয়া গেলাম। ব্রহ্মও অবস্থা, আমিও অবস্থা।”

এই তুরীয় অবস্থা বচনাতীত। সুতরাং এই খানেই গ্রন্থ শেষ করা উচিত। তবে অল্প কিঞ্চিৎ এখনো বাকী আছে। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যক্তিত্ব তত ক্ষণ পর্য্যন্তই লীলা; তার পর নিত্যের অনন্ত পারাবার। আত্মারাম এক বার লীলা এবং এক বার নিত্য, এই দুই অবস্থার সামঞ্জস্য নিজ জীবনে দর্শন করিয়া উপসংহার কালে কি বলিতেছেন তাহা সকলে শ্রবণ করুন।

"যখন পরম গুরু ব্রহ্মবাণী আমাকে বলিলেন, তোমায় প্রেম পুণ্য জ্ঞান আনন্দ সুখ শান্তি হইতে হইবে, তখন আমি বলিলাম, "দেব, তাহা হইলে আমি এ সব ত সম্ভোগ করিতে পাইব না। সুখের কি কোন সুখ, শান্তির কি শান্তি আছে? প্রেম পুণ্য জ্ঞান আনন্দ ইহারা কি নিজেরা নিজেকে উপভোগ করিতে পারে?

ব্রহ্ম। তবে তুমি এখন আর কি চাও?

আত্মা। আমি সুখী শান্ত জ্ঞানী প্রেমিক পুণ্যময় এবং আনন্দময় হইয়া ঐ সকল স্বর্গীয় দেবগুণ পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতে চাই।

ব্রহ্ম। ভক্তি চাও? না মুক্তি চাও? ঠিক করিয়া বল!

আমি। আজ্ঞে প্রভু, আমি ভক্তিও চাই, মুক্তিও চাই।

"উত্তর শুনিয়া সচ্চিদানন্দ বলিলেন, "তুমি খুব চতুর ছোকরা। আচ্ছা, এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম। আমি তোমাকে ভক্তি মুক্তি উভয়ই প্রদান করিব।"

"নিত্য সত্তার অনন্ত গভীরতার মধ্যে প্রথমে যখন আমি ডুবিতে আরম্ভ করিলাম, তখন অন্তরে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব ভয় এবং বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। কয়লার খনির ভিতর নামিবার সময় প্রথম অন্ধকার দেখিয়া মানুষ যেমন হতভম্ব হয়, কতকটা সেই রূপ। তার পর আবার বেশ আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। তখন ভাবিলাম, আমিত্বের প্রভুত্ব যথেষ্ট ভোগ করিয়াছি, এখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হই। পূর্ব্বে বাহ্য পদার্থ, লিখিত গ্রন্থ, ইন্দ্রিয় এবং মনোবুদ্ধির ভিতর দিয়া একটু একটু জ্ঞান লাভ করিয়া অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হইত না, ইচ্ছা হইত একবারে অতলস্পর্শ অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়ি; তাহার ভিতর ডুবিয়া যাই, এবং সাঁতার খেলি। সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া ভাব প্রেম আনন্দ, হরিলীলা, এবং বাসনাঝঞ্ঝান্দোলিত ক্ষীণ বিবেকালোকের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান, ভগবৎ অভিপ্রায় অনুভব করিয়াও এবং আমার পিপাসা মিটিত না। কেমন করিয়া কবে আমি প্রেমের মহাসমুদ্রে প্রত্যাদেশের অনন্ত বাড়বাগ্নির ভিতর ডুবিব, এই কেবল তখন ভাবিতাম। জ্ঞানপিপাসা এবং প্রেমপিপাসা চরিতার্থের জন্য লক্ষ লক্ষ বার যদি জন্মগ্রহণ করিতে হয় তাহাও প্রার্থনীয় ছিল। চক্ষু দুইটা এবং মাথাটাকে সে জন্য কতই ক্লেশ দিয়াছি! কিন্তু কিছুতেই সে পিপাসা নিবারণ করিতে পারি নাই। আন্তরিক ঔৎসুক্যজন্য সময়ে সময়ে পাগলের মত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতাম।

সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়কারাগারে মদমত্ত হস্তীতুল্য আমার জ্ঞানপিপাসু আত্মা কেবল প্রাচীরে মাথা খুঁড়িত। এখন অনন্ত প্রমুক্ত জ্ঞানার্ণবে আসিয়া বাঁচিলাম। কোন বাধা ব্যবধান আবরণ এখন আর রহিল না।"

"অনন্তর নিত্যের অসীম অনন্ত গভীরতার মধ্যে নামিয়া দেখি যে ব্যক্তিত্ব টুকু ক্রমে গলিয়া ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। লয় হয় হয়, এমন সময় বলিলাম, ঠাকুর, এ করিলে কি? অনন্ত যে আমায় উদরস্থ করিয়া ফেলিল! ক্ষণকাল পরে আর কাহারো সাড়া শব্দ পাইলাম না; মহানির্ব্বাণে জীবোপাধি আপাততঃ লয় প্রাপ্ত হইল। যে অবস্থায় আমার আমিত্ব নাই, তাহার কথা কেই বা বলিবে, আর কেই বা তাহা বুঝিতে পারিবে? এত কাল পরে আমার পুরাতন চিরপরিচিত হারাধন আমিত্বের বিসর্জ্জন হইল।"

আরো কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে, তাহা হইলেই শেষ হয়। ঠাকুর কি না বলিয়াছিলেন, "পর্য্যায়ক্রমে আমি তোকে যোগের নিত্যানন্দ, এবং ভক্তির লীলারস পান করাইব।" তাই পুনরায় তিনি আত্মারামকে লইয়া শেষ-লীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক পালা সাঙ্গ করিলেন। জল জমিয়া যেমন বরফ হইয়া ভাসিয়া উঠে, তদ্রূপ সেই অনন্ত প্রশান্ত মহার্ণব হইতে আত্মারামের ব্যক্তিত্ব নবভাবে আবার এক বার দেখা দিয়াছিল। তার পর যে কে কোথায় গেল, কি হইল, তদ্বিষয়ে কোন রূপ নিদর্শন আমরা পাই নাই। জীব সৃষ্টির আদি অবস্থা যেমন, অন্তও তেমনি ঘোর রহস্যে আবৃত।

অন্ত্যলীলার অবস্থা এই রূপে বর্ণন করিয়া আমাদের বন্ধু লেখনীকে বিশ্রাম দিয়াছেন;—

"গভীর সুনিদ্রার পর ঈষৎ জাগ্রদাবস্থায় স্বপ্নের ঘোরে সুদূরবাহী সঙ্গীতধ্বনি কি কখন তোমরা শ্রবণ করিয়াছ? যদি শুনিয়া থাক, তাহা হইলে আমার এই শেষ কথার অর্থ অবধারণে সক্ষম হইবে। সুনিদ্রা কালে যেমন অজ্ঞাতসারে সময় চলিয়া যায়, কত ঘণ্টা বা কত যুগ ঘুমাইয়াছিলাম কিছুই নির্ণিত হয় না; সে অবস্থায় এক রাত্রিও যেমন, সহস্র রাত্রিও তেমনি; মহানির্ব্বাণের অবস্থায় তেমনি কত সময় যে আমার অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা কেবল সেই চিরজাগ্রত অনন্ত পুরুষই বলিতে পারেন। আপনার আদি অন্ত ব্যক্তিত্ব হারাইয়া পরে হঠাৎ এক দিন সুমধুর যোগনিদ্রা ঘোরে এই স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনিতে পাইলাম;—

"জয় জগবন্দন, পুরুষ নিরঞ্জন,
পূর্ণ ব্রহ্ম বিধাতা ;
জয় ভগবান, তুরীয় মহান,
দয়াময় শান্তিদাতা।
তুমি আদি অন্ত, অনাদি অনন্ত,
বিশ্বেশ্বর বিশ্বপাতা ;
সর্ব্বলোকাশ্রয়, লীলার সময়,
দীনজন পরিত্রাতা ;
দেহি পদারবিন্দ, যাচে অমরবৃন্দ,
জয় পরমাত্মা পিতা মাতা।"

"সঙ্গীতরূপী অনন্ত সামঞ্জস্য শ্রীহরির এই অলৌকিক সঙ্গীতরসে বিভোর হইয়া প্রেমরাগরঞ্জিত দিব্যজ্ঞাননয়নে দেখিলাম, মধ্যস্থলে ভগবান সচ্চিদানন্দ, আর তাঁহার চারি ধারে অগণ্য অসংখ্য দেবদেবী অমরাত্মা। তিনি মহামিলন গীত গাহিতেছেন আর সকলে মিলিয়া নৃত্য করিতেছেন। আহা! কি মধুর গানই শুনিলাম। সকলেই যেন সঙ্গীতময়। চিদানন্দের তালে, ভক্তির সুরে, প্রেমের বিচিত্র মূর্চ্ছনায় মিলিত সে সঙ্গীত। যাহার কণামাত্র মিষ্টতায় পৃথিবীর গীত বাদ্য স্বরলহরী এত মিষ্ট হইয়াছে সেই সঙ্গীত। জ্ঞান হইল, কত রকমের কত আত্মা মিলিয়া এই গীত গাইলেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ভক্তি সকলের মিলন সঙ্গীত শ্রবণান্তে অমরাত্মা ভক্ত সাধু সাধ্বীদিগের সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হইল। ইঁহারা এখানে কেবল ধর্ম্মপিপাসা এবং সরল বিশ্বাস ভক্তি লইয়া অমরবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন, পরে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া পূর্ণ ব্রহ্মের সহিত নিত্যযোগে মিশিয়া গিয়াছেন। তদনন্তর আমি অনন্তের প্রেমবক্ষে অযুত অগণ্য গ্রহতারা চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় অপূর্ব্ব দেবসভা দর্শন করিলাম। অমরগণের স্নেহপূর্ণ শুভাশীর্ব্বাদে আমার আশা আনন্দ পরিবর্দ্ধিত হইল। শেষ বলিলাম, ঠাকুর, এক বার যুগলরূপে আমায় দেখা দেও! তোমার পুরুষ-প্রকৃতি-মিশ্রিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর যুগলমূর্ত্তি আমায় দেখাইতে হইবে। পরিশেষে ভক্তচিত্তহারী অভূতপূর্ব্ব যুগলরূপ দেখিতে দেখিতে অমরকণ্ঠবিনিঃসৃত হরিধ্বনি শুনিতে শুনিতে অনন্ত চিদানন্দসাগরে আমি বিলীন হইয়া গেলাম।" হরি হরি বল এক বার, হরিবোল!

[সমাপ্ত]